সীমাহীন সমর

মেজর (আবঃ) এম এ জলিল

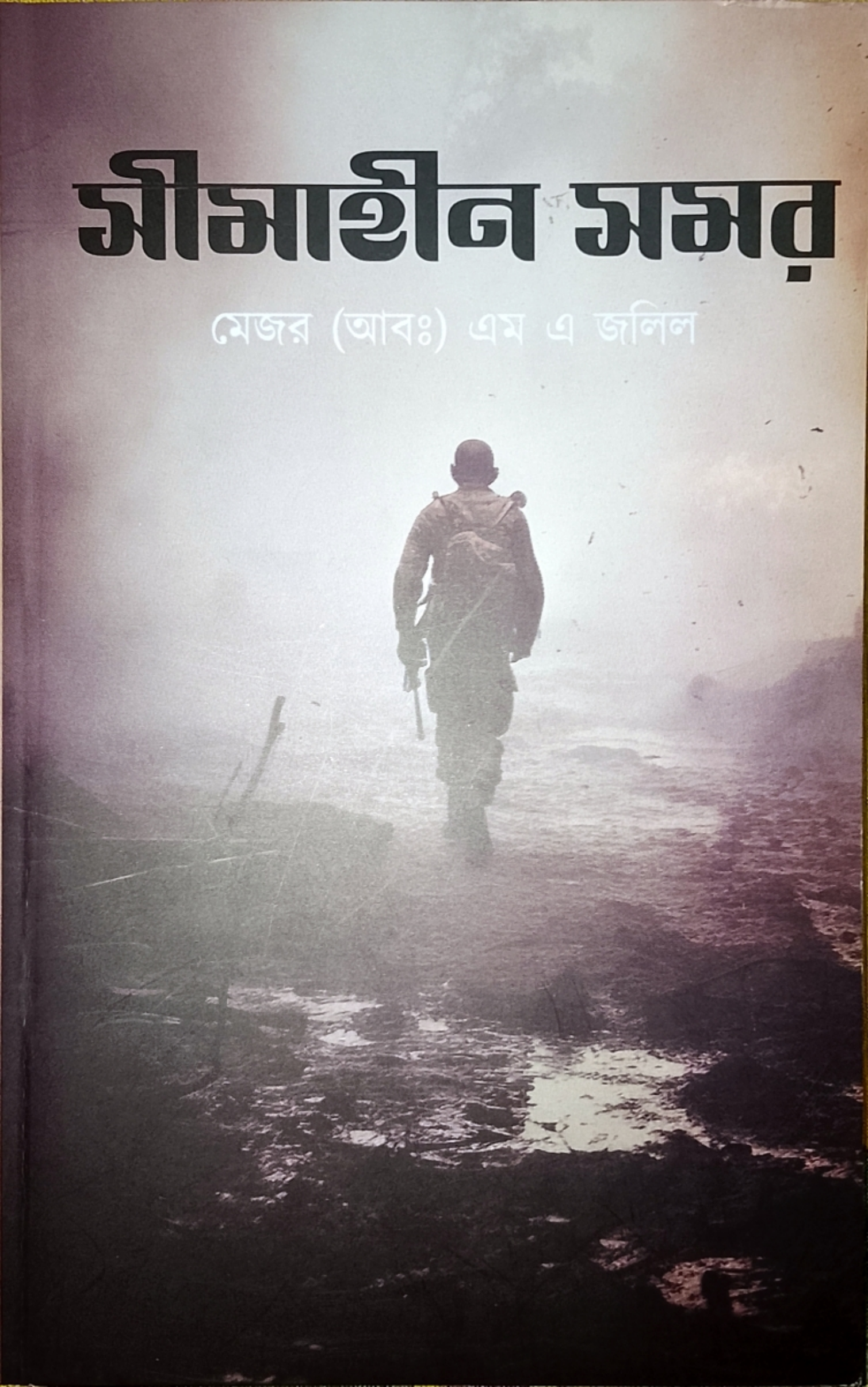

সীমাহীন সমর

মেজর (অব.) এম এ জলিল

প্রকাশনী
সত্য প্রকাশ

সীমাহীন সমর

মেজর (অব.) এম এ জলিল

উৎসর্গ : রূপসী বাংলার শৃঙ্খল মোচনে যত জানা-অজানা মুখ মিলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল তলে, সেই হারিয়ে যাওয়া মহান অগ্নিসন্তানদের অতুলনীয় দেশাত্মবোধের মৃত্যুঞ্জয়ী মশাল, স্মরণের আরশীতে জীবন্ত করে ধরে রাখার ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমার সীমাহীন সমর শ্রদ্ধাভরে অর্পণ করলাম।

গ্রন্থস্বত্ব	:	গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশক	:	সত্য প্রকাশ, ঢাকা।
প্রকাশকাল	:	১৯৭৪ সাল।
মূল্য	:	৬৫০ টাকা মাত্র।

লেখক 'মেজর জলিল' প্রয়াত হওয়ায় এবং ওনার উত্তরাধিকারগনের সঙ্গে যোগাযোগের কোন মাধ্যম না পাওয়ায়, বিপ্লবী চেতনা থেকে পাঠকদের কাছে অজানা ইতিহাস পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বইখানা সত্য প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত হল। বইটি যদি কখনো লেখকের উত্তরাধিকারগনের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বইয়ের স্বত্ব নিয়ে দাবি থাকে তাহলে অবশ্যই সত্য প্রকাশের মেইল কিংবা ওয়েবসাইটে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের দায় দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

Sottoprokash.com
sottoprokash36july@gmail.com

সূচিপত্র

কেন আমি বন্দিশালায় ৬

বরিশালের রণাঙ্গন..... ২০

গুপ্তপথে যাত্রা ৩৬

সুন্দরবনে প্রেতাত্মা..... ৪৬

সর্বাধিনায়কের দরবার ৫৮

একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি ৬৩

মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা ৭২

গেরিলা অভিযান..... ১০৪

ফেলে আসা বাকুনদিয়া ১৩০

ব্যারাকপুরের চার্লি..... ১৩৫

সেই তীর্থভূমি..... ১৩৯

মহামিলনের জলসায়..... ১৪৭

আতিথ্যের আড়ালে..... ১৫৪

৮নং থিয়েটার রোড..... ১৬২

বিজয় অভিযান ১৭৩

প ট ভূ মি

প্রিয় পাঠকগণ,

আমার এ অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টির মূল বিষয়ের কয়েকটি প্রধান দিকের যৎসামান্য তুলে ধরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হবার পর পরই আওয়ামী লীগ সরকার মৈত্রীবদ্ধ ভারতের সহযোগিতায় যে পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল সেই পরিবেশের প্রেক্ষাপটে এবং তৎকালীন উদ্ভূত বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সীমাহীন সমর-গ্রন্থখানি লিখিত।

দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর, ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর আমাকে বাংলাদেশের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে আমার মাঝে তখন একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং যার পরিণতিতে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। একজন সৈনিক, একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন রিফিউজি হিসেবে সেই সময়ের মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ-বেদনার চাঞ্চল্যই ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া, একজন যুদ্ধজয়ী যুবকের আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং মুক্ত মাতৃভূমির এক অসহায় বন্দির দুঃসহ যন্ত্রণার কাহিনি নিয়েই সীমাহীন সমর।

পাঠকবর্গের নিকট সবিনয় অনুরোধ, যখন আমার গ্রন্থটি আপনাদের হাতে পৌছুবে, তখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তার বিচার করবেন। কারণ, সশস্ত্র যুদ্ধের নয় মাসের অভিজ্ঞতা এবং বন্দি অবস্থায় আমার দ্বান্দ্বিক সত্তা যে সমস্ত ঘটনার মোকাবিলা করেছে-তা আমি একান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছি। একজন মিশ্র অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির এ প্রতিক্রিয়াকে সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করাই হবে যার প্রকৃত অর্থ।

আমি এখানে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য বা তত্ত্বহুল ইতিহাস রচনা করার ধৃষ্টতা দেখাইনি, চেষ্টা করিনি নিজেকে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এটা আমার দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-যা আমি বন্দিদশায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম।

তখনকার সেই দুর্বিষহ যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্তে আমি অনুভব করেছিলাম, এ তারই ফসল ছাড়া কিছু নয়।

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং অসংখ্য হিতাকাঙ্ক্ষীর অনুরোধে এ গ্রন্থটি লিখতে আমি বাধ্য হই। অন্যথায় আমার বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সঙ্গে সঙ্গে কাগজ এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির উচ্চমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

'সীমাহীন সমর'–এ ন'মাস মুক্তিযুদ্ধের ন্যূনতম ইতিহাসও যদি বিধৃত হয়ে থাকে, তাহলে আমার বন্দি-জীবন যে নিরর্থক হয়নি-অন্তত এতটুকু ভেবেও তৃপ্তি পাব।

যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাথির একাগ্র প্রচেষ্টা, উপদেশ ও আর্থিক সাহায্য গ্রন্থটি প্রকাশ করার পথকে সুগম করছে তাদেরকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাইনি। এ ঋণ অপরিশোধ্য বলেই এখানে তাদের সকলের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে কয়েকটি নাম উল্লেখ না করে পারছি না। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম যার নাম আমার মনে পড়ে, তিনি হলেন-শ্রদ্ধেয় জুলফিকার হায়দার। তার অপরিসীম ত্যাগ, উপদেশ এবং সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এগ্রন্থ আদৌ জনসমক্ষে প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ।

আমার স্নেহভাজন অধ্যাপক দুলাল কুমার গ্রন্থটি রচনার প্রায় প্রথম থেকেই আমাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা যুগিয়ে যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এটি প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছেন-তা অবশ্যই স্মরণীয়। এছাড়া সুলতান উদ্দীন আহমেদ, মমতাজ বেগম, আবদুল মালেক, মনোয়ার হোসেন ও অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে বলব, সাপ্তাহিক 'জাগ্রত জনতার' সম্পাদক জনাব এম এ জলিল ও তাঁর সহযোগী ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র আবদুল মান্নান মুনশীসহ যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে আমাকে দায়মুক্ত করেছেন-সেই সমস্ত ত্বরিৎকর্মা নির্ভীকচিত্ত কর্মীদেরকে জানাই আমার সংগ্রামী অভিনন্দন।

তাং ১৭ই মার্চ ১৯৭৪

নিবেদক

মেজর এম এ জলিল

কেন আমি বন্দিশালায়

প্রিয় সহকর্মী ও সাথিরা,

আমি যা অনুভব করি, আপনারা কি তাই অনুভব করেন? আমি যা বুঝি, আপনারা কি তাই বুঝতে পারেন? আমি যা শুনতে পাই, আপনারা কি তাই শুনতে পান?

নিশ্চয়ই। আমি অনেক কিছুই অনুভব করি। কুৎসিত বেদনাদায়ক অনেক কিছুই জানি। স্বল্প আলোকিত, দরজা-জানালা বন্ধ আমার ছোট কক্ষটির বাইরে আমি শুনতে পাচ্ছি-জনতার প্রচণ্ড উল্লাস ধ্বনি, হৈ চৈ ও অতুলনীয় প্রাণবন্যা। যখন সবকিছুই তালাবদ্ধ, তখন আমার ছোট্ট অসহায় মনটি কেন উড়ে যাচ্ছে বাইরের ওই অতুলনীয় উচ্ছ্বাস ও অনাবিল আনন্দের মহাসমারোহে? ওগুলো কী? শেখ! শেখ! শেখ মুজিব! পাগলের মতো লোকগুলো উল্লাসে ফেটে পড়ছে কেন? তারা কি জানে না যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি?

আমার পিছন থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে ভেসে আসল: না, আর বন্দি নয় স্যার? শেখ মুক্ত! শেখ মুজিব দেশে ফিরে আসছেন। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। গুলিবিদ্ধের মতো মাথাটা আমার ঝিম ঝিম করতে লাগল। নিজের মনে চিৎকার দিয়ে উঠলাম ও কী বলছ? কোনো শেখ মুজিব ফিরে আসছেন।

ত্বরিৎগতিতে উত্তর এলো: বাংলাদেশের সেই মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। কতকটা উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলাম তোমরা কি স্বপ্ন দেখছ? না, সবাই মরীচিকার পিছনে ছুটছ? পাক-সামরিক চক্র তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। কি করে শেখ মুজিব ফিরে আসতে পারেন?

পোশাক পরা একজন সৈনিক উত্তর দিল: তিনি সত্যিই ফিরে আসছেন স্যার। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিব এখন মুক্ত।

আহা। সে কেমন করে সম্ভব? তাহলে তুমি কি বলতে চাও হঠাৎ বাধা পেয়ে ক্ষণিকের জন্য আমি থেমে গেলাম। হ্যাঁ স্যার, আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের দেশ মুক্ত হয়েছে। শেখ মুজিব ইতোমধ্যেই ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে গেছেন। আজকে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন।

এ কথাগুলোর অদ্ভুত প্রতিধ্বনির ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ আমার মাথার ভেতর পাক খেয়ে উঠল। আমাদের দেশ মুক্ত। শেখ মুজিব ইতোমধ্যেই ঢাকা

বিমানবন্দরে! তিনি আজ জনসভায় ভাষণ দিতে যাচ্ছেন! এ কথাগুলো আমার কাছে শুধু হেঁয়ালীই মনে হলো না, মনে হলো সম্পূর্ণ অপরিচিত, কৃত্রিম ও অকল্পনীয়। অনিশ্চিতের কশাঘাতে আমার ঠোঁট দুটো প্রাণহীন, নিস্তেজ হয়ে গেল। বারবার এ কথাগুলোর পুনরুক্তি করার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগল। একই সঙ্গে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো একটা বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্গীরণের সম্ভাবনায় আমার ভেতর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। বাইরের কোলাহলে হারিয়ে গেলাম। বিস্ময়ে আমি হতবাক। নিঃসহায় দৃষ্টি মেলে দিলাম সৈন্যদের মাথার উপরে ওই দূর নীলিমায়.....যেন বহু শতাব্দী কোনো এক উর্বশী বা কুৎসিত বালিকার প্রেতাত্মা দেখতে পেলাম স্থিরদৃষ্টি, স্বপ্নবিষ্টের মতো হতবাক। কিসের আঘাতে ভেতরটা আমার কেঁপে উঠে বরফের মতো গলতে লাগল। কী যেন আমার গণ্ডদ্বয় ভিজিয়ে দিয়ে নিচে নেমে আসছে।

যা কেউ চায় না অথচ অর্থহীন নয়। যে জলবিন্দুগুলো আমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, তাকে আমি 'আঁসু' বলব না, কেননা আমি দুঃখিত নই। একে উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততাও বলব না। কারণ, কোনোক্রমেই আমি সুখী ছিলাম না। যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে, যে জলবিন্দুগুলো আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে তা অর্থহীন নয়। তাই আমার সাথিদের কাছে এর ব্যথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যদিও আমার কক্ষের একজন পোশাকদারী সৈন্য-এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঘৃণাভরে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে বিরত হলাম।

প্রিয় সাথিরা আমার,

ওই চোখের পানি এদেশের মুক্তি। কতকটা ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। সিপাইকে জিজ্ঞাসা করলাম। বলো, তুমি বলো কোথায় আমি? কেন আমার কক্ষের চারদিকে লোকজনের এত উল্লাস—এত শোরগোল? নির্লিপ্তভাবে উত্তর বেরিয়ে এলো সিপাহির মুখ থেকে ও 'এটা ঢাকার ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এখন থেকে আধ ঘণ্টার ভেতরেই শেখ সাহেব ভাষণ দেবার জন্য এখানে আসছেন। না, না, তুমি একটা ডাহা মিথ্যাবাদী। যাও। আমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাও। শেখ সাহেব আসতে পারেন না। আমাদের দেশ মুক্ত হয়নি। যদি সত্যিই দেশ মুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে

আমি এখানে কেন? আমাকে বাইরে যেতে দাও। শেখ মুজিবের কথা শুনতে দাও।

আমাকে একটিবার তাঁকে দেখতে দাও। আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও। আমি সেই নেতাকে জীবনে কখনো দেখিনি। ক্ষ্যাপা মানুষের মতো দ্রুত দরজাটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে জনতার বিশাল সমুদ্রে মিশে গিয়ে শেখ মুজিবের ভাষণ শোনার জন্য দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

চারটা দশ মিনিটে শেখ মুজিব মঞ্চে এসে গেছেন। দরজার সামনে সশস্ত্র সান্ত্রিরা আমার গতিরোধ করল। আমাকে বলা হলো:

'অত্যন্ত দুঃখিত স্যার, আপনি বাইরে যেতে পারবেন না।' সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, "কেন?" সহসা উত্তর এলো, কারণ-আপনি বন্দি।"

'কী, আমি একজন বন্দি? তা কি করে সম্ভব! তুমি না এইমাত্র আমাকে বলেছে, আমাদের দেশ মুক্ত।

হ্যাঁ, সত্যি স্যার, আমাদের দেশ আজ মুক্ত। বিনীতভাবে উত্তর দিয়ে সিপাইটি নিরুদ্দেশ হলো।

'সত্যিই কি মুক্ত!' অচেতনভাবে আমি চেয়ে রইলাম আমার কক্ষের বাইরে-মার্চরত সৈন্যদের গতিছন্দের দিকে। আবার পিঞ্জরাবদ্ধ হলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার আড়ষ্ট জিহ্বা উচ্চারণ করতে লাগল? এটা কি সত্যি! এটা কি সত্যি!! বারবার এই কথাগুলো আমার কানে ঘুরেফিরে বাজতে লাগল। বেদনাহত মনটা আমার কিছুতেই অনুধাবন করতে পারল না? কি সত্যি দেশের মুক্তি-না, আমার অন্তরিন? অন্তরিনা! আপাতদৃষ্টিতে সত্যি কিন্তু দেশের মুক্তি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ক্রমান্বয়ে বদ্ধমূল হতে লাগল।

সাথিরা আমার,

যদি দেশ মুক্ত হয়ে থাকে, তবে কেন আজ আমি বন্দিশালায়? এটা কোনো ধরনের মুক্তি-যেখানে স্বাধীন মাটিতে কোনো মানুষকে অন্যায়ের ছোবল থেকে রক্ষা করা যাবে না। ওই যে কান পেতে শুনুন, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা। আবার একরাশ স্লোগান ভেসে আসছে। ও হ্যাঁ, এখন বিকেল সাড়ে চারটে। মহাউল্লাসে অভিনন্দিত হয়ে শেখ মুজিব মঞ্চে পৌঁছে গেছেন। ঘোড়দৌড় মাঠের সামান্য দূরে একটা অশ্বত্থ

গাছের নিচে আমার ছোট বন্দিশালাটি। পত্র-পল্লবে মর্মর ধ্বনি তুলে শীতের ঠান্ডা বাতাস চুপি চুপি আমার কামরাটিতে প্রবেশ করছিল। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত-সমাহিত অথচ ভেতরে দহনের তীব্র জ্বালা। আমি আমার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম। যারা অদূরবর্তী কোণ থেকে উল্লাসের সমারোহ উপভোগ করছিল, তাদের চাইতেও সবকিছু অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আমি দেখতে পেলাম, অনুভব করলাম। এই ছোট্ট কক্ষটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম। যদিও জীবিত তবু অবচেতন মনের গভীরে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। বার বার উচ্চারণ করতে লাগলাম : বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ইতোমধ্যে কক্ষের দরজাটা 'কট' করে খুলে গেল। খোলার সাথে সাথে পোশাক পরিহিত একজন অফিসার আমার এই বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কথাটির পুনরাবৃত্তি করতে করতে আমার কক্ষে প্রবেশ করল। তিনি একজন যুবক মেজর।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান না বলে আপনারা বাংলাদেশ বলছেন কেন?

তাড়াতাড়ি উত্তর এলো, এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান মৃত-এখন এটা বাংলাদেশ স্যার। এছাড়াও সে বলে যেতে লাগল, দক্ষিণাঞ্চলে আপনার কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি আমরা।'

চট করে প্রশ্ন করলাম: কার কথা বলছেন আপনি? কার কার্যকলাপের কথা শুনেছেন?

'মাফ করবেন স্যার আপনি কি মেজর জলিল নন? ৯নং সেক্টরে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর আপনিই কি অধিনায়ক ছিলেন না?

কথাগুলো বলে তাড়াতাড়ি উত্তরের প্রত্যাশায় সেই যুবক মেজর আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমি যেন নির্জনতার পঙ্কিলে নিক্ষিপ্ত হয়েছি এবং উত্তর খুঁজে পাবার আশায় অন্যমনস্কভাবে হাতড়াচ্ছি। দূরে বহু দূরে। আমার মন ছুটে গেল। প্রত্যেকটি জিনিস আমার কাছে ভাস্বর হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি জিনিস পরিচিত সুরে আমার কানে বাজতে লাগল । তবু আমার স্মৃতির দর্পণ অসংলগ্ন এলোমেলো। বার বার স্মৃতিচারণ করলাম। হ্যাঁ মনে পড়েছে ১৯৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের মুলতানে সশস্ত্র বাহিনীর ১২নং ক্যাভালরি

রেজিমেন্টে কর্তব্যরত ছিলাম। তারপর দু'মাসের ছুটিতে ১৯৭১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আমি করাচি থেকে ঢাকায় আসি।

হ্যাঁ এটা সত্যি, আমি ছুটিতে এসেছিলাম। মনে পড়ে, আমার বিদায় বেলায় আমার বাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের কাছ থেকে কী সুন্দর, ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার পেয়েছিলাম। এখনো অবশ্য সেই দিনটির কথা আমার মনে পড়ে, যেদিন ১৯৬৫ সালে কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে দীর্ঘ কষ্টকর প্রশিক্ষণের পর ক্যাভালরি বাহিনীতে আমি প্রথম পদার্পণ করি। হ্যাঁ ঠিক আজকের দিনটির মতো। একাডেমি থেকে অফিসার হয়ে বেরিয়ে আসার দিনটিতেও নিজেকে কত একা মনে হয়েছিল। আমি যেমন নির্জনতার ঘা খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি-আমার মনে হয়, অন্য কারোর পক্ষে এতটা সহনশীল হওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ, নির্জনতা থেকে মুক্তি মানে জীবনের এক চরম ক্ষতি। ক্ষতি এই অর্থে, এই পরিবর্তনশীল বিরতিতে স্বল্পস্থায়ী নির্জনতা মানুষের মানসিক ও দৈহিক বন্ধ্যাত্ব লাঘব করে। মনকে উজ্জীবিত করে সতেজ চিন্তা, আশা ও উদ্দীপনায়। অপরদিকে দীর্ঘায়িত নির্জনতা বিরক্তিকর ক্লান্তির চাইতে মোটেই শ্রেয় নয়। কারণ, সময় দীর্ঘায়িত হলেই মানুষ ততটা তিক্ততার দংশন অনুভব করে না-যতটা বিরক্তি মনে করে ধরাবাঁধা ক্লান্তিতে।

মাথা নিচে পা উপরে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় যেভাবে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে ওঠে-এই ঝুলন্ত ক্লান্তির দংশনটাও তেমনি বেদনাদায়ক। কিন্তু ওই ঝুলন্ত দেহটাকে ভালো করে চাবুকে নিঃসাড় করে দিতে পারলে সব যন্ত্রণার অবসান হয়। সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নির্জনতাকে কারুর পক্ষেই বরাবরের জন্যে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদিও নির্জনতা কোনো কোনো সময় মধুর হয়ে ওঠে এবং এ নির্জনতাই আমার মনের অজ্ঞাতে চির সাথি হয়ে আছে। আমার শৈশবকালে এই ভয়ংকর নির্জনতা শোচনীয়ভাবে আমাকে পেয়ে বসেছিল। যদিও আমার ভেতরের প্রবল ইচ্ছাটা ছিল খেলার সাথিদের সাথে আনন্দে দিন কাটানো। ১৯৬৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই বিশেষ দিনটির কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে অত্যন্ত একা মনে হলো।

পশ্চিম পাকিস্তানের এবোটাবাদ জেলার কাকুল মিলিটারি একাডেমির সেই বিশেষ মুহূর্তটি আজ আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। ১৯৬৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। কারণ, সেই দিনটিতে মিলিটারি একাডেমির দু'বছরের কঠোর প্রশিক্ষণের পালা শেষ করে আমি অফিসার হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। সেই দিনটি সমস্ত ক্যাডেটদের জন্য মধুর ছিল। তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মাঝে ওদের আমি খুব উৎফুল্ল দেখলাম। ওই দিন সকাল দশটায় বিদায়ী কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা ছিল। সমস্ত ক্যাডেট জড় হচ্ছিল যার যার রাইফেল নিয়ে বিদায়ী কুচকাওয়াজে অংশ নেবার জন্য।

কিছু দূরেই প্যারেড ময়দান। বিরাট বাঁধানোর মাঠ। দূরে পর্বতমালার প্রাচীন বেষ্টনী। সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর শ্রেণিবিন্যাসের মতো সোজা পাইন গাছগুলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষেরা কুচকাওয়াজ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে। প্যারেড কর্মকর্তা ও কমান্ডারদের শেষ মুহূর্তের তদারক কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত মনে হলো। সহসা আমি সামরিক বাদ্য শুনতে পেলাম। আনুষ্ঠানিক পোশাকে তাদের রাজকীয় দেখাচ্ছিল। ব্যান্ডমাস্টার তার হাতের লাঠিটা একবার উপরে ছুড়ে দিয়ে পরক্ষণেই আবার হাতের মুঠোয় ধরে তার বাহাদুরির উৎকর্ষ দেখাতে ব্যস্ত। তার নিপুণ হাতের খেলা সামরিক সংগীত বা কুচকাওয়াজে ঘটায়নি কোনো ছন্দ পতন। প্রচলিত প্রথামাফিক বিদায়ী কুচকাওয়াজের জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত হতে লাগলাম।

বিদায়ী কুচকাওয়াজ আসন্ন। এই আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করার জন্য জুনিয়র ক্যাডেটরা সেখানে ছিল। বিউগল বেজে উঠল। কুচকাওয়াজের তালে তালে বাদ্যযন্ত্রগুলো সুরের ঝংকার তুলে এক মোহময় পরিবেশ তৈরি করল। অল্প কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী সৈন্যরা ছন্দময় গতিতে নেবে যাবে প্যারেড ময়দানে। বহু বছরের বুটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ময়দানের চেহারাটা বড় করুণ, বড় তুচ্ছ মনে হলো। আমার ভেতরের চিরঞ্জীব সত্তাকে কে যেন কঠিন হাতে চেপে ধরল । বাক রোধ হয়ে এলো আমার।

সাথিরা আমার,

বিদায় বেলার ব্যথাটা আজ কেন যেন তীব্রভাবে অনুভব করলাম। এই দু'বছরের প্রতি দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মাঠে কাটিয়েছি। বাস্তবিকই এর সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি-একাত্ম হয়েছি।

এখানে অনেক শিখেছি। শিখেছি সময়ের মূল্য ও শৃঙ্খলাবোধ হাঁটু পরিমাণ বরফের মধ্যে কঠিন শীতে ও মধ্যাহ্ন সূর্যের কঠিন তাপে এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আমার জীবনের পাতায় সংযোজিত হয়েছে-কী করে এক সাথে কাজ করতে হয় এবং আরো অনেক অভিজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ। আমাদের সাহচর্য এত গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল যে, এটা শুধু আমার স্মৃতিতেই বিরাজমান ছিল না-দু'বছরে অনেক সময় স্বপ্নের ঘোরে জীবন্ত হয়ে বিচরণ করত। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমার মনে হয় জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সাথিকে হারাতে যাচ্ছি।

চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাচ্ছি আমার প্রিয়তম বন্ধুকে, আমার পথের দিশারিকে। চরম অসহায়ের মতো আমার ভেতরটা কেঁদে উঠল। কারণ, অনুমান করতে পারলাম আমার সতেজ পাগুলো যা এতদিন জীবন্ত শক্তি ও উদ্দীপনার প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল তা যেন শ্লথগতিতে ক্রমেই নিস্তেজ হতে হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ক্লান্ত খচ্চরের পিঠে ভারি বোঝা চাপিয়ে জোর করে তাকে পাহাড়ে উঠানোর মত। মন আমার ভারাক্রান্ত। একদিকে ছেড়ে যাবার তীব্র বেদনা, অন্যদিকে নির্জনতার নির্মম চাবুকের দাহন। কারণ, আমার সফলতাকে স্বাগত জানাবার জন্য দর্শকদের ভেতর কেউ ছিল না। বিশেষ করে আমার কোনো দর্শক ছিল না। সফলতার উদয়লগ্নে কোনো নিকট-আত্মীয় বা আপনজন যদি তাকে অভিনন্দন না জানায়-প্রশংসামুখর হয়ে না ওঠে, তাহলে আমার মনে হয়, সফলতা অনেকাংশে তার তাৎপর্য ও আনন্দ হারিয়ে ফেলে। সেই দিনটিতে আমার বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। অফিসার হয়ে বেরিয়ে আসাটাকে কখনো আমার জীবনের। সফলতার মাপকাঠি বলে মনে করিনি; বরং সে সফলতাকে সিঞ্চিত করেছি হতাশা, দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জলে। ওটা সেই মুহূর্ত যখন আমি সফলতার কথা চিন্তা করিনি, শুধু কাছ থেকে নিরীক্ষণ করেছি।

অনুভব করেছি নির্জনতাকে। নির্জনতার চেহারাটাকে আজ যেন কাছ থেকে দেখলাম। এর চেহারাটা অশরীরী প্রেতাত্মার মতো। এর স্পর্শ সাংঘাতিক রকমের সংক্রামক। শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু দুঃখদৈন্যের বিলাপ। আলকাতরার মতো কাল। তবু আঁধারের বুক চিরে যে কেউ এর বিকলাঙ্গ চেহারাটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারে। বিদায়ের ব্যথা ও নির্জন ভয়াবহতার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে শূন্য হৃদয়ে আমি আমার শেষ কুচকাওয়াজ সমাধা করলাম। আমরা কুচকাওয়াজ করতে করতে মাঠের বাইরে গেলাম।

কুচকাওয়াজ পর্ব শেষ। ব্যান্ড মাস্টার ফিরে যাবার সুর বাজ্জাচ্ছিল। সে সুর স্পর্শকাতর, কত ছন্দময়। চারদিকে চেয়ে দেখলাম নতুন কমিশনড অফিসাররা একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আলিঙ্গন করছে। এমন কি চুম্বনও এই আনুষ্ঠানের একটি অংশ ছিল। হাসি, চিৎকার ও গুঞ্জরণে আনন্দের ঢেউ উঠছে। এরই মাঝে টের পেলাম, আমার চোখ দিয়ে আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমার হাতজোড়া সংকুচিত হয়ে আনমনে কোটের পকেটে জায়গা করে নিল। শেষবারের মতো বেদনাহত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম, প্যারেড ময়দানের দিকে। দূরের পর্বত শ্রেণি, নুয়ে পড়া পাইন গাছের দিকে অবারিত চোখ দুটি ছুটে গেল। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক টুকরো পাথর মাঠটার কোল থেকে তুলে নিলাম এবং আধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে আমার কক্ষের দিকে রওয়ানা হবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। আমরা যেখানে থাকতাম সেটা খালিদ কোম্পানির ব্যারাক নামে খ্যাত। দু'বছর ছিলাম এখন সহসা শক্ত মনটা আমার অবোধ শিশুর মতো হয়ে উঠল। সেই রকম শিশু যে তার মায়ের ওপর রাগ করে চলে যাওয়ার ভান করে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সে প্রতি মুহূর্তে মায়ের আদুরে ডাক আশা করে। স্নেহময়ী মায়ের কাছ থেকে সে ডাক অবশ্যই আসে এবং সেই আপাত অবাধ্য শিশুটি আরো উৎসাহ নিয়ে স্নেহময়ী মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, আমিও ঠিক ওইরকম একটি ডাক-ওই নির্বাক মাঠটা যাকে আমি প্রতিপদে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তার কাছ থেকে আশা করছিলাম। সত্যিই ওই মাঠটার কোলে ফিরে গিয়ে চিরদিনের জন্য আবার ক্যাডেট হব কিনা। ভাবছিলাম । কিন্তু

এই প্রসারিত নির্জন পথটা আমাকে টেনে উপরে নিয়ে গেল। স্থবিরের মতো হয়ে গেলাম। এলোমেলো পদক্ষেপে পা দুটো নেতিয়ে পড়ল। তবু প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলাম। আধ মাইলের এই পথটুকু আমার কাছে অত্যন্ত দীর্ঘ ও কষ্টকর মনে হলো। এর আগে এমন কষ্টকর পথ অতিক্রমের সম্মুখীন হইনি। যদিও এরকম একটা দীর্ঘ পথ প্রতিদিনই আমি উঠানামা করতাম। এরা আগে আমি কখনো ক্লান্তিবোধ করিনি। এত বিষণ্ন ও ক্লান্ত ছিলাম যে, এই দিনটিতে আমি যেন পুরাপুরি নিঃশেষ হয়ে গেলাম। উপরে ওঠার সময় আমাকে অনেক পিছনে ফেলে আমার হাত ঘড়িটা আগের চাইতেও সবেগে চলতে লাগল। এই উত্রাইটা বিখ্যাত 'পি এম এ' রাস্তা নামে পরিচিত। এই পথ ধরে অনেক দিন, অনেক রাত, অনেক সূর্যস্নাত প্রভাতে উঠানামা করেছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের একরাশ বিক্ষিপ্ত ছবি দিয়ে শেষপর্যন্ত আমার কক্ষে কোনো রকমে পৌছে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেই প্রেতাত্মাটা সাগ্রহে আমার জন্য বসে আছে।

মনে পড়ে, ক্যান্টিনের পাশ পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলা । এই ক্যান্টিনের পিছনে কিছু দূরে একটি ছোট পাহাড়। এটা সব ক্যাডেটদের কাছে নিলোর পাহাড় নামে সুপরিচিত। এই জায়গাটার সাথে আমার গভীর আত্মীয়তা জন্মে গিয়েছিল। নিলো নামের মাদকতায় এর সাথে আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠিনি। এই শৈলশৃঙ্গ নির্জন ও মৌন। কখন কোনো সন্ধ্যায় এর কোলে হরিণ-হরিণীকে আলতোভাবে এদিক-ওদিক বিচরণ করতে দেখে তন্ময় হয়ে গিয়েছি। শেষবারের মতো আমি দৃষ্টি মেলে দিলাম। কিন্তু কোনো হরিণ-হরিণীকে দেখতে পেলাম না। নিলোর শৈলশৃঙ্গকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। কারণ, এর কাছে আমি ঋণী। এর দৃশ্যরাজি অনেক শীত-গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমার মনে যুগিয়েছে উদ্দীপনা। আমি এখনো জানি না কেন এই শৃঙ্গটাকে 'নিল' নামে ডাকে। কারণ, লাহোর চিত্র জগতের চিত্র তারকা নিলোর সাথে এর কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনি। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কোনো সুন্দরী বালিকার স্ফীত বক্ষ। এছাড়া আর কোনো মিল নেই। হয়তো কোনো দুষ্ট ছেলে নিলোর উন্নত বক্ষের সাথে এর মিল খুঁজে পেয়েই এমন কল্পনাটি করে থাকবে।

কিন্তু প্রিয় সাথিরা,

আমার এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে ওই গল্পের সাথে মুক্ত করবেন না। নিলোর শৃঙ্গ আমার কাছে গভীর অর্থবহ। নিলোর শৈলশৃঙ্গ অনেক দূরে-তার চাইতেও দূরে প্যারেড ময়দান। তৎসত্ত্বেও এর প্রভাব এখনো আমার কাছে ভয়ানক তাৎপর্যপূর্ণ।

আমার শূন্য হৃদয়ের কঠিন স্মৃতিতে ওই শৈলশৃঙ্গরাজি, পর্বতমালা, পাইন গাছগুলো ও প্যারেড ময়দান আজ সংকুচিত, ক্রন্দনমুখর এবং কণ্টকাকীর্ণ।

ওগুলো আঙুল দিয়ে আমার ক্ষুদ্র সত্তাকে যেন বার বার উপহাস করছে। আবার সেই নির্জনতা থেকে ১২ ক্যাভালরি রেজিমেন্টে অফিসার হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, এটা একটা স্থান যেখানে আমি শুধু শিখেছি। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেজর শাহ রফি আলমের প্রশংসনীয় নেতৃত্বে শিক্ষার বিরাট অঙ্গন আমার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রথম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল গুল হাসান খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। সেই দিনগুলো আজও আমার মনে পড়ে। আমার ক্ষয়িষ্ণু অতীতের স্মৃতিচারণ করলে আজও আমি অনুভব করি, সেই ট্যাংকে চড়ার ঝাঁকুনি- সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলো। যখন আমার ট্যাংকগুলো শক্ত লোহার শিকল পড়ে কর্কশ ধ্বনি তুলে পৃথিবীর বুকটাকে দুমড়ে মুচড়ে একরাশ ধুলো উড়িয়ে মরুভূমির ভেতর দিয়ে ঝড়ের বেড়ে ছুটতো। ধুলো মেখে, কোলাহল তুলে ভয়ংকর গতিতে নিচের পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে সবকিছুকে নবীন তেজে সামনে ঠেলে এগিয়ে যেত-এই লোহার দৈত্যগুলো।

ট্যাংকে চড়ে মরুভূমি পার হতে আমার বড় ভালো লাগত। ভালো লাগত সেই জীবন্ত উত্তেজনা যখন অন্ধ দৈত্যের মতো হেলে-দুলে ঘুরপাক খেয়ে মরুভূমির ভেতর দিয়ে ট্যাংকগুলো ছুটে চলতে। যার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই তার কাছে সেই চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলোর মূল্যবোধ অপরিচিত। ওই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত আমি প্রাণভরে উপভোগ করেছি।

এবং ও থেকে আমার জীবনের গতি ও শক্তি সঞ্চয় করেছি। এর সাথে সাথে অর্জন করেছি সামনে অজানার উদ্দেশ্যে আমার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবার অস্থিরতা ও অদম্য তৃষ্ণা।

নির্দিষ্ট কার্যক্রমে আবদ্ধ, ধরা-বাঁধা জীবন আমার কাছে বিরক্তিকর লাগল। ফলস্বরূপ আমার কাছে দৃষ্টি পথে নেমে এলো এক অর্থপূর্ণ ঔদাসীন্য। ট্যাংকের উপর দিয়ে অনেক উঁচুতে আমার দৃষ্টি মেলে দিলাম। ট্যাংক আর আমাকে আনন্দ দেয় না, ওই বোবা লোহার পাতগুলোর সাথে এক সঙ্গে বাস করা আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করলাম। লোহার ওই ট্যাংকগুলোর গতিছন্দে বিমোহিত হওয়ার চাইতে নিপীড়িত মানবতার সান্নিধ্যে পেতে মন আমার বেশি ঝুঁকে পড়ল।

১৯৭০ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবিকপক্ষে কোনো কিছুই আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। চারদিকে সুখ ও বিলাসিতা আমার শান্তি ও আনন্দের মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করতে লাগল। বিরাম ও নির্জনতা গোপন পথে আমার কাছে এসে চুপি চুপি আলাপ শুরু করল। স্বপ্ন, ইচ্ছা, দুশ্চিন্তা ও উদাসীনতা আমার কাছে বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে এলো। এটা সেই আলোড়ন, এটা সেই বিপ্লব যার বহিঃকাশ অত্যাসন্ন। খোদা, ধর্ম ও নিপীড়িত মানবতা, রীতিমত আমার মনের খোরাক হয়ে দাঁড়াল। মাসের পর মাস ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। যা হোক, আমার অস্থিরতা প্রশমনের কোনো লক্ষণ দেখলাম না। এই জ্বলন্ত প্রশ্নগুলো আমার কল্পনাশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিল।

কেন আমি এত অস্থির? আগামী দিনে কী আসছে? হ্যাঁ, কিছু একটা এসেছিল। আমার ছুটি। সুতরাং ১৯৭১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটিতে এলাম। বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামে আমার বাড়িতে পৌছুলাম। ওই বছরের ছুটির দিনগুলো আমার কাছে বোঝার মতো লাগল । কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের চরম অস্থিরতায় আমি ক্লান্তিবোধ করলাম । ১৯৭১ সালের মার্চ মাস। শহর ও গ্রামের আনাচে-কানাচে চরম উত্তেজনা। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামরিক মহল সর্বত্রই চরম অস্থিরতা। আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরাট সাফল্যে সারা দেশে প্রাণের বন্যা বয়ে গেল। স্বায়ত্তশাসন পাবার বিরাট উদ্দীপনায় সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির অন্তর উদ্ভাসিত হঠাৎ একটি বিরাট ঘূর্ণিঝড়ে

শেখ মুজিব ভেসে গেলেন। ভূলুণ্ঠিত হলো লাখো লাখো নিরীহ বাঙালি। এটা অতি সত্যি। কারণ, আমার মনে পড়ছে আমিও হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি, মুক্তিসেনাদের সংঘবদ্ধ করেছি, সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছি। মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছি। হ্যাঁ, বিজয় উল্লাসে আমিও শরিক হয়েছিলাম। বিজয়ীর বেশে খুলনায়ও প্রবেশ করেছিলাম।

পাক হানাদাররা বাংলার দুর্জয় মুক্তিসেনাদের কাছে মাথা নুইয়ে আত্মসমর্পণও করেছিল। আমাদের সাথে ভারতীয় মিত্রবাহিনীও ছিল। এটা আমাদের বিজয়, আমাদের মুক্তি! এ বিজয় অর্জন করেছে বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ই. পি. আর।

ভারতীয় সৈন্যরাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কেউ কেউ জীবনও বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু-

হ্যাঁ, ওদের সাহায্যের ভেতরে একটা বিরাট কিন্তু রয়ে গেছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে তারা বাংলাদেশে লুট করেছে। দেশ মুক্ত হবার পর, বিশেষ করে খুলনা ও যশোরে তাদের আমি লুট করতে দেখেছি। তারা জঘন্যভাবে লুট করেছে। চামড়া ছিলে দেশের আত্মাটাকে উপড়ে নিয়েছে। ভারত সরকার যদি মানবতার খাতিরে বাংলাদেশকে সাহায্য করে থাকে তাহলে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, আমাদের মতো একটি দরিদ্র যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে লুট করে কত বড় হীনম্মন্যতার পরিচয় দিয়েছে। আদৌ এরূপ পরিকল্পনা যদি তাদের ছিল, তাদের অন্তত তারা কয়েক বছর অপেক্ষা করতে পারত। তারপর আরম্ভ করত রক্ত চুষতে। কিন্তু আমাদের শিশু রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই কি লজ্জাহীনের মতো এসব জঘন্য কাণ্ডকারখানা করল। দেশ মুক্ত হবার পর, ১৯৭১ সালের ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাত্রে ভারতীয় সৈন্যরা এসব কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। মিত্রবাহিনী রাতে কার্ফিউ দিয়ে ওরই ছত্রছায়ায় পরিকল্পিত উপায়ে দোকান- পাট, ফ্যাক্টরি, পোর্ট, রেডিও স্টেশন ও নিউজ প্রিন্ট লুট করেছে। এমন কি ছোট ছোট বাড়িঘরও বাদ দেয়নি। সারা রাত ধরেই এই লুণ্ঠন চলে। সব জায়গা থেকে আমার কাছে ন্যক্কারজনক লুণ্ঠনের সংবাদ আসতে লাগল। শুধু তা-ই নয়, ট্রাক ভর্তি করে পাক-হানাদারদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রেশন, কাপড়-চোপড়, গাড়ি, সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদি বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে গেল । যেন তারা এদেশটা জয় করেছে।

সাথিরা আমার,

মনে রাখবেন, ভারত সরকার আমাদের সাহায্য করেছে, মুক্তি এনে দেয়নি। ক্ষমতা দখল করার জন্য মি. তাজউদ্দিনের পুতুল সরকার ও সাক্ষীগোপাল মন্ত্রীরা যেকোনো দলিল বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে থাকুন না কেন, কিন্তু আমি একজন মুক্তি সংগ্রামী হিসেবে জোর দিয়ে বলতে চাই, প্রভু ভারতকে খুশি করার জন্য এই দেশকে বিক্রি করার লাইসেন্স কেউ তাদের দেয়নি। আমার মনে পড়ে, ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর এই দুর্ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিবরণ লিখে ওদের অধিনায়কের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মি. তাজউদ্দিনের কাছেও এক কপি দিয়েছিলাম। বাধা দিয়েছিলাম- প্রতিবাদ করেছিলাম। এলাইড কমান্ডার মেজর জেনারেল দলবীর সিংহকে বলেছিলাম। লুটপাট বন্ধ করো, তা না হলে বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরবে এবং ১৭/১৮ ডিসেম্বর রাতে সহ্য করতে না পেরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলী হয়েছিল বেশকিছুক্ষণ ধরে।

প্রিয় সাথিরা আমার,

এই প্রতিবাদ লিপি পাঠাবার পর সব যেন কুজঝটিকাময়, কর্দমাক্ত হয়ে উঠল। বিজয়োল্লাসে এলো নাটকীয় পরিবর্তন। মনে হলো দাসত্বের শৃঙ্খল আমাদের এই শিশু রাষ্ট্রকে মুক্ত বাংলাদেশকে দ্রুত ধাওয়া করছে। দেশপ্রেমিক সকল মুক্তিযোদ্ধাকে নির্মূল করার জন্য ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠল। আর এই ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার আমি। আমি ভালো করে স্মরণ করতে পারি-আমি মেজর জলিল। ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর যশোরের কাছাকাছি ওৎ পেতে আমাকে বিনা কারণে বন্দি করা হয়েছিল। তারা আমাকে মেরে ফেলত যদি আমার সঙ্গে অন্য ১৫ জন সাথি না থাকত। অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে যশোর ক্যান্টনমেন্টের একটি নির্জন কক্ষে আমাকে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্রিগেডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?"

তিনি উত্তর দিলেনঃ তুমি বিদ্রোহী।

আমি উত্তর দিলাম: কী করে এমন মন্তব্য করতে পারেন? শুধুমাত্র আপনাদেরকে লুট করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছি বলে? আমার কথা শুনে তিনি-তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

সাথিরা, দেশের সম্পদকে বিদেশি লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবাদ করলে যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি অপরাধী। বিদেশি শক্তির আগ্রাসী ছোবল থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য বাধা দেয়াটা যদি বিদ্রোহ হয়, তাহলে আমি বিদ্রোহী। যে মাটিতে মূল্যহীন, ভিত্তিহীন এবং দেশপ্রেমিকের ভূমিকা নিলে অপরাধী বলে গণ্য হতে হয়, সে দেশকে কোন কারণে আমি স্বাধীন বলে মেনে নেব? যে বাংলার মাটিকে আমি এত ভালোবেসেছি-সেই মুক্ত মাটিতে আমি বন্দিশালায় কেন?

তোমার চাইতেও
আমি আমার দেশকে ভালোবাসি
আমি তোমার
তুমি আমার ভালোবাসা
সমস্ত পৃথিবীর ভালোবাসা এবং
আমার জীবনের চাইতেও
তোমাকে আমি বেশি ভালোবাসি
হে আমার রূপসী বাংলা।

সাথিরা আমার,
বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এটা সত্যিই, এই রূপসী বাংলাকে আমি প্রাণের চাইতেও ভালোবাসি। তাই আজ আমার প্রশ্ন: কেন আমি আজ বন্দিশালায়? কেন ভারত সরকার এ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো? আমি জানি, পৃথিবীতে সমস্ত কেন'র উত্তর এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। কিন্তু নিশ্চিত যে, আমাদের পুতুল সরকার। জবাব না দিলেও মহাকালের কষ্টিপাথরে এর বিচার একদিন হবেই।
সবকিছু এক্ষেত্রে গুলিয়ে ফেলার আগে আমার স্মৃতিচারণ লিখতে দিন। আমার মনে হয়, এই স্মৃতিমন্থন একটা পূর্ণাঙ্গ গল্পের রূপ নিতে পারে । স্মরণ রাখবেন, এটা আমার ক্ষীণ স্মৃতিমন্থনের ফল। একজন গরিব সৈনিক ছুটিতে এসেছিল। ছুটি থেকে মুক্তি সংগ্রামে। তারপর? তারপর তার গন্তব্যস্থান বন্দিশালা অথচ এই বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম.....!

বরিশালের রণাঙ্গন

এটা কি করে হলো.....?

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ। বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামে আমার দেশের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। সামরিক চক্র যেকোনো সময় নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কা করে স্কুলের ছাত্রদের সামরিক ট্রেনিং দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ছাত্র-জনতার মিছিল, স্লোগান ও উত্তেজনা। প্রচণ্ডগতিতে স্বাধীনতার জোয়ার বইতে আরম্ভ করল। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র জয় বাংলার প্রতিধ্বনি। হাট, বাজার, দোকান, অফিস-আদালত সর্বত্র অস্থিরতা অস্থির। মেহনতি জনতা। ধর্মঘট, বিক্ষোভ, বয়কট, কারফিউ। আবহাওয়া উত্তপ্ত। বিশৃঙ্খলা, গোলমাল ও জনতার বিক্ষোভ প্রশাসনিক যন্ত্রটাকে প্রায় বিকল অবস্থায় নিয়ে এলো। তারপর শেখ মুজিবের অসযোগ আন্দোলনের ডাকে পুরাপুরি ভেঙে পড়ল সে সামরিক শাসনব্যবস্থা।

বিশৃঙ্খলার ঢেউ উঠল দেশের সর্বত্র। শেখ মুজিব শিগগিরই স্বাধীনতা ঘোষণা করবে- এই গুজবে বাতাস ভারাক্রান্ত। সাড়ে সাত কোটি মানুষের কানে বাজতে লাগল আগামী দিনের স্বাধীনতার তুর্থনাদ। আশা-নিরাশার সন্দেহ দোলায় বিহ্বল দেশের প্রতিটি মানুষ সেই চরম ঘোষণাটির জন্য উদগ্রীব। সবাই এই আশায় বুক বেঁধে আছে-৭ মার্চ শেখ মুজিবের কণ্ঠ থেকে ঐতিহাসিক ঘোষণাটি বেরিয়ে আসবে।

আশা-নিরাশা ও চরম উত্তেজনার মাঝখানে বেজে উঠল অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। একদিকে গণবিক্ষোভ, অপরদিকে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের বৈঠকের পর বৈঠক। উদ্দেশ্য, শেখ সাহেবের ৬ দফা দাবির কিছু কাটছাঁট করা যায় কিনা। ভুট্টো সাহেব ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করায় শেখ সাহেব ভয়ানকভাবে ক্ষেপে গেলেন। কারণ, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। শেখ সাহেব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সর্বস্তরের লোক-সাধারণ মানুষ থেকে উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসার, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সবাই এ ডাকে সাড়া দিলেন। এমনকি ঢাকা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করলেন। এতেই প্রমাণিত হয়, অসহযোগের ডাক

সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান অপমানিত হয়ে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সতর্ক থাকতে বললেন। যদিও সামরিক চক্র তলে তলে তলে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তবু ঢাকায় অবস্থিত বাঙালি সামরিক অফিসাররা বেশ আগেভাগেই ওদের দুরভিসন্ধির কথা টের পেয়েছিল। কতক অফিসার খোলাখুলিভাবে এ ব্যাপারে আমার সাথে আলাপও করেছিলেন। এছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনেক লোক টের পেয়েছিলেন যে, বিমান ও নৌ-পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় সৈন্য আমদানি করা হচ্ছে। এ ধরনের আরো খবর লোকের কানে এসে পৌঁছুতে লাগল। আমি খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। কারণ, এ রকম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে অলসভাবে বসে থাকব- এটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। মনে পড়ছে, ৫ মার্চ গ্রামের বাড়িতে আমি যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন স্থানীয় এক দল ছাত্র 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব', ইয়াহিয়া যদি বাঁচতে চাও-বাংলা ছেড়ে চলে যাও, আমাদের একই কথা- স্বাধীনতা স্বাধীনতা ইত্যাদি ধ্বনি দিতে নিতে আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ওদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ও 'তোমরা ওভাবে চিৎকার করছ কেন? কী চাও?

ওরা উত্তর দিল: আমরা বাংলাদেশ চাই। পূর্ব পাকিস্তান চাই না।' সামরিক চক্রের কাছ থেকে এটা কীভাবে পেতে পার?

'আমরা অবশ্যই পারব। আমরা এর জন্য যুদ্ধ করব।'

'কী নিয়ে যুদ্ধ করবে? খালি হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে একটা দক্ষ সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবে?

'শেখ সাহেব ভারত থেকে শিগগিরই অস্ত্রশস্ত্র পাবেন। 'এ কথা তোমাদের কে বলল?'

'আমাদের কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ।'

'তোমরা অস্ত্র চালাতে পার? না, আমরা শিখে নেব।

শেষের উত্তরটা শুনে আমার ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার সুপ্ত উৎসাহ দপ করে জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, ওদের ট্রেনিং দিতে হবে। এখনই ট্রেনিং দিতে হবে। ওদের আছে উৎসাহ, আমার কাছে উৎসাহ এবং অভিজ্ঞতা উভয়ই। তারা বাংলাদেশ চায়। বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করবে। এই

কথাগুলো মধুর ঝংকার তুলে আমার কানে বাজতে লাগল। কিন্তু একই সঙ্গে জানা-অজানা অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় জমাল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হিসাব করে, যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে, মুহূর্তের উত্তেজনায় একটা দক্ষ উন্নত শ্রেণির অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে গিয়ে কী ভয়ংকর ধ্বংসলীলা নেমে আসবে জাতীয় জীবনে- তা ভালো করেই জানতাম। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে, শেখ সাহেব ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাবেন এবং আদৌ পাক-সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা নেবেন। কারণ, তিনি একজন বিপ্লবী নেতা নন এবং এর আগে তার কোনো বিপ্লবী কার্যকলাপের কথা। শুনিনি। তাহলে পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসংগ্রামে শেখ মুজিবের ভূমিকা কী হবে?

ছেলেদের শেষ উত্তরটা আমার মনে পড়ল, না- আমার শিখে নেব।
আমি গোপন সম্পদের সন্ধান পেলাম। এ সম্পদ হলো তেরো বছর থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত তরুণ মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়সংকল্প ও অস্ত্র চালনা করার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রবল স্পৃহা। জাত
আমি জানি, দেশপ্রেম যখন নিঃস্বার্থতার মাপকাঠিতে পরিপক্ব হয়, তখনই পরাধীনতার শৃঙ্খল চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অভিপ্রায়ে কোনো ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা জন্মে। ওদের ঔৎসুক্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। যাতে করে হালকা ধরনের অস্ত্রপাতি ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ওরা নিতে পারে সেজন্য একটা ছোটখাটো পরিকল্পনা নিলাম এবং ওদের সবাইকে ৬ মার্চ সকাল দশটায় উজিরপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলে দিলাম। অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেব- এই আশ্বাস দেয়ায় ছেলেরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। উৎসুক দৃষ্টি মেলে ওরা সমস্বরে বলে উঠল, 'স্যার, দেখবেন শেখ সাহেব ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন।'
বিভিন্ন ধ্বনি তুলে ছেলেরা অদৃশ্য হলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলাম। উত্তেজনা, বেদনা ও আনন্দের অদ্ভুত অনুভূতিগুলো আমাকে মোহাবিষ্ট করে রাখল।

৭ মার্চের মাত্র আর একদিন বাকি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য এই দিন হয়তো কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়া

হবে। অনুমান করা হয়েছিল যে, ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। ৭ মার্চ ছেলেদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেব বলে কথা দিয়েছিলাম। ৬ ও ৭-তারিখের সামান্যতম ব্যবধান।

এই সংকীর্ণ সীমারেখায় দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষের মন কখনোবা শূন্যতার বিরাট গহ্বরে ছিটকে পড়ে আবার কখনোবা শক্তির প্রাচুর্যে সজীব হয়ে ওঠে।

উত্তেজনা ও শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর রইলাম। সুতরাং ৬ মার্চ উজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে কিছু রাইফেল ধার দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। কিন্তু সে দিতে অস্বীকার করল। দ্বিতীয়বারে তাকে রাইফেল দিতে বাধ্য করা হলো। ১৫ জন ছাত্রের একটি দলকে সবুজের গালিচা বিছানো একটি মাঠে একজন হাবিলদারের তত্ত্বাবধানে ট্রেনিং দেয়া শুরু হলো। ৬ মার্চ গড়িয়ে বহু প্রতীক্ষিত ৭ মার্চ এলো। যুবকদের অন্তর উত্তেজনা ও উদ্বেগে স্পন্দিত। বয়স্ক লোক ভীতি ও অনিশ্চয়তার মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত। দু'এর মাঝখানে আমার জায়গা খুঁজে পেলাম। মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি স্থির প্রতিজ্ঞ। ট্রানজিস্টারে ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে শেখ সাহেবের ঐতিহাসিক ভাষণের সময়-সংকেত ঘোষিত হলো। মন দিয়ে ভাষণ শুনছিলাম। ভয়ানক উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম, এইবার বুঝি স্বাধীনতা ঘোষণার চরম লগ্নটি আসবে। কিন্তু ঘোষণার খবর আর এলো না। শুধু শেখ সাহেব বললেন, এবারের সংগ্রাম-মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,.....প্রতি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। কিন্তু বক্তৃতার কোথাও কোনো প্রস্তুতির ইঙ্গিত ছিল না। তাঁর ভাষণে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সমর কৌশলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের চেয়ে শব্দের ঝংকারই ছিল বেশি। তাঁর বক্তব্যে একজন বিপ্লবী নেতার চারিত্রিক দৃঢ়তা-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন আমি খুঁজে পাইনি।

২৫ মার্চ। নিরীহ মানুষের সস্তা রক্তে সারা বাংলাদেশ লালে লাল । এত রক্ত খরচ করে, এত বড় ধ্বংসযজ্ঞের সম্মুখীন না হয়েও ৭ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হতো। ছুটিতে থাকা একজন নগণ্য

সৈনিক হিসেবে আমি এভাবে চিন্তা করেছিলাম। ৭ মার্চ শেখ সাহেব কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারায়, নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমগ্র জাতির দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে এলো। ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম এবং কিছু একটা করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা কথা মনে করে সুখী হয়েছিলাম যে, ছেলেদের অস্ত্র চালনার শিক্ষা দেয়ার জন্য বেশকিছু সময় হাতে পাব। ট্রেনিং কর্মসূচি এগুতে লাগল। চিন্তা করতে লাগলাম, জেলাভিত্তিক ট্রেনিং ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা। এজন্য আমি বরিশালে এসে গণপরিষদ সদস্য মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি বরিশালে 'মঞ্জু ভাই' হিসেবেই সমধিক পরিচিত। আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী একজন আইনজীবী। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমার কর্মসূচির কথা মন দিয়ে শুনলেন। তিনি অমায়িক ও ভদ্র। চারদিকেই লোকজন সবসময়ই ভিড় করে থাকত। বরিশালের যুবকদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেয়ার কথা তার কাছে খুলে বললাম এবং একই সঙ্গে যারা বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক ট্রেনিং-প্রোগ্রাম চালু করার জন্য একটা পরিকল্পনা পেশ করলাম।

মঞ্জু সাহেব পরিকল্পনাটি খুবই পছন্দ করলেন। কিন্তু এখনই এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। অবশ্য তিনি বললেন যে, তার দলের নেতা শেখ সাহেবের সাথে আলাপ করে এবং তার অনুমোদন নিয়ে যা হয় একটা কিছু করবেন। এই লোকটিকে তখনই আমার খুব ভালো লাগল। কিন্তু ওই আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ও অহেতুক বিলম্ব আমি পছন্দ করতে পারলাম না। কারণ, জানতাম বিলম্ব শুধুমাত্র ধ্বংসই ডেকে আনবে। মঞ্জু সাহেবকে কতকগুলো প্রশ্ন করলাম সাতই মার্চ ওই রকম উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিয়ে শেখ সাহেব কি আগে থেকেই শুত্রুপক্ষকে সতর্ক করে দেননি?'

মি. মঞ্জু উত্তর দিলেন: যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। আপনি কি মনে করেন না যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যেকোনো সময় নিরীহ নির্দোষ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? তাতে কী হবে? আমাদের নেতা যেকোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।'

'শেখ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আপনার কি সময় হবে?

মি. মঞ্জু উত্তর দিলেন: ১৫ মার্চ ঢাকা যাচ্ছি। আমি চেষ্টা করব। মনে রাখবেন, শেখ সাহেব সবকিছু জানেন, সবকিছু বোঝেন। এ অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এই কথাগুলো যেকোনো সাধারণ লোকের কাছে আপ্ত বাক্যের মতো শুনাত। কিন্তু দুর্যোগের ভয়াল দিনগুলোতে শেখ সাহেব কোনো সুষ্ঠু নেতৃত্ব দিতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এ সন্দেহ, এ ভয় ভবিষ্যৎ মুক্তি সংগ্রামের গতিধারা সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে দিল।

'শেখ সাহেব সবকিছু জানেন'–এই স্তোক বাক্যটি তার দল ও অনুগামীরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু এ বাক্যটির অন্তরালে চারদিকের বাস্তব সমস্যাবলি সম্বন্ধে শেখ সাহেবের সার্বিক অজ্ঞতারই পরিচয় পাই বেশি। একটা বড় রকমের জটিল 'ধাঁধা' তার উত্তেজক স্বরের গণ্ডির মধ্যে সংশয় চিত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য মি. মঞ্জুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তার কক্ষ ত্যাগ করলাম। সেই সঙ্গে সৈনিকের আশ্বাস দিয়ে এলাম। 'মঞ্জু ভাই, আমার ভয় হয় পাক সেনাবাহিনী শিগগিরই হামলা চালাবে। আমি আপনার পাশেই আছি। দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন। আমি আমার গ্রামের বাড়িতে থাকব।

মি. মঞ্জু ১৫ মার্চ ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি উজিরপুরে ফিরে এলাম।

১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ সময়টা অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। উত্তেজনার ঢেউ ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে গিয়েও লাগল। তারা সমস্বরে গেয়ে উঠল। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' সর্বস্তরের লোক উত্তেজনার অগ্নিবন্যায় উন্মত্ত। জনতা স্বাধীনতার আশ্বাস পেয়ে শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলনকে দুর্বারগতিতে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পাক-সামরিক বাহিনীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদের রোষ পুঞ্জীভূত হলো আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের জনগণের ওপর। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ আসতে লাগল যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাহাজ ও বিমানযোগে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামও অন্যান্য জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে যে বাঙালি সামরিক অফিসাররা ছুটিতে ছিল তাদের ডেকে পাঠানো হলো।

আমার ছুটি ছিল ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। মার্চ মাসের ২০ তারিখ কাজে যোগদান করার জন্য টেলিগ্রাম মারফত আমাকে ডেকে পাঠান হলো। সামরিক হেড কোয়ার্টারের এই পদক্ষেপে আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম, পূর্ব বাংলার এই আন্দোলন বন্ধ। করার জন্য সামরিক চক্র কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছে। আমি ভয়ানক অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়লাম। নিজেকে বড্ড একা মনে হলো। হাতে অল্প সময় মাত্র। সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ মার্চ। প্রথমবারের মতো সামরিক আদেশ অমান্য করলাম। নির্দেশমত ২০ তারিখে কাজে যোগদান থেকে বিরত রইলাম।

এ ঘটনার পর বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে মন স্থির করলাম।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ ঢাকায় আবার গণপরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। যদিও পূর্ব বাংলার জনগণ ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সাথে পুনর্বার বৈঠকের পক্ষপাতি ছিল না। তবু কেন জানি না শেখ সাহেব ও তাঁর নবনির্বাচিত দলীয় সদস্যরা বৈঠকে বসতে রাজি হলেন। এ থেকেই জনগণের মনে সংশয় দেখা দেয় যে, শেখ সাহেব কি নতুন জাতির পিতা হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন? কারণ, এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায়, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এমনকি একজন সাধারণ লোকও বুঝতে পেরেছিল যে, আলোচনা বৈঠকে ৬ দফা উত্থাপন করে পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়। ইয়াহিয়ার প্রলোভন ও স্তব বাক্যে শেখ মুজিব ও তাঁর পারিষদবর্গ আশ্বস্ত হয়ে ২৫ মার্চের গণপরিষদ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও পূর্ব বাংলার অন্যান্য ঘাঁটিতে যে সামরিক তৎপরতা চলছিল, তার দিকে মোটেই তাঁরা আমল দেননি। ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব বাংলা পৃথিবীর সমস্ত রাজনীতিবিদ ও সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো।

শিশির-সিক্ত পত্রপল্লব ঠান্ডা বাতাসের কোমল স্পর্শে নিঃসাড়। তবু বাতাসে শ্বাস রোধকারী কী যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল। অজানা ভয় প্রেতাত্মার মতো সারা দেহমনে জেঁকে বসল। বোধহয় এই রাতে নিপীড়িত-নির্যাচিত

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তর ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভেবেছিল, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নিগড় থেকে মুক্তিলাভের জন্য আওয়ামী লীগ তাদের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। আমি নিজেও ওই রাতে ভয়ানক অস্থির ছিলাম। সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ২৫ মার্চের গভীর রাতে সামরিক চক্র তার সমস্ত পশুশক্তি নিয়ে অতর্কিতে ঘুমের ঘোরে বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
জ্বলতে লাগল ঢাকা। জ্বলতে লাগল গ্রামবাংলা। পিশাচের উল্লাসে রূপসী বাংলার শ্যামল বুকটা ক্ষতবিক্ষত। প্রচণ্ড রক্তের জোয়ার। সে জোয়ারের উৎসমূল গুলশান, বনানী, ধানমণ্ডি নয়। নয় হোটেল পূর্বাণী, কন্টিনেন্টাল। তার উৎসমূল অবহেলিত নোংরা বস্তি। সে বস্তির চারদিকে কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরেছে এদেশের মেহনতি মানুষ।

২৬ মার্চ ভোর সাতটায় দু'জন লোক মোটর সাইকেলে আমার গ্রামের বাড়িতে এলো। অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে দু'জনেই, একসঙ্গে বলে উঠল : স্যার, মঞ্জু ভাই আপনাকে এখনি বরিশাল নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। সামরিক বাহিনী শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করেছে। ট্যাংক ও মেশিনগান চালিয়ে ঢাকায় তারা বহু নিরীহ লোককে হত্যা করেছে। সারা ঢাকা শহর মানুষের রক্তে ভাসছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের কথাগুলো শুনলাম। কারণ, আমি আঘাতও পাইনি বা আশ্চর্যান্বিত হইনি। শেখ সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রিত্বের আশা করেছিলেন, তখনই আমি আশঙ্কা করছিলাম এরকম একটি বিপর্যয়ের। একজন সৈনিক ও একজন রাজনীতিবিদের চিন্তাধারার মধ্যে এটাই প্রধান পার্থক্য।
মানসিক দিক দিয়ে আমি এই অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলাম। ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গ্রামের ছোট্ট সবুজ গাছগুলোর শ্যামলিমায় দৃষ্টি মেলে দিয়ে অন্তরে অনুভব করলাম, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা প্রিয় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এক সাগর লাল রক্তের ভেতর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেবে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কঠিন শপথ নিয়ে আমার স্নেহময়ী মায়ের পা ছুঁয়ে বিদায় চাইলাম।

এ গরিব সৈনিকের জীবনে এ মা-ই একমাত্র গর্বের বস্তু। বাপকে দেখিনি। এ দুখিনী মায়ের একমাত্র ছেলে আমি। সজল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললাম? মা, তুমি দোয়া কর, আমি যেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারি।'

সেই কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল বেলার কথা আমার মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে, স্নেহময়ী মায়ের ঝাপসা চোখ দুটি। তার একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে দিতে তিনি হয়তো মনে মনে বেদনা অনুভব করছিলেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র সান্ত্বনার বস্তুকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিয়ে তিনি একটা মহৎ কাজের জন্য চরম ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মোটর সাইকেলে লাফিয়ে উঠলাম এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম।

আমার বাড়ি থেকে বরিশাল শহর ১২ মাইল দূরে। মাঝপথে দুটো নদী। এই নগণ্য পথ মোটর সাইকেলে অতিক্রম করতে আমার এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগত না। কিন্তু খেয়া না থাকায় এবং পথে মাঝে মাঝে বাধা থাকায় বরিশাল শহরে পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল। স্থানীয় জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেরাই পথে এই অবরোধের সৃষ্টি করেছে। এই বিলম্বের জন্য মনে মনে বিরক্ত অনুভব করছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের এই মানসিক প্রস্তুতি দেখে খুবই খুশি হলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, কী করে রাতারাতি এত বড় এক একটা গাছকে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়েছে। কী করে এতগুলো খালি পিপা এবং এত বড় ভারি ভারি জিনিস রাস্তার ওপর জড় করে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক কষ্টে বরিশালে মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর বাসায় গিয়ে পৌছলাম। সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা অবিশ্বাস্য। ২৬ মার্চ ভোরে মি. মঞ্জু পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্রপাতি নিয়ে আসেন। দেখলাম, খুব ব্যস্ত সমস্তভাবে কোনো হিসেবে ছাড়াই ছেলেদের মধ্যে তিনি রাইফেল বিতরণ করছেন। আমি এসে পড়তেই তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি যেন কতকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন: মেজর সাহেব, আপনি এসে গেছেন?

উত্তর দিলাম: 'হ্যাঁ ভাই, আপনার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে এসেছি।'

তাড়াতাড়ি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য নিজের কাঁদে দায়িত্ব নিলাম এবং তখনই স্থানীয় গণপরিষদ সদস্যদের একটা জরুরি মিটিং করা হলো। বে-

সামরিক শাসনব্যবস্থা চালু রাখার জন্য মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর তত্ত্বাবধানে গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে একটা স্থানীয় কমিটি গঠন করা হলো। আমি রইলাম প্রতিরক্ষার দিকে। স্থির হলো, বরিশালের ডেপুটি কমিশনার মি. আইয়ুবুর রহমান এবং পুলিশ সুপার সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় কমিটির নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। মি. মঞ্জু, ডেপুটি কমিশনার এবং আর্মি, পুলিশ, আনসার, ছাত্রদের নিয়ে একটা মিছিল বের করলাম। তখন বেলা বারটা। সবাই ভীষণ উত্তেজিত। আমার হাতে বাংলাদেশের পতাকা। বিভিন্ন স্লোগান সহকারে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে আমরা বেলসপার্কে গিয়ে সমবেত হলাম। সেখানে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের আশু করণীয় বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোকপাত করলাম। ছকবাঁধা সৈনিক জীবনের ঠিক বিপরীতে আর একটা জীবনের সন্ধান পেলাম এখানে। জনগণ আমার ডাকে সন্তোষজনকভাবে সাড়া দিল। এ সাড়া প্রাণের আবেগে জীবন্ত। আমার ভাগ্য ভালো যে, সামরিক বাহিনীতে আগে কাজ করত–এ রকম কিছু লোকজন পেয়ে গেলাম। তাদের উপরে প্রশিক্ষণের ভার দেয়া হলো। অস্ত্র চালনা শেখার জন্য সমস্ত ছেলেদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হলো। গোটা জেলার জন্য আমি একটা ক্রাশ ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা নিলাম। ব্যস্ত দিনটি গড়িয়ে সন্ধ্যার বুকে এলিয়ে পড়ল।

রেডিওতে মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনলাম। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে নিজেকে সরকারের প্রধান বলে ঘোষণা করলেন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন, পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং চলতে থাকবে। এ ঘোষণা ঝিমিয়ে পড়া প্রতিটি মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করল। কারণ, এরকম ঘোষণা এ-ই প্রথম। এরপর শেখ সাহেবের গ্রেফতার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ধ্বংস, ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের হত্যা, ইকবাল হল ও রোকেয়া হলে ছাত্র-ছাত্রী নিধন ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত সংবাদ শোনা ছাড়া ঢাকার আর কোনো সঠিক স্পষ্ট খবর পাইনি। পলায়নপর সৈন্য, বেসামরিক লোকজন ও ঢাকার পুলিশদের কাছ থেকে যে সমস্ত সংবাদ পেয়েছিলাম, তাতে আমার স্পষ্ট

ধারণা হলো যে, পূর্ব বাংলা বাংলাদেশে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এ রক্তস্নান অব্যাহত থাকবে।

যা হোক, একটি সংঘবদ্ধ দল হিসেবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আবার নতুনভাবে শপথ নিলাম। কর্মসূচি অনুযায়ী দ্রুতগতিতে সবকিছু আরম্ভ হলো। ইতোমধ্যে লেফটেন্যান্ট হুদা, মেহেদী ও নাসেরকে পেয়ে গেলাম। নানা কারণে ওদেরকে সামরিক বাহিনী থেকে স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। এই দুঃসময়ে ওদের সাহায্য অনেক কাজে এলো। বৃহত্তর অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হলো ওদের। ছেলেদের সুবিধার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। এর ফলে হাজার হাজার যুবক শহরের আশেপাশ থেকে ছুটে আসতে লাগল। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বেসপার্কেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক যুবক অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেয়। একই সঙ্গে আনসার কমান্ডারদের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক থানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার জন্য নির্দেশ পাঠানো হলো। এই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা জনগণকে সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণ নিতে প্রভূত সাহায্য করে। বরিশাল, ভালো ও খুলনা জেলার বাগেরহাটে যুদ্ধের দামামা। এছাড়া বরিশালের এডভোকেট মি. হাসান ইমামের শক্তিশালী তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ট্রেঞ্চ ও বাংকার তৈরি করা হলো। মি. হাসান ইমাম সিভিল ডিফেন্সের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। এখানে আরো দু'জনের নাম অবশ্যই আমাকে উল্লেখ করতে হয়। তারা হলেন, আই ডব্লিউ, টি-এর ম্যানেজার মি. তারিক আনিস ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মি. শাহজাহান। প্রয়োজনীয় নৌযান সরবরাহ করে তারা মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। এর ফলে খুলনা, বিশেষ করে বরিশাল জেলার বিভিন্ন থানার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা আমার পক্ষে সহজতর হয়েছে। বরিশালের ভেতর দিয়ে যেসব নদী প্রবাহিত হয়েছে, তার দু'পাড়ে ট্রেঞ্চ ও বাংকার গড়ে উঠল। যেসব পথ দিয়ে বরিশাল শহরের দিকে আসতে হয়, সেসব জায়গার দিকে বিশেষ নজর রেখে মুক্তিবাহিনী সমাবেশ করা হলো। প্রধানত তিনটি পথ দিয়ে বরিশালে আসতে হয়। একটা হলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গাবখানের খাল; দ্বিতীয়, উত্তর-পূর্বদিকে জুনাহারের খাল এবং তৃতীয়ত, উত্তর দিকে বরিশাল-ঢাকা রাস্তা। একটা বড় ফ্ল্যাট ডুবিয়ে দিয়ে প্রথম পথে অবরোধ তৈরি করা হলো আর দুটোর পথে

বেশকিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে ৩০৩ রাইফেল, শর্টগান ও তীর-ধনুকসহ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে বসিয়ে দেয়া হলো। বরিশালে সর্বত্র গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার করার ধুম পড়ে গেল। জনগণ ট্রেঞ্চ ও বাংকার খোঁড়া থেকে আরম্ভ করে মাঠে প্যারেড করা, বড় বড় গাছ কেটে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করা, অস্ত্র নিয়ে এক অবস্থান থেকে দৌড়ে যাওয়া, বিমান হামলাকালীন সাইরেন বাজানো ও ব্ল্যাক আউট পালন করা পর্যন্ত সব রকম প্রস্তুতি নিল। ব্ল্যাক আউটের সময় অন্ধকারের মধ্যে সাইটগার্ড ও সান্ত্রীরা সবসময় হুঁশিয়ার থাকত এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখত। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বরিশালের জনগণ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, কর্তব্যবোধ ও উদ্দীপনার পরিচয় দিয়েছিল। সময়ের কাছ থেকে ওরা যথার্থ শিক্ষা নেয়। দেশাত্মবোধ ওদের প্রধান হাতিয়ার।

১ এপ্রিল বরিশালে এক রকম যুদ্ধাবস্থা। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বরিশালের বীর জনতা আরো শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত হয়ে রইল। সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা বরিশালবাসীর একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ঝঞ্ঝার সাথে অবিরাম সংগ্রাম করে এদের পূর্বপুরুষগণ যুগ যুগ ধরে বেঁচেছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভয়-ভীতিহীন বরিশালবাসীর যেকোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে শক্তির অভাব হয়নি। কিন্তু এপ্রিলের চ্যালেঞ্জ ভিন্নতর। এ চ্যালেঞ্জ হলো পাক সামরিক চক্রের অস্ত্রের চ্যালেঞ্জ। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল গণশক্তির জোরে-অস্ত্রের জোরে নয়। সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রের অভাব আমাকে ভয়ানকভাবে পীড়া দিতে লাগল। এ ব্যাপারে মি. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সাথে আমার বিশদ আলাপ-আলোচনা হলো। কিছু অস্ত্রপাতি জোগাড় ও অস্থায়ী সরকারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কুমিল্লা-আগরতলা হয়ে মি. মঞ্জু ভারত রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে যুদ্ধ প্রস্তুতি। তারই পাশাপাশি ভোলার নায়েক সুবেদার ছিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে কাজ করার জন্য একটা বাহিনীকে ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও মলোটভ ককটেল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করা হলো।

৬ এপ্রিল খুলনা বেতার কেন্দ্রে হামলা চালাবার জন্য এই দলকে নির্দেশ দিলাম। সেই মোতাবেক আমি ৪ এপ্রিল এই দলটির সাথে পিরোজপুর হয়ে বাগেরহাট রওয়ানা হলাম। পিরোজপুর আমাদের একটা সুদৃঢ় ঘাঁটি।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে লে. জিয়া নামক একজন তরুণ সামরিক অফিসার এখানে কাজ করছিল। তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি পাক-সামরিক বাহিনীর পুরাপুরি অনুকূলে। বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর ছাড়া প্রায় সব বড় বড় শহরগুলো ওদের অধিকারে। উপরোক্ত জেলাগুলো শুধু নদীপথ দ্বারা বেষ্টিত। সামরিক পুলিশ বাহিনীতে যে সমস্ত বাঙালি ছিল, পাঞ্জাবিরা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। যারা বেঁচে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল। ২৫ মার্চের রাতে সামরিক হামলার পর ই পি আর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বহু সৈন্য অফিসার পালিয়ে এসে বাংলাদেশের প্রধান শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহে শত্রুদের সাথে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খুলনা পাক সামরিক বাহিনীর দখলে। পালিয়ে আসা হাজার হাজার নরনারীর মুখে খবর পেলাম যে, সামরিক বাহিনী বিহারি মুসলমানদের সহায়তায় খুলনা ও দৌলতপুর শিল্প এলাকায় হাজার হাজার বাঙালি শ্রমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। বাগেরহাট মহকুমার রূপসা নদীর পূর্বতীরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, খুলনার দিকে শুধু কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উপর দিকে উঠছে। যে সমস্ত লোক পালিয়ে আসল, তাদের কাছ থেকে নারী নির্যাতন, হত্যা ও নির্মম অত্যাচারের কাহিনি শুনলাম। রূপসা নদীর পূর্ব পাড়ে একটা বাংলাদেশের পতাকা ও রাইফেল নিয়ে নামেমাত্র কয়েকজন সৈন্য আর পশ্চিম পাড়ে পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে অপেক্ষা করছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সুশিক্ষিত দক্ষ সেনাবাহিনী। উভয়ের পতাকা আলাদা। তাই উভয়ের হিংস্রতার রূপও আলাদা। ওদের ভেতর আছে হিংসার উন্মত্ততা আর আমাদের ভেতর দৃঢ় সংকল্প। চাকরি ওদের পেশা। আর আমরা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য লড়ছি। অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যার দিক দিয়ে না হলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ওদের চাইতে আমরা উন্নত। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, কামরুজ্জামান টুকু ও কাইয়ুমের মতো ছাত্রদের সহায়তা আমি পেয়েছিলাম। তারা খুলনা শহরে সামরিক বাহিনীর অবস্থান, বেতার কেন্দ্রের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে আমাকে সবসময় ওয়াকিবহাল রাখত। ওদের সংবাদ মোতাবেক এপ্রিল মাসের ৭ তারিখ রাতে নায়েক সুবেদার ছিদ্দিকের নেতৃত্বে খুলনা বেতার ভবনের উপর আক্রমণ চালাব স্থির করলাম। রাত বারোটার সময় নৌকা করে

রূপসা নদী পার হয়ে রাত দেড়টার সময় তারা বেতার ভবন আক্রমণ করল।

অত্যন্ত সফল আক্রমণ। ১৫ থেকে ২০ জন হানাদার সৈন্য খতম হলো। অধিকার করল দুটো এল এ. জি কিছু রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ। একজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হলো। প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের পর আমাদের দলটি শেষ রাতের দিকে ফিরে এলো। এই হামলার পর বাগেরহাটে শক্ত খাঁটি তৈরি করা হলো। এখান থেকেই গেরিলা কায়দায় গোপনে আক্রমণ করা হতো। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাগেরহাট, পিরোজপুর, ভোলা, সুন্দরবন, বরিশাল ও পটুয়াখালি ছিল মুক্ত।

প্রতিদিন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত হচ্ছিল। শুধু তা-ই নয়, বরিশাল থেকে চাঁদপুল, কুমিল্লা, নোয়াখালীতেও অস্ত্র সরবরাহ করা হতো। বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী মি. মিজানুর রহমান চৌধুরীর অনুরোধে আমরা খাদ্য, জ্বালানি তেল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজন দিয়ে তখনকার মুক্তি সংগ্রামী ভাইয়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চাঁদপুর ও কুমিল্লায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর ও খুলনা-এই চারটি জেলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে সেক্টর কমান্ডার ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ কর্নেল এম এ জি ওসমানীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশকে প্রধান ৬টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। মি. তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে চার সদস্যের একটি অস্থায়ী সরকার 'মুজিব নগরে' গঠন করার কথাও? স্বাধীন বাংলার জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য অন্তত একটা ভিত খুঁজে পেল। ছড়িয়ে পড়ল সংগ্রামী মশাল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। শুরু হলো পাকিস্তানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ। ইতোমধ্যে ১৭ এপ্রিল একজন পাকিস্তানি গোয়েন্দা বরিশালে গ্রেপ্তার হয়। আমাদের অবস্থানগুলো ও প্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য পাক-সামরিক বাহিনীর লে. কর্নেল শামস উক্ত গোয়েন্দাকে খুলনা থেকে বরিশালে পাঠায়। উক্ত গোয়েন্দাকে যে পুরস্কার দিতে পেরেছিলাম, সেটা হলো কঠিন মৃত্যু। বরিশাল স্টেডিয়ামে জনতার সামনে প্রকাশ্যে তাকে

গুলি করে হত্যা করা হয়। তার অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য। সে ওইসব অপরাধীর অন্যতম যারা বাঙালির দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত শিখাকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে ২৫ গজ দূরে চারজন মুক্তিযোদ্ধার একটি 'ফায়ারিং স্কোয়াড' বসিয়ে দেয়া হয়।

প্রিয় সাথিরা আমার,

বিশ্বাস করুন, একটি লোকের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। নির্দেশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারটি চীনা রাইফেল এক সঙ্গে গর্জে উঠল। ওখানেই ওর জীবনের পরিসমাপ্তি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যে বাঙালিরা কারও মৃত্যু দেখলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত এবং চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়ত; সেই বাঙালিরাই এই মৃত্যু দেখে হাততালি আর শিস দিল। অনুভূতির এ পার্থক্য আমি লক্ষ করলাম এবং মনে মনে বললাম; 'ইয়াহিয়া খান, তুমি 'ভাত খেকো' বাঙালির ঠিকমত নিরূপণ করতে পারনি। তোমার অপরাধের জন্য তোমাকে মূল্য চরম মূল্য দিতে হবে।'

বোধহয় ১৭ এপ্রিলের ঘটনার ফলস্বরূপ পাক বিমানবাহিনীর দু'খানা স্যাবর-জেট ফাইটারকে বরিশালের আকাশে দেখা গেল। এই প্রথমবারের মতো হিংস্র সামরিক জান্তা আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির উপর আঘাত হানার সাহস পেল। ওই জঙ্গি বিমানগুলোকে ঠেকাবার মতো আমাদের হাতে কিছু ছিল না। তবু আমাদের সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা সামান্য রাইফেল দিয়ে গুলি করার অনেক চেষ্টা করল। বেস পার্কের উত্তর দিকে ইংরেজ আমলের একটি উঁচু কাঠের ঘরে আমার হেড কোয়ার্টার। এই ঘর বেস পার্কের উপর প্রচণ্ড গোলা এসে পড়তে লাগল। এই পার্কের মধ্যেই ছেলেরা ট্রেনিং নিত। ছেলেরা ট্রেঞ্চের ভেতর ঢুকে আত্মরক্ষা করল। দু'একটি ছোটখাটো আঘাত ছাড়া আমাদের তেমন বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। জঙ্গি বিমান দুটো যখন ঘুরপাক খেয়ে গুলি বর্ষণ করার জন্য নিচে নেমে আসে, তখন বেসামরিক লোকজন বাইরে লাফিয়ে এসে মজা দেখতে থাকে। এই সরল মানুষগুলো এর আগে কখনো ভাবতে পারেনি যে, ওই সুন্দর সুন্দর বিমানগুলো এমন নির্মমভাবে দংশন করতে পারে। অজ্ঞতা ও সরলতার জন্য ওরা অনেক ভুগেছে। বেসামরিক ডাক্তাররা ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। মুহূর্তের ভেতরে গ্রামের দিকে ছুটে চলল মানুষের

কাফেলা। ভয়ে সব ফেলে রেখে শহর খালি করে উন্মাদের মতো দৌড়াতে লাগল শহরতলীর দিকে কী মর্মান্তিক দৃশ্য! এই প্রথম আমি দেখলাম। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মানুষ তার যথাসর্বস্ব এমনকি পিতামাতা, তাদের প্রাণপ্রিয় শিশুকে ফেলে রেখে জীবনের ভয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়াচ্ছে। সংগীতের সুর শুনতে অভ্যস্ত বাঙালি গোলাবর্ষণের বিকট আওয়াজে আজ ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গেল। এই অহেতুক কাপুরুষোচিত গোলাবর্ষণ শয়তান ইয়াহিয়ার বর্বরতার চরম নিদর্শন। সবাই বিভ্রান্ত, দিশেহারা। কোথায় যাবে, কী করবে! অচেতন নারী-পুরুষ ভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অসহায়ের মতো ডুকরে কেঁদে উঠছে। অবুঝ শিশুদের বুকফাটা আর্তনাদ। কোনো যানবাহন নেই। যে যার মতো পারছে উদ্ভ্রান্তের মতো পল্লির দিকে ছুটছে। কিছুক্ষণ আগেই না এই মানুষগুলো সৃষ্টির অনবদ্য রূপ-বৈচিত্র্য প্রাণ ভরে উপভোগ করছিল। এ করুণ দৃশ্য, মানবতার এই অসহনীয় দুর্গতি দেখে আমার চোখে জল এলো না। পাকিস্তানের হায়েনাদের স্পর্ধা দেখে ভেতরটা আমার প্রতিহিংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

মুক্তিযুদ্ধে গণজীবনে যে দুঃখদৈন্যের বোঝা নেমে আসে, তা আমি এই প্রথমবার লক্ষ করলাম। রাশিয়া ও ফরাসি বিপ্লবের কথা মনে হলো। বিপ্লবের শেষে কী ভয়ানক বিপর্যয় নেমে এসেছিল ওদের গণজীবনে। বিপ্লবের কথা স্মরণ করে নতুনভাবে উজ্জীবনী শক্তি ফিরে পেলাম। কারণ, বিপ্লব পরাজয় মানে না, তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম: জয়ী আমরা হবই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। গণযুদ্ধের কখনো পরাজয় হয় না। যুদ্ধের স্বাদ যত তিক্তই হোক, প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা যত বড় মর্মান্তিকই হোক, ধ্বংসযজ্ঞ যত বড় ভয়ংকরই হোক না কেন জনগণই পরিশেষে বিজয়ী হয়। এর জ্বলন্ত প্রমাণ আজকের গণচীন, আলজেরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম। যারা একবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, তারাই শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। আরো মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে সংকল্পবদ্ধ হলাম। যদি আমি একাও বেঁচে থাকি, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার সামান্য লোকজন নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। ১৮ এপ্রিল রাতে বিষাদের কালো ছায়া শহরের সারা আকাশটা গুমোট করে ফেলল। শহরের রাস্তাগুলো

জনমানবশূন্য। ভীষণ নীরব। কোথাও জীবনের স্পন্দন নেই। যেন ঘুমন্ত প্রেতপুরী। রাতে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করলাম। নির্জনতা আমার কাছে দুর্বিষহ।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটা বেশ বড় বাহিনী তৈরি করেছিলাম। কিন্তু সামান্য কিছু রাইফেল ছাড়া আমার কোনো অস্ত্রপাতি ছিল না। প্রথমাবস্থায় বরিশালের পুলিশ অস্ত্রাগার ভেঙে কিছু রাইফেল জোগাড় করেছিলাম। এসব হালকা অস্ত্র দিয়ে শুধু আত্মরক্ষা করা চলে।

যা হোক, এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে মি. মঞ্জু সুন্দরবনের গোপন পথ দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারত হতে কিছু অস্ত্রপাতি নিয়ে এলেন। তিনি জানালেন যে, আরো অস্ত্রপাতির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাকে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে আসতে হবে। সংবাদটা শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এই সুযোগে সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই দুর্যোগময় মুহূর্তেও আমার ছোট্ট মনটি অপার উৎসাহে উজ্জীবিত হলো। এর চাইতেও বেশি রোমাঞ্চিত হলাম এই কথা ভেবে যে, চতুর গোয়েন্দার মতো হানাদারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসব।

লেফটেন্যান্ট মেহেদী, লে. জিয়া এবং লে. নাসেরকে যথাক্রমে পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে সাথে নিয়ে ভারত রওয়ানা হলাম।

গুপ্তপথে যাত্রা

সুন্দরবন বাংলাদেশের বিখ্যাত অরণ্যানী। এই সুন্দরবনের গোপন পথ ধরেই আমার ভারত যাত্রা শুরু হলো। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হরিণ ও অজগরে সুন্দরবন ভরপুর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রয়েল বেঙ্গল টাইগারগুলো মানুষখেকো। এদিক-ওদিকে কোনো লোক ঘুরে বেড়াতে ভরসা পায় না। অবশ্য স্ত্রী জাতিকে এই রয়েলগুলো সাধারণ দ্রতা জানাতে কার্পণ্য করে কিনা ঠিক বলতে পারব না। জানা-অজানা অনেক শঙ্কা ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছোট একটি লঞ্চ, পথের জন্য সপ্তাহের কিছু রেশন

ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ আমরা যাত্রা শুরু করলাম। শেষবারের মতো পরীক্ষা করার জন্য ২৩ এপ্রিল ভোরে পিরোজপুর মহকুমার হুলারহাটে থামলাম। সামনে বিশাল জলরাশি বুকে নিয়ে ধলেশ্বরী ও ভালো নদী দূরে বহুদূরে ওইদিকে বলয়ের নিচে প্রভাতি সূর্যটার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হলো, ধলেশ্বরীর ওই বিরাট বুকটা জুড়ে শয্যা পেতে সূর্যটা ঘুমিয়ে আছে। শয্যাত্যাগ করে শান্ত ঢেউগুলোর মাথায় আলো ছড়িয়ে ধীরে ধীরে সূর্যটা উপরে উঠে গেল। ঢেউগুলো আমাদের স্বাগত জানাতে যেন অপেক্ষা করছিল। বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। কিন্তু কি দুর্ভাগা আমি। বাংলার রুপালি নদীনালা-এর সুন্দর শ্যামলিমা প্রাণভরে উপভোগ করার সুযোগ পাইনি। দূরে-বহুদূরে বালুকাময় ধূসর মরুভূমির উষ্ণ বুকে ছিটকে গিয়েছিলাম। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন। আবার আমি রূপসী বাংলায় ফিরে এসে নদীর অথৈ জলরাশির মনমাতানো দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করছি। পরের দিন সকাল পর্যন্ত আমাদের যাত্রা অব্যাহত রইল। জেগে উঠে দেখলাম, আমি এক নতুন স্বপ্নরাজ্যে। এটা এমন একটা রাজ্য-যার কথা আমি কোনো দিন ভাবিনি বা কল্পনাও করিনি। রূপের ছটায় চোখ আমার ঝলসে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। পৃথিবীটা এত সুন্দর, এত শ্যামল, এত মনোরম হতে পারে! এত শান্ত, এত নবীন যে, ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দে গভীর ঘুমে মগ্ন এই মহীয়সী অরণ্যানীর ঘুম ভাঙাতে ভেতরটা আমার কেমন যেন আঁতকে উঠল। সারা অরণ্যানী জুড়ে গভীর প্রশান্তি। শুধু দূরে নদীর তীরে কতকগুলো হরিণ ও হরিণশাবক আনন্দে ছুটাছুটি করছিল। ভাবনাহীন রাজকীয় ছন্দময়.....। হরিণগুলো কখনো এদিক-ওদিক লাফালাফি, কখনো আবার বড়গুলো লম্বা শিং দিয়ে ছোটদের আদর, কখনো একে অপরের গলায় চুমো খেয়ো সোহাগ করছিল। তারপর হয়তো কোনো গভীর পরামর্শ বা গোপন প্রণয়ের আশায় চলে যাচ্ছিল গহিন জঙ্গলের দিকে। বয়সি হরিণগুলো 'গোলটেবিল' সভার মতো জড় হয়ে এক জায়গায় বসা ছিল, যেন মানবজাতির বর্তমান শিকারের ঝোঁক সম্বন্ধে আলোচনায় রত। এই সমস্যা সম্বন্ধে ওদেরকে বেশ গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মনে হলো। ইঞ্জিনের একঘেঁয়েমি শব্দে অরণ্যানীর ঘুম ভাঙিয়ে আমাদের লঞ্চটা সামনের দিকে ছুটে চলল নদীর তীরবর্তী বেনু-বনকে আলতোভাবে সোহাগ করে গেল ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস।

শ্যামল উদ্ভিদরাজি এক এক জায়গায় এক এক রকম। ভোরের শান্ত আলোয় গাছগুলো যেন সবুজের ঘন ছায়া বলে মনে হলো। সবুজের সমারোহ নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলো বড় নদীর মতো নয়। বলা চলে, ছোট ছোট খাল। সমস্ত সুন্দরবনের বুক চিরে এ খালগুলো এঁকেবেঁকে গিয়েছে। লুকোচুরি খেলার জন্য এটা একটা রোমাঞ্চকর জায়গা। চতুর উজ্জ্বল প্রেয়সীর সাথে এখানে একবার অভিসারে এলে সমস্ত পৃথিবীটা তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। পুরো জোয়ারের সময় খালগুলো ভরে গিয়ে অরণ্যের পাদদেশ ছুঁয়ে যেত। মনে হতো সমস্ত অরণ্যটা পানির বুকে ভাসছে। এই খালগুলোর পানি ছড়িয়ে পড়ত বিভিন্ন জায়গায়। বাস্তবিকই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এই দৃশ্য। অনেক সময় প্রলুব্ধ হয়েছি-এই খালগুলোর বুকে লাফিয়ে পড়ে গভীর সবুজ অরণ্যানীর দুঃসাহসিক 'টারজান' হই। এখানে সিম্পাঞ্জি ও বানরগুলো যেন নতুন কিছুর সাহচর্যের আশায় বসে থাকে। লঞ্চের নাবিকরা যখন আমাকে বলল, "খালে কুমারী আছে' তখন আপাতত টারজান হবার বাসনা শিকে তুলে রাখলাম। একদিকে মন উড়ে গেল অরণ্যের গভীরে-অপরদিকে নানারকম ছোট ছোট পাখি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কোনোটা বা গান গাইছে, কোনোটা বা শিস দিচ্ছে, কোনোটা বা কুহুধ্বনি তুলি চিৎকার করছে। বড়গুলো পাখা মেলে অনেকবার পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে উড়ে গেল । খালের মধ্যে আমার লঞ্চটা থামালাম। দেখলাম, একদল দুষ্টু বানর বিভিন্ন রকমের কসরত করতে করতে জঙ্গল থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমার বিশ্বাস এমনকি 'বার্টল্যাংকাস্টার'ও ওদের নৈপুণ্য দেখে প্রশংসায় মাথা নোয়াতো। যেটা আমাকে সবচেয়ে হতবাক করেছিল, সেটা হচ্ছে অনেক সময় বানরগুলো আনন্দে দাত বের করে আমার দিকে চাপা হাসি হাসত। যেন আমি ওদের কত প্রিয়। ওদের চালচলন এমন দুষ্টুমিভরা ও বন্ধুত্বপূর্ণ যে, এক একসময় আমার নিজের চেহারা ও সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত। প্রাণভরে এ দৃশ্যটা উপভোগ করলাম। বারবার ডারউইন সাহেবের থিওরিটা আমার ভেতর উঁকি মারতে লাগল।

সাথিরা, বলতে ভুলে গিয়েছি যে, সবাই মিলে লঞ্চে আমরা বিশজন নাবিক ছিলাম। এদের মধ্যে দু'জন প্রকৃত যুদ্ধ করার মতো। পনেরো থেকে বিশের মধ্যে বয়স। আগে সেনাবাহিনীতে ছিল। নাম ছিদ্দিক ও জব্বার। ওরা

দু'জন হরিণ শিকারের কথা উঠাল। প্রস্তাবটা আনন্দে আমি লুফে নিলাম। আলতাফকে চালক হিসেবে নিয়ে আমরা তিনজন স্পিডবোটে খালের ভেতর দিয়ে ছুটলাম। একটা বড় নদীর কাছে এসে দেখলাম, অনেকগুলো হরিণ প্রকৃতির শ্যামল গালিচার ওপর আনন্দে গা এলিয়ে দিয়েছে। স্পিডবোটটা স্রোতের সাথে সাথে খালের পাড় ঘেঁষে এগুতে লাগল। আমরা সবাই রাইফেল হাতে প্রস্তুত। পাড়ের কাছাকাছি এসে সবাই এক সঙ্গে গুলি করলাম। সারা বনটা অসম্ভব গর্জনের শব্দে কেঁপে উঠল। অনেকগুলোর মধ্যে দুটো হরিণ গুলিবিদ্ধ হয়ে ক্ষতের ব্যথায় হাঁপাতে লাগল। আমরা হরিণগুলোর কাছে গেলাম। ছিদ্দিক ও অন্য সবাই হরিণগুলোকে জবাই করে আনুষ্ঠানিক কাজ সমাধা করল।

কারও ক্ষতি না করে কি আনন্দে খেলা করছিল নিরীহ হরিণগুলো! ওদের জন্য মনটা আমার কেঁদে উঠল। বড় ব্যথা অনুভব করলাম।

খুব জোরে স্পিডবোটটা চালিয়ে আলতাফ ঘাঁটিতে ফিরে এলো বিরাট ভুড়িভোজনের আশায় সবাই সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আমি ছাড়া সকলের মনেই উল্লাস। এই সামান্য রোমাঞ্চের জন্য মনটা আমার ভয়ানক ব্যথায় কাঁপতে লাগল। ইতোমধ্যে দেখতে পেলাম সাংঘাতিক রকমের প্রস্তুতি নিয়ে কালোমেঘগুলো আকাশে জমা হচ্ছে। যখন সবাই হরিণের চামড়া ছাড়াতে ও ভূড়িভোজনের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত, তখন আমার মন ছুটে গেল নয়নাভিরাম ওই মেঘালোকে। ওই পুরপুঞ্জ মেঘমালা কালো একখানা কম্বলের মতো চক্রবাল জুড়ে সারা অরণ্যটাকে ঘিরে ফেলল এবং ধীরে ধীরে নিচে নেমে সমস্ত গাছপালা, শ্যামল, বিটপীকুঞ্জকে বৃষ্টির জলধারায় স্ফিত করে দ্রুত আমাদের দিকে ছুটে আসছিল।

দিনটা ভয়ানক গরম। এই কাঙ্ক্ষিত বর্ষণ মনে খানিকটা স্বস্তি এনে দিল। বহুদিন হয় আমি বৃষ্টিতে ভিজিনি। কারণ, দীর্ঘদিন আমি মুলতানের মরুভূমিতে দিন কাটিয়েছিলাম। সেখানে ছিল না বর্ষণমুখর দিনের মিষ্টি গুঞ্জরণ। পাগলা ছেলের মতো জামাকাপড় ছুড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। মন শান্তহলো। আমার হারানো শৈশবের সাথে এর যেন যোগসূত্র খুঁজে পেলাম।

শৈশবের স্মৃতিসমৃদ্ধ অনেক ঘটনা আমার মনে ভেসে উঠল। চোখের পলকে খুঁজে পেলাম হারানো গল্পগুচ্ছকে। ওগুলো হারিয়ে গিয়েছিল অতীতের গর্ভে। এক একটি বৃষ্টির ফোঁটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল এক একটি নতুন গল্প। মনে হলো, আবার আমার শৈশব ফিরে পেয়েছি। আবার আমি আমার সাথিদের সাথে ধুলোমাটিতে খেলছি। দৌড়াদৌড়ি করছি, একে অন্যকে গাল দিচ্ছি, মারামারি করছি, কাঁদছি ও কাগজের ছোট ছোট নৌকা বৃষ্টির জলের ভাসিয়ে দিচ্ছি।

কত সুন্দর সেই স্মৃতি-মঞ্জুরি! কত না মাদকতা তার সারা অঙ্গে। ক্যাপ্টেন হুদার চিৎকারে আমার কল্পনার ছন্দ হারিয়ে গেল।

খাবার প্রস্তুত। আহ্বান জানাল ওরা।

কি সুস্বাদু খাবার! জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা।

আবার আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। আর মাত্র একটি রাত। তারপর আমরা পৌছে যাব ভারতের সীমান্তবর্তী কোনো শহরে। এটা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা যে, এখনো পর্যন্ত পথে কোনো শত্রুর সাক্ষাৎ মেলেনি। যদিও প্রতি মুহূর্তে ওদের তরফ থেকে আক্রমণের শঙ্কা ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল, সুন্দরবনের চারপাশে পাকিস্তানি হানাদাররা 'গানবোট নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তারা বাংলাদেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর বর্বরের মতো নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে ভয়ানক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সন্ধ্যার দিকে অনেক দূরে 'পশুর' ও 'শিপ্সা নদীর মোহনায় হঠাৎ করে একটা গানবোট চোখে পড়ল। এই বিরাট নদী দুটো অতিক্রম করে আমাদের নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে। সামনেই দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। পশুর ও 'শিপ্সা' এই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

আমরা এখন বিশাল জলরাশির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছি। আবহাওয়া আমাদের প্রতিকূলে। বিপদের গন্ধ পেলাম। ইতোমধ্যে ভয়ানক বেগে বৃষ্টি নামলা। গোঢ় অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিকে ঢেকে ফেলল। শত্রুর ভয়ে ভীত ছিলাম না আমি। আমি ভয় করছিলাম নদীর ওই বিরাট মোহনাটাকে। যদি কোনো রকমে আমার ছোট্ট লঞ্চটা ডুবে যায় তাহলে, ওই হাঙ্গর ও কুমিরের ভয়েই আমি জমে যাব।

অন্ধকারে বিশাল জলরাশির দৃশ্য ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ। একটা প্রেতপুরীর মতো। দলের অধিনায়ক হিসেবে আসন্ন বিপদের ভয়কে চেপে গিয়ে

আত্মবিশ্বাসকে ঘা দিয়ে চাঙ্গা করে তুললাম। আমাদের লঞ্চের প্রধান পাইলট কিছুদিন আগেও একজন কুখ্যাত চোরাচালানি ছিল। জঙ্গলের সব গোপন রাস্তা তার নখদর্পণে।

তাকে বললাম যদি কোনো বিকল্প পথ থেকে থাকে তাহলে লঞ্চের গতি সেই দিকেই ঘোরাতে। সে আমার আদেশ মানল। আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। ওই চাঁদটাকে অশেষ ধন্যবাদ। রুপোর থালার মতো হঠাৎ বেরিয়ে এলো মেঘের ফাঁক থেকে। বৃষ্টি থেমে গেল এবং আমরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করলাম। ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ভয়ের ভূতটাকে হেসে উড়িয়ে দিলাম। দেখলাম, সবাই একই ভীতিরোগে ভুগছে। ব্যাপারটি পরিষ্কার হলো তখন, যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি আত্মবিশ্বাসের সুরে সবাই হেসে উঠল। ভয়ভীতি ঠেলে দিয়ে রাতটা কাটালাম।

পরদিন ভারতের সীমান্তবর্তী চৌকি পারগোমতী এসে পৌঁছলাম। এখানে আমাদের থাকতে বলা হয়েছিল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা আগেই আমাদের আসার খবর পেয়েছিল। তারা আমাদের আসার বৈধতা পরীক্ষা করে সামনে এগুবার অনুমতি দিল।

২৪ এপ্রিল ভোরে। পারগোমতীর একটা জায়গায় ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তাবাহিনীর ইনস্পেক্টর মি. পি কে ঘোষ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যোগাযোগের পর ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্ক পাহারায় ক্যাপ্টেন হুদা ও আমাকে সামনে এগুবার অনুমতি দিলেন। এই সময় আমরা 'হিংগুলগঞ্জ' নামে অপর একটি ভারতীয় সীমান্ত চৌকির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সিদ্দিকসহ লঞ্চের অন্যান্য সাথিদের লঞ্চসহ এভাবেই ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রেখে।

শান্ত ঢেউগুলোকে টুকরো টুকরো করে আমাদের স্পিডবোটটা এগিয়ে যাচ্ছিল। যে নদী দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তার নাম 'কালিন্দী'। বাংলার সাহিত্যিকদের অনেক উপন্যাস-নভেল গড়ে উঠেছে এই 'কালিন্দীকে ঘিরে। নদীটা বেশ প্রশস্ত। অপরাহ্ বাতাসের মৃদু ছোঁয়ায় ওকে বড় গভীর ও গম্ভীর মনে হলো। নিরাপদ স্থানে পৌঁছার জন্য ভারতের সীমান্ত ধরে আমরা এগুতে লাগলাম । কারণ, নদীর ওপারেই পাকিস্তানি হানাদাররা ওৎ পেতে বসে ছিল। ওপারের দূরত্ব এক হাজার গজের বেশি নয়। বর্বর

পাকিস্তানি হানাদারদের মেশিনগানগুলো যেকোনো সময় গর্জে উঠতে পারে, এই ভয়ে আমরা সতর্ক ও সচেতন ছিলাম। দেখতে পেলাম, ওপারে পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রিগারে হাত দিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীর ঢেউগুলো স্পিডবোটের কাঠের দেহটাকে হাপরের মতো পিটাচ্ছিল। ভয় হলো, ওর দেহটা না টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অবশ্য আমার মেদবহুল দেহের প্রতি এটা একটা আক্রমণাত্মক চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ডেকের ওপর আমি নিশ্চিন্তে বসতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন হুদার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলাম। ও তখন ঢেউগুলোর বারংবার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভীষণ ব্যস্ত। এর আগে আমি কখনো বুঝতে পারিনি, প্রশান্ত জলরাশি এত শক্ত ঝাঁকুনি দিতে পারে। এটা পৃথিবীর যেকোনো শক্তিশালী জিনিসের চেয়েও ভয়ংকর। নিরাপদে পৌঁছার জন্য আমাদের যুদ্ধ চলতে লাগল। এই সময় দেখতে পেলাম নদীর অপর পারে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে দাউদাউ করে আগুন জলছে। স্ত্রী- পুরুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে এদিক-ওদিক দৌড়ে যাচ্ছে। আকাশচুম্বি আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ওরই ভেতর শুনতে পেলাম নিপীড়িত মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি। সাহায্যের জন্য আকুল আর্তি। কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। করুণ-মর্মান্তিক!

পাকিস্তানি হিংস্র পশুগুলো আর ওদের পা-চাটা দালালরা নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়িঘর-আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ছিন্নমূল শত শত স্ত্রী-পুরুষ তাদের রক্ষা করার জন্য ভারতীয় সীমান্তের মাঝিদের প্রতি চিৎকার করে আবেদন জানাচ্ছিল। আমাদের পিছনে মানুষ ভর্তি অনেকগুলো নৌকা ছুটে আসছিল ভারতীয় সীমান্তের দিকে।

আগুনে জ্বলতে লাগল জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। সীমান্ত জুড়ে মাইলের পরে মাইল শুধু ভয়ংকর অগ্ন্যুৎসব। হাজার হাজার মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা। কি পৈশাচিক উল্লাস এই রক্তলোলুপ পাকিস্তানি ডাল কুত্তাদের। হিংসায়, ক্ষোভে ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভয়ংকর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল দেহমন। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো। হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস, চারদিকের প্রচণ্ড ধোঁয়া, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ সব মিলে মাথার উপরের ওই আকাশটা ভয়াবহ রূপ ধারণ

করল। রক্ত লাল ওই সূর্যটা কালিন্দীর জলে ডুব দেবার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে জনতার কাফেলা সীমান্ত বরাবর হাঁপাতে হাঁপাতে গড়িয়ে আসতে লাগল। ধ্যান-গম্ভীর নির্বাক এই কালিন্দী নদীটা নিঃস্ব মানবতার এই পর্বত পরিমাণ দঃখে সামান্য সহানুভূতিশীল বলে মনে হলো।

যে দৃশ্য আমি চোখে দেখলাম তা বড়ই মর্মান্তিক, করুণ। চাপ চাপ ব্যথার ঢলে মন আমার ভারাক্রান্ত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কী করে একটা মানুষ আর একটি মানুষকে বিনা কারণে পশুর মতো এমন নিঃস্ব, সর্বহারা করে দিতে পারে। এই নিরীহ লোকগুলোর একমাত্র অপরাধ, তারা যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষায় কথা বলে। অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে মন আমার ভারী হয়ে উঠল ঢেউয়ের বুক চিরে ক্ষুদে দৈত্যের মতো স্পিডবোটটা আমাদের নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলল গন্তব্যস্থানের দিকে। মুখ ঘুরাতেই সামনে দেখতে পেলাম, নদীর তীর বরাবর ভারতীয় সীমান্তে বেশ বড় বড় কতকগুলো বাড়ি। উপর দিকটা লাল, এমন কতকগুলো সেনানিবাস এই বাড়িগুলোকে চারদিকে দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বহু কাঙ্ক্ষিত স্থানে নিরাপদে পৌঁছতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ভেতরটা আশান্বিত হয়ে উঠল, নতুন করে ইস্পাত কঠিন সংকল্পবদ্ধ ও শক্তি সংগ্রাম করলাম। ওই দিনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে পাকিস্তানি পশুগুলোর সকল বর্বরতার সমুচিত জবাব দেবার জন্য মনটা আমার কঠিন হয়ে উঠল। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। যাতে করে সাড়ে সাত কোটি অগ্নিগ্ধ আত্মার শান্তির জন্য হিংস্র জানোয়ারদের ওপর চরম আঘাত হানা যায়। জীবনে এই প্রথম। একটা নতুন দেশে, নতুন মানুষ তাদের সাথে নতুন পরিচয়, নতুন কথাবার্তা। কি উন্মাদনা। আমার কছে বিস্ময়কর লাগল এই কথা ভেবে যে, ১৯৬৫ সালে 'সিয়ালকোট' ও 'খেমখারান' সেক্টরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করেছি। আমার মাতৃভূমি ও তার মুক্তির জন্য লড়াই করতে সেই পুরানো শত্রুর সঙ্গে কীভাবে হৃদ্যতা গড়ে উঠবে, কীভাবে বন্ধুর মতো সাহায্য চাইব? ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারলাম না। কি বিচিত্র এই পৃথিবী! এখানে শত্রু ও মিত্র উভয়ের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। মিত্রও শত্রুতে, শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়ে সব একাত্ম হয়ে যায়। তবু আমাদের যুদ্ধ করতে হবেই। এই অদ্ভুত অনুভূতিগুলো আমার ভেতর জন্ম দেয় এক নতুন

মানুষের, এক নতুন মনুষ্যত্ববোধের। আমরা হিংগুলগঞ্জে নামলাম এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন পান্ডের অফিসে হেঁটে গেলাম। তিনি তার অফিসে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ক্যাপ্টেন পান্ডে সুঠামদেহী, সুন্দর ও বেশ লম্বা। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমি যা আশা করেছিলাম, তার চাইতেও বেশি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত এই সুন্দর, অন্তরঙ্গ বন্ধুটি আমার একজন শত্রু ছিলেন। শুধু একমাত্র কারণ উনি একজন ভারতীয়, আমি একজন পাকিস্তানি। আমাদের নিরীহ মানুষগুলোকে নিয়ে রাজনীতিবিদরা কি মশকরাই না করল। বেশ কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেয়ে দেখলাম একে অপরের দিকে। আমার হাসি ও ব্যবহারে মি. পান্ডেও বিস্মিত হলেন।

ভাবতে অবাক লাগে, ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত যারা আমাদের শত্রু বলে ভাবতেন। মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও দৈন্যের কথা মনে হতে আমরা উভয়েই খুব হাসলাম। এক কাপ গরম কফির পর আমাকে আবার এখনই ছুটতে হবে, প্রথমে হাসনাবাদ, পরে ব্যারাকপুর। প্রথম ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক মি. মুখার্জী সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় ক্যাপ্টেন পান্ডে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে আসেন। চোখের কোণে আশা ও প্রত্যয়ের ছাপ দেখলাম।

আমাদের অনেক রাস্তা যেতে হবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে ওঁদের সেনাবাহিনীর পাহারায় আমরা তিন চাকার একটা গাড়িতে চেপে পড়লাম। এই গাড়িটির বন্দোবস্ত করেছিলেন মি. পান্ডে। তিনি হাসনাবাদে আমাদের আগমনবার্তা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সহকারী অধিনায়ক ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

হিংগুলগঞ্জ থেকে হাসনাবাদের দূরত্ব ১২ মাইল। কিন্তু মাঝপথে আমাদের দুটো খেয়া পার হতে হবে। এই তিন চাকাওয়ালা গাড়িটা দেখতে বেশ অদ্ভুত লাগে। এটার নাম 'টেম্পো'।

বেশ কষ্টকর ভ্রমণের পর আমরা হাসনাবাদ পৌঁছে গেলাম। গণপরিষদ সদস্য মি. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছ থেকে ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং আমার সম্বন্ধে অনেক কথা আগেই শুনেছেন। মি. মঞ্জুর সাথে আগে থেকেই

এদের জানাশোনা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন সিং কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সুন্দর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। আমাদের সবার কাছেই খুব প্রাণখোলা মনে হলো। সামনে এসে মিসেস সিং-ও আমাদের। খোশ আমদেদ জানালেন। এই ভদ্রমহিলা আর এক মধুর ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। তারা আমাদের সাথে অতি পরিচিত বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেন। যেন ওদের সাথে আমাদের বহুদিনের পরিচয়, বহুদিনের জানাশোনা। এই সুখী দম্পতি দেখে আমার বেশ ভালো লাগল। কিন্তু নিজের উষর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করলাম।

বেশ কয়েক রকম সুস্বাদু খাবার খাওয়ার পর আমরা ব্যারাকপুর যাত্রা করলাম। এখান থেকে ব্যারাকপুর প্রায় সত্তর মাইল সামনে। এবার স্বয়ং ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং-এর পাহারায় রওয়ানা হলাম। হঠাৎ করে ঝড় ও অবিরাম বর্ষণ শুরু হলো। কিন্তু সামরিক গাড়িগুলোর আশ্রয় পেয়ে কতকটা নিরাপদ হলাম। গোয়েন্দা যেমন শিকারি ধাওয়া করে, আমরাও তেমনি ঝড়ের ভেতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগুতে লাগলাম। সামনে প্রসারিত রাস্তাটা আবছা আলোতে দেখা যায় না। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ভ্রমণের পর গাড়িটা একটা দালানের কাছে থামল।

ওর গায়ে লেখা ছিল 'অফিসার মেস' ৭২ নং বি এস এফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স)।

এটাই আমাদের সাময়িক গন্তব্যস্থান। বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশে তারাগুলো উঁকি মারল। বাইরে কিছুক্ষণ কাটানোর পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ওদের অফিসার মেসে। আমাদের অফিসার মেসের চাইতে গুণগত দিক দিয়ে এটা অনেক নিচে। কিছু যায় আসে না। আমরা এখন ভিন্ন দেশের ৭২নং বি এস এফ অফিসার মেসে। পথের ক্লান্তিতে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করলাম। সুতরাং শিগগিরই পানীয় এলো। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের ধ্বনি ছড়িয়ে, এক ঝলক হাসি মুখে নিয়ে উপস্থিত হলেন একজন নতুন যুবক। ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সরকার। ভাই ও বন্ধুর চেয়েও বেশি অমায়িক ব্যবহার পেয়েছিলাম এই ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে। পরে আমরা আত্মীয়ের চাইতেও বেশি আপন হয়েছিলাম।

এই ৭২ বি এস এফ বাহিনীর এডজুটেন্ট ছিলেন তিনি। মিত্রবাহিনীর বন্ধুদের উল্লাস ধ্বনিতে আমি স্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। বাস্তবিকপক্ষে আমরা খুব সুখে ছিলাম। এই সময় অধিনায়ক মি. মুখার্জী এসে পৌঁছলেন। অধিনায়কের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। বয়সি লোক। ধূসর চুল মুখাবয়বে অভিজ্ঞতার ছাপ। আমরা খুব আস্তে আস্তে কথা বললাম। ভেতরটা তার বড্ড নরম, বড় কোমল।

পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যে সফলতা এসেছে সেটা সম্ভব হয়েছিল তার সুষ্ঠু নির্দেশনা ও ব্যক্তিত্বের জন্য। তাঁকে ভুলব না। তিনি আমার সথে মিশে অত্যন্ত আনন্দ পেলেন। তিনি আমাকে ও ক্যাপ্টেন হুদাকে সেই রাতেই নৈশভোজে আপ্যায়ন করার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাই জিপে করে তার বাসভবনে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী খুব অতিথিপরায়ণা। তিনিও মুক্তিযোদ্ধাদের দুরবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলেন। এ রকম একটি পরিচিত পরিবেশে থাকতে পারব, তা কল্পনাও করতে পারিনি। কারণ, পূর্ব বাংলা থেকে চলে আসার সময় নির্জনতার ভয়ংকর অনুভূতিগুলো ছেড়ে আসতে পারি। আর ওই অনুভূতিগুলোর সাথে একদিকে জড়িয়ে ছিল মৃত্যুর ভয়, অপরদিকে পাক-হানাদারদের প্রতি চরম ঘৃণা আর প্রতিহিংসার আগুন। কারণ, বাংলার পবিত্র অঙ্গন গণহত্যার তাণ্ডবতায় আজ বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। অধিক রাতে নৈশভোজে আয়োজন করা হলো। নৈশভোজে ভেসে উঠল রূপসী বাংলার বিবস্ত্র এলোকেশী রূপ। রক্তের বন্যায় বিগলিত অশ্রুধারা। দেশের এই মর্মান্তিক অবস্থা। আলোচনা করতে করতে আমি কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম । নৈশভোজের পর বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম তাদের মেসে।

সুন্দরবনে প্রেতাত্মা

কোনো কোনো লোকের কতকগুলো অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আমি দেখেছি, যখনই তারা তাদের ঈপ্সিত কোনোকিছু সমাধা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই বশ্যতা স্বীকার বা মাথা নোয়াবার পরিবর্তে ওই কাজটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে বারবার চেষ্টা করেছে। নিরাশ হয়নি বা আশা ছেড়ে দেয়নি। এসব লোকদের আমি ঈর্ষা করতাম, তাদের

পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হতাম। একবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হলে, পরাজয়ের গ্লানিটুকু অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে যখন আমি ভারতে আসি, তখন মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে এ রকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। শেষবারের মতো আমি ৭২ নং ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক মি মুখার্জীর বাসভবনে থামলাম।

অস্ত্রশস্ত্র যোগাতে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। নৈশভোজের পর তিনি আমাকে গাড়িতে করে কলকাতা নিয়ে গিয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিরাপত্তা বাহিনীর ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল মজুমদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে জানালেন যে, অধিনায়ক হিসেবে মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য আমি অনেক কাজ করতে পারব। আমার কী কী অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন মি. মজুমদারকে জানালাম। তিনি বেশ ধৈর্যের সাথে কথাগুলো শুনে আমাকে আশ্বাস দিয়ে ভদ্রভাবে বললেন যে, তাঁর সামর্থ্যমত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। মি. মজুমদারের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। বেশি আশ্চর্য হলাম তার সুন্দর ভদ্রতাবোধ দেখে এবং আশ্বাস বাণী শুনে।

ওই দিনই সন্ধ্যায় কলকাতার আসাম হাউজে নিরাপত্তা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মি. রুস্তমজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হলো। মি. মুখার্জীকে নিয়ে তার সাথে দেখা করলাম। আমার প্রতি যে আন্তরিকতা ও ভদ্রতা দেখিয়ে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বেশ আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী সিনিয়র অফিসার। তাঁর সাথে কথাবার্তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, বেশ অল্পদিনের ভেতরেই আমরা অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাব। অস্ত্র যোগাড় করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য। আমার চলাফেরার সময় মি. মুখার্জী ও তার অফিসের কর্মচারীরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাদের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুসুলভ। ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল মি. মুখার্জীর গাড়িতে করে আমাকে মেজর উসমানের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি মুক্তিসংগ্রামের আর একজন অধিনায়ক। পাক দখলদার বাহিনীর সাথে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে পর পর কয়েকটা যুদ্ধ করে উত্তর বাংলার পেট্রোপোলে তিনি ঘাঁটি গেড়েছেন। মেজর উসমান পাক-আমলে ই পি আর-এ চাকরি করতেন। তিনি অনেক

হালকা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে রেখেছিলেন তার ঘাঁটিতে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জমা দেখে আমার লোভ হলো। কারণ, পৃথিবীর যেকোনো জিনিসের চাইতে এই প্রয়োজন সমর যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের কাছে একটি মাত্র রাইফেলই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। কেননা, অস্ত্র ছাড়া একজন সৈনিকের গর্ব ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। যা হোক, অনেক কষ্টে অনেক বলা-কওয়ার পর মেজর। উসমানকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, আমিও তার মতো দেশের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেজর রাজি হলেন। অন্ধকারের ভেতর আশার আলো দেখতে পেলাম। সমস্ত কৃতিত্বই অধিনায়ক মি. মুখার্জীর। তিনি নিজে মেজর উসমানকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। সুতরাং এক ট্রাক বোঝাই হালকা অস্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে আমি হাসনাবাদ ফিরে এলাম। এখানে এগুলো লঞ্চে বোঝাই করার বন্দোবস্ত করতে হবে।

মেজর উসমানের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় আমার সহকারী ক্যাপ্টেন হুদা বেশ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। তার ওপরে প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি মি. মুখার্জীর সাথে ফোর্ট উইলিয়ম ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

প্রথমে ইস্টার্ন কমান্ডের ইনটেলিজেন্স অফিসার কর্নেল খেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম । তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন আমি কোথায় কোথায় ছিলাম, কী কী করেছি ইত্যাদি। তিনি যা যা প্রশ্ন করলেন সবগুলোরই উত্তর দিতে হলো আমাকে। একটা লোক তার কানে কানে কী বলতেই আমাকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাক্ষাৎ পেলাম।

তাঁর জামার বাঁ দিকের বুক পকেটটা আমায় স্মরণ করিয়ে দিল তার গৌরবময় জীবনের কথা। তার স্মিত হাসি ও আন্তরিক ভদ্রতা আমাদের ভেতর 'পদের' বাধা মুছে ফেলল। আমার মনে ভরসা এলো। তাই কোনো সংশয় না করে বা কোনো কথা গোপন না করে তার কাছে মনের কথা সবকিছু খুলে বললাম। এর ফলে, আমার উদ্দেশ্য পুরাপুরি সফল হলো। একটা মানচিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের কোথায় কোথায় গেরিলা ঘাঁটি আছে তাকে দেখালাম। দেখে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'খুব ভালো'।

সাথে সাথে কর্নেল খেরাকে নির্দেশ দিলেন আমাণে প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য করতে। এখানে কর্নেল খেরার সাথে আমাকে পুরো তিনটা দিন থাকতে হয়। সামরিক বাহিনীতে অন্যান্য গোয়েন্দা অফিসারের মতো তার অনুসন্ধিৎসু মনটা আমার সম্বন্ধে খুব উৎসুক হয়ে উঠল। বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের লোক হিসেবে খুব সতর্কতার সাথে কথা বললেন, নানা রকম প্রশ্ন করে। নিশ্চিত হতে চাইলেন যে, আমি সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কিনা। আমার পরিকল্পিত কাজের বিলম্ব হওয়াতে এই কয়টা দিন আমি ভয়ানক অস্থিরতার ভেতর কাটিয়েছিলাম। যা হোক, আমার বিরক্তি সত্ত্বেও, তার ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দেশের জন্য নিরাপত্তাবোধের আন্তরিক প্রশংসা না করে পারছি না। এখানেই তার কাছে প্রথম শুনলাম, ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি দস্যুদের হাতে বরিশাল-ফরিদপুরের পতন হয়েছে। হতাশায় মনটা ভেঙে পড়ল। এই জেলাগুলোকে রক্ষা করার পূর্বপরিকল্পনা আমার সাময়িকভাবে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও কঠিন সংকল্প নিলাম যে, যেভাবেই হোক এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই হবে। অস্ত্র তুলে দিতে হবে মুক্তি সংগ্রামীদের হাতে। আমার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা। আমার বিলম্ব হবার আরো একটা কারণ হলো: সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম কর্নেল এম এ জি ওসমানী যেভাবেই হোক আমার সাথে কলকাতায় সাক্ষাৎ করতে চান। ৫ মে পর্যন্ত আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তার ফিরে আসার কোনো লক্ষণই দেখলাম না। কেউ বলতে পারল না কখন তিনি ফিরে আসবেন। তিনি তখন সীমান্তবর্তী অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কঠোর চেষ্টা করছিলেন। এই বিলম্বে ভয়ানক চিন্তান্বিত হয়ে স্থির করলাম, আরম্ভ কাজ সমাধা করার জন্য আমাকে এখনই রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। ঠিক এই সময় মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু, লে. নাসের ও ক্যাপ্টেন হুদার পরিবার-পরিজন নিয়ে হাসনাবাদে পৌছল। বরিশালের পতন হওয়াতে তারা চলে এসেছে।

কি বিচিত্র লীলা! আজ আমরা সবাই যাযাবর। ঘর নেই, বাড়ি নেই, কিছু নেই সর্বহারা। ছিনতাই করা একটা সুন্দর নৌকায় করে মি. মঞ্জু ও তাঁর সাথের লোকজন এসেছে।

একদিকে ভালোই হলো। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের শেষ পরিস্থিতির খবর পেয়ে গেলাম। এতে সুবিধা হলো, তাড়াতাড়ি আমি একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে পারলাম। ক্যাপ্টেন হুদাকে নির্দেশ দিলাম যে, যখন আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকব, তখন যেন বাহকের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিস্থিতি অনুকূলে মনে হলে সরবরাহ ব্যবস্থা যেন অব্যাহত রাখে। আমাদের ক্যাম্পের দিকেও লক্ষ রাখতে বললাম। এই ক্যাম্পে মি. মঞ্জ, লে. নাসের ও ক্যাপটেন হুদার পরিবার-পরিজনও থাকত। সবাই মিলে মোট চল্লিশজন লোক দুটো লঞ্চে করে যাত্রা করলাম। আমাদের ভেতর। চারজন নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোক ছিল। বাকি সব ছাত্র। আমাদের গন্তব্যস্থানের রাস্তাঘাট আমার নিজেরও জানা ছিল না। লঞ্চে এ রকম একটা দুঃসাহসিক যাত্রায় আমিও মোটেই ভরসা পাচ্ছিলাম না। যেকোনো সময় বিপর্যয় আসতে পারে। যেহেতু, যাওয়ার পথে শত্রুরা চারদিকে ওৎ পেতে বসে ছিল। আমরা সবাই লঞ্চের পাইলটের ওপর নির্ভর করলাম। পাইলটরা তাদের অনেক বছরের অভিজ্ঞতার বড়াই করে আশ্বাস দিল যে, তারা আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দেবে।

ওদের দুঃসাহসিক কথাবার্তা ও আত্মবিশ্বাসের জোর দেখে স্বভাবতই আমি আদেশ করা থেকে বিরত রইলাম, যেহেতু যাওয়ার প্রকৃত রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাস্তা সম্পর্কে আমার ম্যাপ দেখা অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র। তৎসত্ত্বেও একটা সংক্ষিপ্ত অপারেশন প্ল্যান তৈরি করলাম।

প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝিয়ে বললাম, কীভাবে দুটো অস্ত্রশস্ত্র ভাগাভাগি করে নিতে হয় এবং শত্রুর সাক্ষাৎ পেলে নাগরিকরা কী করবে।

যাত্রা শুরু করার হুকুম দিলাম। একটা লঞ্চে মি. মঞ্জু, লে. নাসের এবং আরো কয়েকজন লোক আগে চলল।

আমার লঞ্চটা আগেরটার পিছু পিছু রওয়ানা হলো। কারণ, আমার লঞ্চে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ছিল। সামনের লঞ্চটায় মি. মঞ্জু ও লে. নাসেরকে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করার ভার দিলাম। পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তারা দুজনেই বেশ আশ্বস্ত ছিলেন। কারণ, মাত্র দু'দিন আগেই তারা এই পথে হাসনাবাদ এসেছেন। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পেট্রোল বোট চিত্রাঙ্গদা আমাদের শমশের নগর পর্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে গেল। এখান থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করব। শমশের নগর ভারতের শেষ সীমান্ত ঘাঁটি। রাত ন'টা। স্বাভাবিকের চাইতে বেশি অন্ধকার। সারা আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা। গায়ে বেশ ঠান্ডা পরশ লাগিয়ে বয়ে গেল এপ্রিলের বাতাস যা বসন্তের গন্ধ নিয়ে থাকে ঠিক তার মতো নয়। পথের গোপন ভয় সম্বন্ধে আমি বেশ সচেতন ছিলাম। এই ভয়ের কথা আমি আমার সাথিদের জানতে দিইনি। কিন্তু ওদের মুখেও ভীতির ছিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওরা আমার চাইতে খুব স্বস্তিতে নেই। নরম গলায় প্রস্তাব করলাম যে, রাত্রে এই যাত্রা করাটা কোনো রকমেই নিরাপদ নয়। রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা করাই উচিত। কিন্তু পাইলটরা যুক্তি খাড়া করে আমাকে বোঝাল যে, খালের ভেতর ঢুকার জন্য নদীর মোহনাগুলো রাতেই অতিক্রম করা বেশি নিরাপদ। খালের ভেতর ঢুকে ভোর পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নেয়া যাবে। যুক্তিতর্কে ওরা জিতল। শেষবারের মতো সবাইকে আর একবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

শুরু হলো যাত্রা। আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় সারা দেহমনে চাপা উত্তেজনা। যাত্রার লগ্নে দূরে বহুদূরে দেখতে পেলাম গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে আকাশটার চমকানি। এই যাত্রায় আমার কর্তব্য একজন সাধারণ যাত্রীর মতো, অধিনায়ক হিসেবে ছিল অনেক কম যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে তাদের। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছাড়াও রাতের গুমোট অন্ধকার। গত কয়েক দিনের ক্লান্তিতে আমার চোখ দুটো জড়িয়ে এলো। ঘুম পেল আমার। অন্তত কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দের মাঝেও আমি গভীর ঘুমে গা এলিয়ে দিলাম। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে দেখি, কে যেন চাপা গলায় ডাকছে: "গানবোট, গানবোট স্যার।

হ্যাঁ, সত্যিই তো গানবোট। ভূত দেখার মতো উপর তলার কেবিন থেকে ঝড়ের বেগে চীনা 'কার্বাইন'টা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ইঞ্জিনকক্ষে ঢোকামাত্রই দু'দিক থেকে প্রচণ্ড সার্চলাইটের আলো আর মেশিনের গুলি আসতে লাগল। ভেতরটা আমার অসম্ভব রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল বুঝতে পারলাম পাকিস্তানি গানবোট ওৎ পেতে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। রাতটা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। ঝড়ের দাপাদাপি। তার উপর চারদিকে সুচিভেদ্য

অন্ধকার আর মেশিনগানের অবিরাম গুলিবর্ষণ। সার্চলাইট দিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে হানাদার তন্ন তন্ন করে আমাদেরকে খোঁজ করতে লাগল। একটা গুলি এসে লঞ্চের পিছন দিকটায় আঘাত করল। শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার সাথের চারজন সৈনিক ছিদ্দিক, হাবিলদার জব্বার, মোকছেদ ও ইউসুফকে প্রথমে রাইফেলের গুলি করতে বললাম। যেন শত্রু পক্ষ মনে করে আমাদের শক্তি খুব কম।

আশ্চর্যজনকভাবে আমার এই পরিকল্পনাটা কাজে এলো। দেখতে পেলাম, আমাদের বাঁ দিকের গানবোটটা পুরো সার্চলাইট জ্বালিয়ে বৃষ্টি ও বিক্ষিপ্ত ঢেউগুলোর ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের লঞ্চটার পিছন দিকটায় আরো কয়েকটি গুলি এসে লাগল। বাইরের প্রবল বৃষ্টিপাত ও বাতাসের। শো-শো শব্দে গুলীর আওয়াজ অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছিল। সার্চলাইটের আলোকিত পথটুকুই শুধু চোখে পড়ল। পৃথিবীর আর সবকিছুই বৃষ্টির বাইরে। কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটা এলোমেলো হওয়া সত্ত্বেও অল্প সময়ের ভেতরে পাল্টা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলাম। ইতোমধ্যে সে গানবোট আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, সেটা প্রায় লঞ্চের কাছাকাছি এসে গেল। বলতে ভুলে গিয়েছি যে, আমাদের লঞ্চটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এটা নদীর তীরে, মাঝখানে অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

দু'জনকে মেশিনগান, দু'জনকে 'এনারগা গ্রেনেড' সজ্জিত রাইফেল নিয়ে বাম দিকে বসিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটা মেশিনগান নিয়ে ডান দিকের গানবোটটাকে লক্ষ্য করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই চারজনে ওই গান-বোটটাকে লক্ষ করে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করল। এই সময় গানবোটটা আমাদের বেশ আওতার মধ্যে এসে গিয়েছিল। এই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুরা ভয়ানক ঘাবড়ে গেল এবং ওদের প্রচুর ক্ষয়- ক্ষতি হলো। ওদের হৈ-চৈ শুরু হলো এবং গানবোট থেকে বিরাট একটা আগুনের গোলা ছিটকে পড়ল বুঝতে পারলাম, আমাদের নিক্ষিপ্ত রকেট ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। বাম দিকের গানবোটটাকে চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করে দিয়ে ডান দিকের গানবোটটাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঘুরে বসলাম। কিন্তু ওটা বিপদের আশঙ্কা করে মেশিনগানের আওতার বাইরে পালিয়ে গেল।

যা হোক শত্রুপক্ষকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্য গুলিবর্ষণ অব্যাহত রইল। এই সুযোগে অন্য দু'জন লোককে আমাদের আগের লঞ্চটার খোঁজ নিতে বললাম। কিন্তু মনটা ভীষণভাবে দমে গেল। যখন দেখলাম, আগের লঞ্চটা ঠিক আমাদের বাম দিকে চড়ার উপর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং ওর ভেতরের লোকজন আগেই পালিয়ে গেছে। সাথের বেশিরভাগ লোকজন পালিয়ে গেছে দেখে মনটা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ল। এমন সময় পালিয়ে গেল, যখন তাদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। অযথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করে আমার সাথের চারজনের প্রত্যেককে এক একটা মেশিনগান ও বহনযোগ্য গোলাবারুদের বাক্স নিয়ে লঞ্চ থেকে নামতে বললাম। ভাগ্য ভালো, আমরা তীরের কাছেই ছিলাম। অনিশ্চয়তা, নিরাশা ও ভয়ের আশঙ্কা আমরা তাড়াতাড়ি লঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। পায়ের নিচে আঠালো কাদা। কোমর পরিমাণ জলের ভেতর দিয়ে অনেক কষ্টে নদীর তীরে পৌছলাম। তীরটা আমার কাছে উঁচু বাঁধের মতো লাগল। তীরের দিকে আসার সময় যদি শত্রুর গোলা এসে পড়ত, তাহলে আমরা ঠিক হাঁসের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়তাম। কিন্তু আশেপাশে কোনো শত্রু ছিল না। হয়তো পুনরাক্রমণের জন্য গুলিবর্ষণ বন্ধ করা হয়েছিল। নদী থেকে অনেক উঁচুতে বাঁধের ওপর তাড়াতাড়ি ঘাঁটি গেড়ে বসলাম। সামনে থেকে যত আক্রমণই করা হোক না কেন, আমরা এখানে পুরাপুরি নিরাপদ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অচেনা, অজানা পথ। জীবনে কোনোদিন এখানে আসিনি। এসব চিন্তা করে নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। শত্রুর উপস্থিতি, ঝড়ের বিলাপ, কুচকুচে কালো আঁধার- সবমিলে রাতটাকে একটা প্রেতাত্মার ছায়ার মতো মনে হলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাঁধের পিছন দিকে মানুষের একটা অস্পষ্ট ছায়া মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শঙ্কিত পদে ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা লোক পালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এত ভীত যে, মনে হলো পৃথিবীটা খুঁড়ে তার ভেতর গিয়ে লুকাবে । মৃদুভাবে তাকে স্পর্শ করতে এমন জোরে চিৎকার শুরু করল যে, আমার শরীর কাঁপতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দেয়া সত্ত্বেও সে এমন বিলাপ করে চিৎকার আরো করল যে, উপর দিকে একবার চাইবারও সাহস পেল না। গরিব বেচারা! প্রায় বিকারগ্রস্ত। অনেক চেষ্টার পর সে শান্ত হলো। এই লোকটা হচ্ছে সেই সব পাইলটদের একজন, যারা

লম্বা লম্বা গাল ভরা কথা বলেছিল। অবশ্য তার কোনো দোষ নেই। কারণ, সে কোনো দিন গুলির শব্দ শোনেনি।

যা হোক, এই লোকটা আমার অনেক উপকারে এলো। আমি কোনো জায়গায় আছি এটা সে নির্ভুলভাবে বলে দিল। এসব ব্যাপারে এই ক্ষুদে 'সাহসী' লোকটির স্মৃতিশক্তির বেশ জোর আছে। এ জায়গাটার নাম 'গাবুরা'।

গাবুরা সুন্দরবনের কপোতাক্ষ নদীর তীরে একটা দ্বীপ। এখানে মানুষ খেকো অনেক রয়েল বেঙ্গল টাইগার তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে বিদেশি লোকের আশায় বসে থাকে। এই নদী অনেক হাঙর, কুমির, বিষাক্ত সাপ এবং অন্যান্য হিংস্র জলচরের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এই দ্বীপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর চারদিক বাঁধে ঘেরা সমান উঁচু। এর নিচের জায়গাটা 'বিলিয়ার্ড' খেলার টেবিলের মতো সমতল। এই সমতল ভূমির কোনো কোনো জায়গায় বিন্দুর মতো ছোট ছোট কিছু জীর্ণকুটির। যতদূর দেখা যেত সব ছিল একদম ফাঁকা। জায়গাটার পরিবেশ ও অবস্থানের কথা চিন্তা করে সংশয় জাগলো যে, ভোর হওয়া পর্যন্ত যদি আমরা এখানে থাকি, তাহলে শত্রু-পক্ষ হয়তো বা আমাদের মতো লোভনীয় বস্তুগুলোর ওপর হাওয়াই হামলা চালিয়ে ওদের মেশিনগানের ক্ষুধা মেটাতে পারে। তাছাড়া আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। শত্রুপক্ষ যদি স্থলপথে আক্রমণ করেই বসে- তাহলে কিছুতেই রুখতে পারব। এই অত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কোনো রকমে 'ক্রলিং' করে গ্রামের অভ্যন্তরে চলে যাওয়া।

আমাদের পিছন দিকে এই গ্রামগোলা প্রায় একমাইল দূরে। ইতোমধ্যে শত্রু-পক্ষের গানবোটটা অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়ে বাঁধের ওপর আমাদের অবস্থান ও নদীর তীরে পরিত্যক্ত লঞ্চ দুটোকে লক্ষ করে ভীষণভাবে মেশিনগান ও রকেটের গোলাবর্ষণ শুরু করল। ওদের অবিরাম গোলা বর্ষণে আমাদের দুটো লঞ্চেই আগুন ধরে গেল। আমাদের অবস্থানে থাকাটা অযৌক্তিক ভেবে আমরা ক্রলিং করে কোনো রকমে বাঁধের নিচের দিকে চলে গেলাম। আর খোদাকে স্মরণ করতে লাগলাম। কারণ, এই দুঃসময় এক খোদা ছাড়া আর কেউ শত্রুর হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারত না। কারণ, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল না। ঠিক এই

সময় আমার সঙ্গের চারজন সৈনিক এদিক-ওদিক সরে পড়ল। সম্ভবত তারা গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। পাইলট ছাড়া আর কাউকে আমার চারপাশে দেখলাম না। মেশিনগানের গর্জন আর রকেটের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে পাইলট আধমরার মতো আমার কাছে পড়ে রইল। গোলার ভয়ংকর আগুন আমাদের লঞ্চ দুটোকে নির্দয়ভাবে গ্রাস করল। পরাজিত মন ও ক্লান্ত দেহটা বাঁধের পিছন দিকে এলিয়ে দিয়ে হতাশার গ্লানি নিয়ে চেয়ে রইলাম লেলিহান বহ্নিশিখার দিকে। গোলার প্রচণ্ড শব্দ, রকেট বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ! উৎকট গন্ধে ভরপুর সমস্ত আকাশটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পরাজয়ের কালিমায় কিছুটা মলিন। বাত্যাতাড়িত বাবুই পাখির মতো আমি নিঃসহায়-বেদনাহত। বাবুই পাখি যেমন দূরবর্তী কোনো তাল গাছের ফোকর হতে সকরুণভাবে চেয়ে থাকে ঝড়ে বিধ্বস্ত তার সুন্দর বাসাটার দূর অবস্থার দিকে; আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি অসহায়, তেমনি মর্মান্তিক। পূর্ব দিকটা সামান্য হালকা হতেই পাইলটকে টেনে নিয়ে কোনো রকমে গ্রামের ভেতর ঢুকে সাহস করে সেখানে এক হাজী সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমাদের প্রতি সহৃদয় হবার জন্য ইঙ্গিতে তাঁকে অনুরোধ জানালাম। যখন তাঁকে খোদার চাইতেও জেনারেল ইয়াহিয়ার উপর বেশি অনুগত দেখলাম, তখন-যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে মনটা বিচলিত হলো। গ্রামের অধিকাংশ লোককেই দেখলাম ও বর্বর ইয়াহিয়ার প্রতি অনুগত ও ভক্ত। আমাদের প্রতি ভয়ানক বিরূপ মনোভাবাপন্ন মনে হলো। প্রকৃতপক্ষে এখানকার স্থানীয় লোকজনই আমাদের সাথে লে, নাসের, গণপরিষদ সদস্য মি. মহিউদ্দীন ও আরো ছাব্বিশজন লোককে ধরে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। আমিও এরকম একটা গন্ধ পেলাম যে, হাজী সাহেব আমাদেরও পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে তুলে দেবার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের চারদিকে অনেক লোকের ভিড়। তারা আমাদেরকে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে। আমরা দুটি যেন অদ্ভুত জীব। আমাদের এরকম দুরবস্থা দেখে ওদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখও প্রকাশ করল। এই অবস্থা দেখে হাজী সাহেবেরও বোধহয় দয়া হলো। তিনি আমাদের কিছু ভাত ও মধু দিলেন। এটা সুন্দর বনাঞ্চলের লোকদের একটা বিশেষ খাদ্য। খাবার দেখা মাত্র

আমার চোখ দুটো বড় হতে লাগল। কেননা, আমি ও আমার সঙ্গের পাইলট উভয়েই ভয়ানক ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত ছিলাম। গত রাতের ভয়ংকর পরিবেশে আমি ওর সাথে বড় একাত্ম ও আপন হয়ে গিয়েছিলাম। যখন এই অনির্ধারিত খাবার শেষ করে ফেলেছি, ঠিক সেই সময় হাজী সাহেব হাতে করে রাইফেলের 'ছেরেফ' একটা বোল্ট নিয়ে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কী? কেন তার ধারণা ছিল এটা কোনো কাজে আসে না।

তাঁর চোখের কোণে ভীতির চিহ্ন। এই দালাল শিরোমণিকে নিয়ে কিছু মজা করব স্থির করলাম। তার হাতে বোল্টটা দেখেই ভীতি জড়িত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং হাজী সাহেবকে বললাম যে, তার হাতের জিনিসটা খুব মারাত্মক ডিনামাইট। মাটিতে যেন কোনো রকমে না পড়ে, তাহলে সবাই মারা যাবে। শুনে হাজী সাহেব ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। এবার হাজী সাহেবকে হাতের মুঠোয় পেলাম। আমার কথায় তার কাঁপন শুরু হলো। তার চক্ষু স্থির, রক্তহীনের মতো বিবর্ণ। আপাদমস্তক তার ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমার হুঁশিয়ারি স্মরণ করে তিনি বোল্টটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়ার মতো সৎসাহসও দেখাতে পারছিলেন না। তার শোচনীয় অবস্থা দেখে আমি বললাম যে, ডিনামাইটের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে,

ওটাকে পানির মধ্যে ফেলে দেয়া। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আমার কথামত খুব আস্তে আস্তে আঙুল টিপে টিপে বোল্টটার দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে হাজী সাহেব পুকুরের দিকে রওয়ানা হলেন। আমার এই দুরবস্থার মধ্যেও ভয়ানক হাসি পেল।

সাথিরা আমার,

বড় মজার ব্যাপার যে, পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোক কত সরল, কত অজ্ঞ। যখন এই মজার ব্যাপারটা ঘটছিল, তখন হঠাৎ গানবোট থেকে হাজী সাহেবের বাড়ির দিকে আবার গোলাবর্ষণ শুরু হলো। হাজী সাহেবের বাড়িটা বড় একটা দালান। বহুদূর থেকে দেখা যায়। এই আকস্মিক ঘটনায় গ্রামের লোকজন যে যেদিকে পারল, ছিটকে পড়ল। এটা আমাদের পালানোর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ দেখা দিল। আমার সাথের

পাইলটটি মাত্র নদীর পার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। সে সাহচর্য ছাড়া আর কোনো প্রয়োজনে আসল না।

যা হোক, একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থেকে দিনটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আরম্ভ হলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে বাতাসের শো শো শব্দ। হাজী সাহেবের ছেলে আমাদের প্রতি খুব সদয় ছিল। হাজী সাহেবের ব্যবহারের আশ্বাস ও স্বস্তির রেশটুকু খুঁজে না পেলেও আমাদের প্রতি তাঁর ছেলের মমত্ববোধ দেখে এই দুঃসময়েও বাঁচার ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধলাম। হাজী সাহেবের ছেলে আমাদের খুঁজে বের করল। তাকে দেখে ভরসা পেলাম। সে আমাদের আশ্বাস দিল যে, খুব ভোরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে। তার সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম আবার সেখানে ফিরে গিয়ে সযত্ন প্রহরায় রাতটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিলাম।

প্রতিশ্রুতিমত হাজী সাহেবের ছেলে রাস্তার সব খবরাখবর আমাদের খুলে বলল এবং খুব ভোরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেল। খেয়া পার হবার জন্য সে আমাদের কিছু টাকা-পয়সাও দিল। কেননা, রাস্তায় অনেক নদী ও খাল পার হতে হবে। পথটা অত্যন্ত বিপদসংকুল। তাছাড়া সমস্ত অঞ্চলটা পাক-দালালে ভর্তি। প্রাণটা হাতে নিয়ে অনেক কষ্টে আমরা প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করলাম। কখনো হেঁটে, কখনো নৌকায়- এভাবে ভারতের সীমান্তবর্তী ঘাঁটি হিংগুলগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। হিংগুলগঞ্জের ঠিক উল্টো দিকে পাকিস্তানি সীমান্ত ঘাঁটি বসন্তপুর। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের ফেরার খবর আগে থেকে পেয়েই ওৎপেতে আমাদের ধরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলাম। ২৬ জন ছাড়া সঙ্গের অন্যান্য সবাইও পৌঁছে গেল।

সাথিরা আমার,

আমরা যে বেঁচে গিয়েছি, এটা ভাগ্য নয়। এটা একটা চরম পরাজয়। আর এজন্য আমিই দায়ী। কেননা, অধিনায়ক হিসেবে রাস্তাঘাটের সাথে পরিচিত ছিলাম না। তারপর অধীনস্থ লোকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের বিবেককে করেছিলাম খর্ব, তাই হারিয়ে ফেলেছিলাম নির্দেশ দেয়ার শক্তি। কিন্তু এক অর্থে, এই পরাজয়ের গ্লানি একটা বিরাট বিজয়।

কেননা, এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ মাত্র। ভবিষ্যতে যাতে চরমভাবে আঘাত হানতে পারি তার জন্য নতুন করে শপথ নিলাম। এই পরাজয় আমার চোখ খুলে দিল। সুতরাং এ পরাজয়, পরাজয় নয়। নতুন প্রস্তুতির দীপ্ত শপথ । নতুন সংকল্প নতুন আত্মপ্রত্যয়ে আমার মন উজ্জীবিত। এই কথাই আপনাদের বিশদভাবে এর পরে বলছি।

সর্বাধিনায়কের দরবার

ব্যর্থতার দুঃসংবাদসহ আমার ফেরার খবর হাসনাবাদ, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কানেও গিয়ে খবরটি পৌঁছল। অবশ্য তখন পর্যন্ত তার কোনো সদর দপ্তর ছিল না। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরে আমার ব্যর্থতার ময়না তদন্তের জন্য আমাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হলো। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই কর্নেল খেরার গম্ভীর মূর্তিটা আমার সামনে এসে হাজির হলো।

এখন কর্নেল খেরাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ মনে হলো। চোখে বিদ্রুপের ছায়া। গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি তার পকেট মেরে নিয়েছি। তার কাছে সবিস্তারে ঘটনার কথা খুলে বললে তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলো না। হয়তো আমার সম্বন্ধে সন্দেহ তার মনে আগে থেকেই বদ্ধমূল হয়েছিল।

আগে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে ছিলাম। ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমার মানসিকতা এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করে ভারতীয়দের প্রতি অনুগত হবো, এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি আমাকে সন্দেহ করতে লাগলেন। নিজের দেশের প্রতি একজন সৈনিকের আনুগত্য সব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে চিরদিন সমান খাতে প্রবাহিত হয় না। একটি বিশেষ কারণের জন্য সে দেশের প্রতি অনুগত থাকে। এই বিশেষ কারণটি হচ্ছে, মহান আদর্শ। এই মহান আদর্শের জন্যই আমি আজ নিজের বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করছি। কারণ, কমিশন প্রাপ্তির সময় যে আদর্শের জন্য শপথ নিয়েছিলাম-তা আর আজ বেঁচে নেই। একজন জেনারেলের যোগ্য স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্নেল খেরা

এতটুকু বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দেবেন বলে আমি মনে করেছিলাম। শেষপর্যন্ত গণপরিষদ সদস্য মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু এসে বুঝিয়ে বলার পর কুয়াশা অনেকাংশে কেটে গেল। এখন বলটা গড়িয়ে গেল আমাদের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম. এ. জি. তখন উসমানী সাহেবের দরবারে। তিনি একবার এদিকে, একবার ওদিকে এলোপাতাড়িভাবে বলটাকে লাথি মারতে লাগলেন। তাতে করে উত্তেজনায় নিজেই ক্ষতবিক্ষত হলেন বেশি। আমার বিপর্যয়ে তিনি মানসিক দিক দিয়ে এতটা চটে গিয়েছিলেন যে, আমাকে দেখা মাত্রই চরম উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। আমার পক্ষে এটা খুবই অশুভ। কারণ, দীর্ঘ দশ বছর পরে ওসমানী সাহেবের সাথে আমার এই প্রথম দেখা। আশা করেছিলাম, একজন সর্বাধিনায়কের মতো আমাকে বলবেন, 'মনে দুঃখ নিও না জোয়ান'। খেলার মধ্যে এরকম হয়েই থাকে। ভুলে যাও। আবার শুরু করো।' কিন্তু তাঁর ব্যবহার এত দুঃখ ও নৈরাশ্যজনক যে, সবকিছুরই যেন এখানে শেষ হয়ে গেল।

সাথিরা আমার,

এই ঘটনাই আমার জীবনের সবচেয়ে সংকটময় অধ্যায়। কারণ, অনেক কাগুজে-বাঘের সমালোচনার পত্র হয়েছিলাম আমি। আমার কোনো সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

আর আমি? আমি একজন কপর্দকহীন ভবঘুরে। পাগলের মতো হাসনাবাদ- ব্যারাকপুর, হাসনাবাদ-বনগাঁও পর্যন্ত সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী অথবা মেজর উসমানের কাছ থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের আশায় দৌড়াদৌড়ি করছি । মেজর উসমানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে একটা টয়োটা জীপ ও সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বিনামূল্যে পেট্রোল জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এর ফলে এদিক-ওদিক যাওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হলো। এ সময় মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু ও তাঁর ছোট ভাই ক্যাপ্টেন নূরুল হুদাও আমার সাথে এই দুশ্চিন্তা আর নিষ্ফলতার সমান ভাগিদার হয়েছিলেন।

এটা একটা সাময়িক বিরতির সময়। মুক্তিযুদ্ধের গতি কোনো দিকে –এ সম্বন্ধে বেশ একটা থমথমে ভাব। মে মাসের মাঝামাঝি। কেউ জানে না, আসলে কি ঘটছে। যদিও মি. তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মি. মুশতাক আহমেদ, মি. মনসুর আলী ও মি. কামারুজ্জামানকে

যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে একটা প্রবাসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এমনকি তার পরেও দেশ মুক্তির আগ পর্যন্ত মুক্তি-সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য এ মন্ত্রিসভা কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অক্ষম ছিল।

এই মন্ত্রিসভা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে কতটা কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতে পেরেছিল তা দেশের প্রতিটি মুক্তি-সংগ্রামীই ভালো করে জানে। আমি এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করব।

আমাদের সর্বাধিনায়ক এক সেক্টর থেকে অপর সেক্টরে 'লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর কারুর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেননা, জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত তার যে ক্ষমতাও ছিল না। এমনকি তারপরেও তার পরিকল্পনা শক্তি ছিল নিষ্ক্রিয়। যদিও প্রথমাবস্থায় গোটা বাংলাদেশকে ৬টি সেক্টরে ভাগ করে মেজর জিয়া, মেজর দত্ত, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর উসমান ও আমার উপর এর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভেতর কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কৌশল মোতাবেক আক্রমণ পরিচালনা করত। একটা থেকে আর একটা সংযোগহীন। আসল ব্যাপার হলো, খণ্ড খণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে সারাদেশের রণাঙ্গনগুলোকে উত্তপ্ত রাখা হতো। গর্বের সাথে দাবি করতে পারি যে, কনিষ্ঠ নেতৃত্ব, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাংলার মুক্তিযোদ্ধা, সৈন্য, পুলিশ ও ই পি আরেরাই ২৫ মার্চ থেকে জুলাইয়ের শেষপর্যন্ত তাদের প্রখর কর্তব্যবোধ ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের অব্যাহত ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অন্যথায়, শেখ মুজিবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত পৃথিবীর এই অন্যতম মুক্তিসংগ্রামের গতিধারা হয়তো অন্যরকম হতো। সংগ্রামের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলার এই কোমল মাটি থেকে আবির্ভূত হয়েছিল নতুন নেতৃত্বের, যে নেতৃত্ব একটি মুহূর্তের জন্যও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে সংগ্রামের গতিশীলতাকে ব্যাহত হতে দেয়নি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে আমাদের সর্বাধিনায়ক সব আঞ্চলিক অধিনায়কদের নিয়ে প্রথমবারের মতো একটা বৈঠকে বসেন

এবং উপরোক্ত ৬টি অঞ্চলকে নয়টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এর আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছিল নিষ্প্রভ। এটা অবশ্য ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু বেতারযন্ত্রের অভাবে নদীবহুল বাংলাদেশের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এক একটা অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত ছিল কমপক্ষে দু' থেকে তিনটি জেলা।

সাথিরা আমার,

অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি কোনো মতামত প্রকাশ করব না। তাঁরা হয়তো তাদের অধীনস্থ নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভিন্ন রকম অবস্থার মোকাবিলা করেছিলেন। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার শক্তির প্রধান উৎস মুক্তিযোদ্ধা, কিছু নগণ্য সংখ্যক সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনীর লোক।

যা হোক, এই সময় আমার অবস্থা ছিল খুব নাজুক ও অস্বস্তিকর। কেননা, সৈন্যবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আমি অধিনায়ক হয়েছিলাম। সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব পরিষ্কারভাবে জবাব দিলেন যে, আমাকে কোনো অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে না। এমনকি যে অস্ত্রশস্ত্রগুলো পাক-হানাদারদের সাথে মোকাবিলার সময় সুন্দরবনে খোয়া গিয়েছিল, সেগুলো উদ্ধার করার জন্য আমাকে চেষ্টা করার উপদেশ দিলেন। আমি তার কথাগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে হজম করিনি এবং এটাকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। মেজর উসমানকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে কিছু হালকা অস্ত্রপাতি দেয়ার জন্য তাঁকে রাজি করালাম। এভাবে তার কাছ থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং অধিনায়ক মুখার্জীর বদান্যতায় আরো কিছু অস্ত্রপাতি জোগাড় করে পাকবাহিনীর ঘাঁটি বসন্তপুরের ঠিক অপরদিকে হিঙ্গলগঞ্জে ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে একটা আক্রমণ পরিচালনা ঘাঁটি স্থাপন করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যাপ্টেন মেহেদী ও লে. জিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য চিন্তা করতে লাগলাম।

কোনো সহ-অধিনায়কের সাথে আমার কোনো যোগযোগের ব্যবস্থা না থাকায় আমার অধীনস্থ অঞ্চল থেকে অস্পষ্ট ও অতিরঞ্জিত খবর আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

যা হোক, নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলাম যে, বরিশালে হাবিলদার হেমায়েত, পটুয়াখালিতে ক্যাপ্টেন মেহেদী এবং সুন্দরবন এলাকায় লে. জিয়া হানাদার বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির অপ্রতুলতা একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনটা আবার নতুনভাবে সজীব হয়ে উঠল। কল্পনার পাখা মেলে অনেক গভীরে সন্ধান পেলাম অস্পষ্ট আশার আলোর। এ সময় ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরাই মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিলেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাবার জন্য আমি অধিনায়ক মুখার্জীর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ নম্র ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করলেন এবং সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। একবার যদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা যায়, তাহলে আমার অধীনস্থ সেক্টরের ভবিষ্যৎ কী হবে আমি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। সমস্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে সাথে করে বিভিন্ন ঘাঁটি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের আশায় দিন-রাত অবিশ্রান্তভাবে ছুটতে লাগলাম। কারণ, প্রথম ব্যর্থতার বোঝাটা আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আমাকে ধাওয়া করত। যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্বর পশুগুলোর ওপর একটার পর একটা প্রতিহিংসা নিতে পারলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যর্থতার গ্লানিকর ছায়াটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন হয়ে আমার কাঁধে চেপে রইল। সর্বক্ষণ আমি চলার ওপর ছিলাম। জুন মাসের আগ পর্যন্ত আমার কোনো সদর দপ্তর ছিল না। এসব কাহিনি আপনাদের পরে শুনাব। এই সীমান্তবর্তী শহরগুলো থেকে স্রোতের মতো শরণার্থী এপারে আসতে লাগল। আর তাদের সাথে হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক। এরাই মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তম অংশ। এক শরণার্থীর মর্মান্তিক ছবি আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। সে কাহিনি একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি

একটি স্মৃতি তা যত সাধারণ বা অসাধারণ, যত মর্মান্তিক বা প্রাণবন্তই হোক না, আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে একটা গৌরবময় সংযোজন হয়ে বেঁচে থাকে। কর্মবহুল দৈনন্দিন জীবনে সবার অলক্ষ্যে চিরাচরিত ধরাবাঁধা নিয়মে প্রতিদিন এই সূর্যটা পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু আপনারা কি কখনো মনের গভীরে ডুব দিয়ে দেখেছেন যে, হাজার হাজার, কোটি কোটি গল্প সম্ভারের কোনটা বা হাস্যোজ্জ্বল আনন্দের বন্যায় মুখরিত কোনটা বা ব্যাকুল হৃদয়ের আর্তিতে করুণ, কোনটা বা সংঘর্ষের, বিমান দুর্ঘটনার, কোনটা বা জাহাজ ডুবি, হত্যার আকস্মিকতায় ভারাক্রান্ত। এমনিতর আরো অনেক গল্প, বর্ণাঢ্য আবির মেখে নব নবরূপে জন্ম নেয় ওই সূর্য উদয়-অস্তের ফাঁকে। আবার পরক্ষণেই সমুদ্রের বুদবুদের মতো সবার অগোচরে হারিয়ে যায় আগামী দিনের বিস্মৃতির গর্ভে।

অকস্মাৎ চোখে পড়া রাস্তার ফুটপাতে ভিক্ষার বাসন হাতে কোনো করুণ মুখচ্ছবি বা গ্রামের উপেক্ষিত কোনো এক সর্বহারার কাহিনি মনে রাখা তো দূরের কথা, আমি স্বীকার করছি যে, মানুষের সমস্যাসংকুল জীবন থেকেও অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিজের অলক্ষ্যে হারিয়ে যায়।

কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসে বদ্ধমূল যে, স্মৃতিপট থেকে ওই করুণ ছবিগুলো মুছে গেলেও ক্ষণিকের ভাবান্তরকে অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

অনেক সময় তথাকথিত ভদ্রলোকদের ব্যবহার লক্ষ করে আমি ব্যথিত হয়েছি। পৃথিবীর কোথায় কি ছোটখাটো ঘটনা ঘটল তাতে ওই সাব্যস্ত ভদ্রলোকদের কি আসে যায়? ঘড়ি দেখে সময়মতো ক্লাবে গিয়ে নৈশভোজ ও বল ড্যান্সে শরিক হবার জন্যই তারা খুব উদগ্রীব। সমাজের এক দল লোক নৃত্যের স্বপ্নে বিভোর আর এক দল জীর্ণ কুটিরে কয়েকটি ক্ষুধার্ত মুখের অন্ন যোগাতে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরছে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যই বলুন, আমি এই দুই দলের মাঝ থেকে ওদের প্রত্যেকেরই কর্মকাণ্ড ও জীবন গভীরভাবে লক্ষ করি। কত জীবন্ত ছবি আমার চোখের ওপর দিয়ে প্রতিনিয়ত চলে যায়। বিশেষ করে অন্ধ, খোঁড়া ও হাজার জনতার মুখরিত উল্লাসের মাঝে অশ্রুসজল কতকগুলো মুখ। এই নগণ্য মানুষগুলোকে বার বার মনে পড়ে। ওদের খুঁজে বের করার জন্য এই

ব্যাকুল অন্তরটা কোথায় যেন কর্তব্যবোধের পীড়া অনুভব করি। ওই হারিয়ে যাওয়া জীবন্ত মুখগুলোকে খোঁজ করাই আমার জীবন।

উন্মাদের মতো স্মৃতিচারণ করি। স্নান-কক্ষের ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দেয় আর আমি ঝাড় দিয়ে ফেলে দিই না, সঞ্চয়ও করি।

সাথিরা আমার! জীবনের খরস্রোতে হাজার হাজার নিরীহ, নিঃসহায়-দুঃখী মানুষ একমুঠো অন্নের আশায় ভেসে চলেছে। বাঁচার কি করুণ আকুতি! মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপ উপেক্ষা করে কম্পিত পদে কাশতে কাশতে উপেক্ষিত জনতার এই মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের পৃথিবীটার দিকে। ক্লান্তিতে রেলস্টেশন বা ফুটপাতে পা এলিয়ে দিয়ে রাত কাটাচ্ছে। কেউবা পুলিশের দয়ায় বেঁচে থাকছে। এই অবহেলিত, উপেক্ষিত জনতার কথা মনে হলে-আমি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ি। ক্ষোভে-দুঃখে সারা অন্তরটা কুঁচকে ওঠে। এ উপেক্ষিত রক্তমাংসের মানুষগুলোই আমাদের সভ্য সমাজের বৃহত্তর অংশ। ভোরে উঠে এই মানুষগুলো আবার দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। পথের ক্লান্তি-রোগ-শোক-ক্ষুধা তৃষ্ণায় এই অসহায় মানুষগুলো মৃত্যুর কোলে চিরশান্তি লাভ করে। কেউবা ছেঁড়া কম্বলে তাদের কুৎসিত অবাঞ্ছিত মুখগুলো লুকিয়ে বিমর্ষ সূর্যটার উদয়াস্ত গুনতে গুনতে রাস্তার ফুটপাতে জীবনের বোঝা টেনে চলে। কী মর্মান্তিক দৃশ্য! এই ধরনের স্মৃতি সহজেই চোখে পড়ে। খুঁজে বের করা সম্ভব। যেমন কতকগুলো স্মৃতি আছে যা দৃষ্টিশক্তির বাইরে। এমনকি একজন বিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিও সহজে এড়িয়ে যায়। এদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, বোঝাও যায় না। এ অদ্ভুত মুখগুলো অন্ধের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলে না বা গাড়ি-ঘোড়ার অব্যাহত গতি ব্যাহত করে রাস্তা অতিক্রম করে না। বস্তুতপক্ষে এই মুখগুলো তাদের সঙ্গে কিছুই নিয়ে চলে না, যাতে করে এ ব্যস্ত পৃথিবীর বিশাল জনস্রোতের আবর্তে এই নিপীড়িত মানবাত্মাকে আলাদা করে ভাবতে পারা যায়। কিন্তু সত্যকে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। ভয়, ব্যথা, রোগ, ক্ষুধায় জর্জরিত এই ম্লান মুখচ্ছবির অন্তরালে সত্যের সেই কঠিন রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কর্মসংস্থানের নিরাশায়ও মুখগুলো মলিন, অপমানের রুক্ষ আঘাতে বিপর্যস্ত। অবর্ণনীয় ক্ষিপ্রতা ও ভয়ানক অস্বস্তি মেশানো গভীর অন্বেষা এই অবহেলিত জনতার চোখে। মন আমার সংবেদনশীল হয়ে ওঠে ওদের

দুঃখে। এ জীর্ণ মুখগুলোকে প্রাণপণে, অল্প সময়ের ভেতর, অনেক কিছু জোগাড় করার চেষ্টা করতে হয়। কারণ, ওদের প্রতীক্ষায় বসে থাকে রোগাক্রান্ত কতকগুলো চেনা মুখ একটু ওষুদ, একমুঠো অন্নের জন্য। পকেটে পয়সা নেই তারা কি কখনো একটু ওষুধের আশা করতে পারে? কখনো কি তাদের ইচ্ছে পূরণ হয়? তারা কি জোর করে নৈশক্লাবে ঢুকে জোর করে পয়সা চাইতে পারে? তারা পারে না। কেননা, তারা লাজুক, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও সংকুচিত। বোধহয় কিছুটা ধর্মপরায়ণ ও ভীতু। তাই বিসর্জন দিতে পারে না চিরাচরিত সংস্কারবোধটাকে। এই শ্রেণির লোকের জন্য আমি ভয়ানক ব্যথা অনুভব করি। ওদের চোখ-মুখ থেকে সমস্ত ইচ্ছে, সমস্ত স্বপ্ন কোথায় যেন উবে যায়। ওরা কতকগুলো ভ্রাম্যমাণ আত্মা। লাজুক মুখে শুধু দুঃখের পস্রা বয়ে নিয়ে বেড়ায়, বিত্তশালীদের দুয়ারে যায় দুঃখের কাহিনি শুনাতে। কিন্তু কেউ ওদের কথা শোনে না- ফিরেও তাকায় না। কেননা, ওরা আসল জায়গায় ঘা দিতে পারে না। লজ্জায় মনের কথা খুলে বলতে দ্বিধা-সংকোচে জড়িয়ে যায়।

না বলা দুঃখের ভারে নুয়ে পড়ে ওরা। অসহায়ভাবে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে জীবনের বাকি পথটা। শেষপর্যন্ত কঠিন জীবনটাকে শক্ত হাতে আটকে রাখার জন্য মর্মান্তিকভাবে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অচিরেই ওদের সব চেষ্টার অবসান ঘটিয়ে জীবনের স্তিমিত প্রদীপটা চিরদিনের জন্য নিভে যায়।

এই শান্ত, অসহায় জীবনগুলোকে বুঝতে হলে তাদের কাছে আসতে হবে, তাদের চোখের ভাষা বুঝতে হবে, তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। তা হলেই ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমি যা দেখেছিলাম, আপনারাও তাই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

আমি জিপে করে হাসনাবাদে আমার ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিলাম। হাসনাবাদ বাংলাদেশের দেবহাট্টা থানার ঠিক অপরদিকে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে শেষ থানা শহর। বর্ষা ঋতুতে বাংলাদেশের দিনগুলো বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনো আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন, কখনোবা মেঘের ফাঁক দিয়ে রক্তলাল সূর্যটার এক ঝলকহাসি। কখনো মুষলধারে বৃষ্টি, কখনোবা শ্বাসরোধকারী গুমোট হাওয়া। যদিও আমি গাড়িতে, তবু ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। বারাসড়িত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত সমস্ত

পথটা শরণার্থীর ভিড়ে জনাকীর্ণ। পাকিস্তানি বর্বরদের অত্যাচারে হাজার হাজার ছিন্নমূল পরিবার দেশ ছেড়ে স্রোতের মতো চলে আসছে। সমস্ত পথটা শরণার্থীর অসম্ভব ভিড়ে গিজগিজ করছে। হাজার হাজার নিরপরাধ বাঙালি তাদের সামান্য কিছু সম্বল কাঁধে নিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। মর্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক দৃশ্য। সন্তান তার বৃদ্ধা মাকে বাঁশের মাচান'-এ চ্যাংদোলা করে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ মহিলা ও পুরুষ বাঁচার উদগ্র বাসনায় শত শত মাইল গড়িয়ে এসে ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে। জীবনের ভয়ে সদা উদ্বিগ্ন-ভীত-ক্লান্তঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে রাস্তার মাঝপথে ভেঙে পড়ছে বুকফাটা কান্না আর বিলাপে সারা আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। এ কান্না, এ বিলাপ নিজেদের ক্লান্তির জন্য নয়, এ কান্না সন্তানহারা দুঃখিনী মায়ের কান্না। যে মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে পাকিস্তানি হিংস্র পশুগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে। ক্লান্তিতে মাতালের মতো এদিক-ওদিক পা ফেলতে ফেলতে ছোট ছোট শিশুগুলো মানুষের কাফেলায় এগিয়ে আসছে। ছোট ছোট পাগুলো ফেলে, শত শত দুর্গম বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে এই নিষ্পাপ শিশুগুলো ক্লান্তির দুঃসহ আঘাতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু মরণের ভরে ওরা শক্তি সঞ্চয় করে নিরাপদ জায়গায় ছুটে এসেছে। মায়ের বুকের শুকনো স্তন দুটো নিয়ে ছোট্ট শিশুর কি বুক ফাটা কান্না। বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক। স্নেহময়ী মা, ক্লান্তির ভারে বিবর্ণা। রুক্ষ পৃথিবীটার রূপ-বৈচিত্র্যে ভ্রুক্ষেপ নেই। এত ক্লান্ত যে, একটু বাতাস বইলেই এ বিদগ্ধ মানুষগুলো ভেঙে পড়বে। হাজার হাজার নরনারী আগে এসে কোনো আশ্রয় বা গাছের নিচে মাথা গুঁজেছে। ওরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ম্রিয়মাণ। প্রিয় আপনজনকে হিংস্র পশুগুলোর মুখে ফেলে রেখে চলে এসেছে। প্রতি মুহূর্তে এই চিন্তার জ্বালায় মৃতপ্রায় মানুষগুলো দ্বিগুণভাবে দগ্ধ হতে লাগল। সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে মানুষের দুঃখ-দৈন্য ও অসহায়তার বিষাদময় এক করুণ ছবি। দীর্ঘশ্বাস, কান্না ও চোখের জলে সমস্ত আবহাওয়া সিক্ত। সারা পথটা অন্তর্দাহন ও ভীতির আবরণে আচ্ছন্ন। ভারাক্রান্ত মন ও জল ভরা চোখে আমি এই পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাজার হাজার লোকের শোক-মিছিলের এই বিয়োগ ব্যথায় আকাশটা অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছিল। অসংখ্য মানুষের বুকফাটা

কান্নায় বিচলিত হয়ে ওই আকাশটা যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে চাইল। এ নিপীড়িত মানবাত্মার উদ্যম স্রোতে আমার সামনের কয়েক গজ জায়গা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারলাম না। আমার জিপের গতি খুব কমিয়ে দিয়ে আমার চারদিকের সর্বহারার সকরুণ ছবি দেখতে লাগলাম। নিজের চোখে না দেখলে এর গভীরতা উপলব্ধি করা যায় না। এসব করুণ দৃশ্যে মনটা আমার ভয়ানক বিচলিত হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে পাকিস্তানি বর্বরগুলোর ওপর প্রতিহিংসা নেবার জিঘাংসায় ভেতরটা অসম্ভব কঠিন হয়ে উঠল। ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সারা দেহমনে।

চারদিকে জনতার বিশাল স্রোত, ভেতরে আমার প্রতিহিংসার আগুন। আমরা ঘাঁটির দিকে ফিরে চললাম। সেখানে বাংলার হাজার হাজার দামাল সন্তান প্রতিহিংসার দীপ্ত শপথে বলীয়ান। কেউ ট্রেনিং নিয়েছে, কেউবা হানাদার বাহিনীর ওপর আঘাত হানার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। এই অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের প্রতি অসীম ও পবিত্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হানাদারদের ওপর প্রতিহিংসা নেয়ার কঠিন ব্রত নিয়েছে। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, সদ্য বিবাহিত এক যুবক-যুবতীকে পিছিয়ে ফেলে এসেছি। বিশাল জনস্রোতের মাঝে ওদের যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হলো। আমি আবার দুশো গজ পিছিয়ে গিয়ে যুবক-যুবতীর কাছে পৌঁছলাম। যুবতীটির কাঁধে ভর দিয়ে যুবকটি খুব আস্তে আস্তে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। অনিদ্রা, ক্ষুধা ও ক্লান্তির চিহ্ন ওদের সারা অঙ্গে। বধূটির পরণে একটা ধূলিমলিন ছেঁড়া শাড়ি। যুবকটির অবস্থাও তদ্রুপ শোচনীয়। স্ত্রীলোকটির বা কাঁধে দেখলাম কিছু জিনিসপত্র পুঁটলি বাঁধা। আর তার ডান কাঁধে ভর করে এগিয়ে চলছে তার রুগণ স্বামী। অনুভব করলাম, মহিলাটি যেকোনো মুহূর্তে বা কাঁধের বোঝাটা ছুড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু ডান কাঁধের বোঝাটা সম্বন্ধে আমার বেশ সংশয় ছিল। ওদের কষ্ট দেখে, দুঃখ-ভাবনায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। গাড়ি থেকে নেমে খোঁজ নেবার জন্য ওদের কাছে হেঁটে গেলাম। আমাকে দেখে ভয়ে ওদের চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল এবং ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে রাস্তার একপাশে থামল। দীর্ঘ দুর্গম পথে ওরা যে তস্কর-লুটেরার ভয় করছিল, আমাকে

দেখেও বধূটি সেই রকম ভয়ে ও দারুণ হতাশায় একদম ভেঙে পড়ল। প্রতি মুহূর্তে সে আশঙ্কা করছিল, যেকোনো সময় ডাকাত পড়ে ওর প্রিয় 'বোঝা দুটো'কে ছিনিয়ে নেবে। হারাবার আশঙ্কা যেন ওর সরা দেহমনে। ভয়াটা ভয়াবহ রূপ নিয়ে এই বধূটির স্তিমিত সত্তা এখনো যেন জীবন্ত। ওর খেয়ালই ছিল না যে, বিপদসীমা অতিক্রম করে অনেক আগেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে। এখানে অন্তত ওই রকম অমানুষ নেই যে, ওর সর্বস্ব কেড়ে নেবে। ওর সর্বস্ব বলতে কী বোঝায়, অন্তর দিয়ে অনুভব করতে দেরি হলো না।

হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে বুঝলাম ওর না বলা অনুভূতি ও ভয়ের কারণ কোথায়। আশ্বাস দিয়ে বধূটিকে জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটাকে সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি কে? আমার কথা শুনে লজ্জায় সে মাথা নত করল । ওর দ্বিধা ও সংকোচে সত্য উন্মোচিত হলো। বাঙালি নারীর সেই অতি পুরাতন প্রচলিত রীতি-তারা স্বামীর নাম মুখে নেয় না। হাজার দুঃখের মাঝেও এই বিদুষী মহিলাটি এই প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চলছে।

যা হোক, আমার ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, ওরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী, আমি তার স্বামীর অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে বধূটির সারা মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, শ্রীহীন। চোখ শুষ্ক। অন্যথায় সে একজন সুন্দরী যুবতী। ইচ্ছে করলেই সে পথিমধ্যে তার সাধের মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পথ অনায়াসে বেছে নিতে পারত। কিন্তু রুমা মানুষটির বোঝা সে অকাতরে বয়ে নিয়ে চলছে। বাঙালি জাতির ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এই বধূটি রুগণ স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। বাঙালি নারীদের কাছে স্বামী দেবতুল্য। স্বামীর সেবা ঈশ্বরের সেবা। সেই আরাধ্য ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে সে দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়েছে। অনেক বুঝিয়ে বলার পর মহিলাটি জানাল যে, তার স্বামী পায়ে পক্ষাঘাত রোগে ভুগছে এবং পরিষ্কার করে কথাও বলতে পারছে না। বধূটি কথা বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিল। যেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। সুতরাং তাকে কথা বলতে পীড়াপীড়ি করাটা আমি সমীচীন মনে করলাম না। আমার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে বধূটির সামনে ধরে আবেগজড়িত কণ্ঠে তাকে অনুরোধ জানালাম এগুলো গ্রহণ করতে। বাত্যাহত এই দম্পতি শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে টাকাগুলোর

দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল। অল্পক্ষণ পর উভয়ই মুখ তুলে আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। ক্ষুধা ও দীর্ঘপথ ভ্রমণের ক্লান্তির মাঝেও ওদের দৃষ্টি ভাবমুক্ত, শান্ত সমাহিত। মুহূর্তে মনে হলো, এ দৃষ্টি মৃত চোখের দৃষ্টি যে চোখের ফাঁকা মণিগুলো একটি সূক্ষ্ম তারের ওপর দিয়ে এ- পাশ থেকে ও-পাশ আনাগোনা করে। ওদের অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

নোটগুলো আবার বধূটির সামনে এগিয়ে ধরলাম। এবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের মুখের দিকে চাইতে লাগল। অপ্রত্যাশিতভাবে বধূটি টাকাগুলো হাত থেকে তুলে নিয়ে মাতালের মতো প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে উন্মাদের মতো একে অপরকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিল এবং দুরন্ত ইচ্ছেটার রশি ছেড়ে দিয়ে প্রাণভরে হাসতে লাগল। জীবনে আমি অনেক আঘাত পেয়েছি। তবু যুবতীটির এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমি বেশ সন্দিহান হয়ে উঠলাম। লজ্জিতও হলাম খুব। আমার সমস্ত সহানুভূতি উবে গেল। ওদের ব্যবহারে খুবই বিরক্তিবোধ করতে লাগলাম। উত্তেজিত স্বরে এই অহেতুক হাসির কারণ এবং কী নিয়ে তারা ঠাট্টা করছে জিজ্ঞেস করলাম। ভাবলাম, রাস্তার পাশে এই অপরিচিত লোক দুটির সামনে নিজেকে কি হাস্যস্পদই না করে তুললাম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আবার তারা আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। এবার তাদের দৃষ্টিতে যে জিনিসটির সন্ধান পেলাম, তা আগে ওদের চোখে দেখিনি। সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আমার রুক্ষ অনুভূতিগুলো আবার সজীব হয়ে উঠল। টুকরো টুকরো মানসিক সত্তাগুলো বুননীর পর বুননী গেঁথে গভীর যন্ত্রণা হয়ে আমার সারা দেহকে ঢেকে ফেলল। দুঃখের সাগরটা বাঁধ ভাঙার চরম লগ্নে সমাগত। ওদের কোঠরাগত চোখের গভীরে কি ভয়ানক ঝড়ের সংকেত। যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড মেঘপুঞ্জ একটার পর একটা জমা হয়ে বিরাট ঝড় তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঝড়ের পূর্বে আকাশটা যেমন শান্ত ও মূর্তি ধারণা করে, এ মহিলাটিও তেমনি শান্তভাবে কাগজের নোটগুলো হাতের মধ্যে ধরে রাখল। যেন তার কাছে নোটগুলোর কোনো মূল্য নেই।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। এক ঝটকা ঠান্ডা বাতাস মহিলাটির বিবস্ত্র চুলগুলো ওর মুখ ও কাঁধের ওপর ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। প্রকৃতির মতো তাকে রুক্ষ ও ধর্ষিতা বলে মনে হলো। দেখলাম তার চোখ দুটো

অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে তার হাত থেকে আমার দেয়া নোটগুলো মাটিতে পড়ে গেল। মাথা নুইয়ে এবার নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার অসহায়ার মতো আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। যেন সে তার অপরাধের গুরুত্ব মাপতে চাইছে। তারপর তেলহীন রুক্ষ মাথাটা স্বামীর দিকে ঘুরিয়ে দু'জনেই কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আমি ও আমার আর এক বন্ধু হতভম্ব হয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। এই রহস্যময় ও জীবন্ত দুঃখের নাটক দেখে। এই করুণ দৃশ্য দেখে আমিও ঠিক থাকতে পারলাম না। আমার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। ওদের সান্ত্বনা দিলাম। যদিও আমি ভালো করে জানতাম যে, আমার সহানুভূতি ও সান্ত্বনার বাক্যই ওদের দুঃখের সাগরে ঝড় তুলেছিল। যেমন কান্না ও মান-অভিমানের ঝড় বয়ে যায় যমজ ভাই-বোনের মাঝে যখন মান-অভিমানের পালা শেষ করে পিতামাতার কাছে যায় মীমাংসার আশায়।

এই সময়ের মধ্যে সেখানে বহু লোক জড় হয়েছিল। তারাও ওদের সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিছু কিছু টাকা-পয়সাও দিল। আমি তার স্বামীকে নিকটবর্তী একটা বেসামরিক হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে বললাম। ওদের চোখের অবারিত অশ্রুধারা, বিকট অট্টহাসি আমার মনে এমন গভীর রেখাপাত করল যে, নতুনভাবে আমার ঝিমিয়ে পড়া মনটা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলাম এবং বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম ওদের বিকট অট্টহাসি। প্রথম অবস্থায় মনে করেছিলাম ওই হাসির আড়ালে কোনো রহস্য হয়তবা লুকিয়ে আছে। এখন আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি, ওরা বা আমি কেউ কাউকে উপহাস করিনি। ওরা ভাগ্যের পরিহাসটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল মাত্র। যতই এই স্বামী-স্ত্রী দুটি ধীরে ধীরে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল ততই ওদের অশ্রুসিক্ত মুখচ্ছবি বার বার আমার মনে গভীর ছায়া ফেলতে লাগল।

সাথিরা আমার,

যারা দুঃখের কাহিনি শোনাবার জন্য পৃথিবীর জনস্রোতে দৈনন্দিন ভেসে চলে, ওরা তাদেরই স্বগোত্রীয়। উল্লসিত জনতার ভিড়ে ওই করুণ অসহায়

মুখগুলো মিশে আছে। ওরা জীবন্ত উপন্যাস, কুজ্ঝটিকাময় পৃথিবীর বিরাট রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, অনেক সুন্দর, অনেক আকর্ষণীয় জীবন্ত নাটক ছড়িয়ে আছে আমাদের চারদিকে। আগেই আমি উল্লেখ করেছি যে, এ নাটক দেখতে হলে নিপীড়িত জনতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, ওদের চোখের ভাষা বুঝতে হবে এবং জিজ্ঞেস করতে হবে। ওদের প্রয়োজনীয়তার কথা। ওদের একমাত্র প্রয়োজন হলো তাদের কাছে এসে চিৎকার করার অধিকার মাত্র-সাহায্যের চেয়েও সহানুভূতিশীল লোকের, কারণ অসহায়তা ও নির্জনতার ভয়ানক অভিশাপ ওদের সহজ ও সরল আত্মাগুলোকে সর্বক্ষণ তিলে তিলে দগ্ধ করে।

দৈবাৎ কখনো কোনো ক্লাবে যাওয়া সৌখিন যুবক যদি পথিমধ্যে কোনো দুঃখী লোকের কাছে থেমে দুটি সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে নির্ধারিত সময় থেকেও কিছুক্ষণ দেরিতে প্রিয়ার সাথে মনোহারিণী নৃত্যে গা এলিয়ে দেয়, তাহলে মনে হয় কোনো কিছুই তার হারাবার ভয় নেই। আমি নিশ্চিত যে, এতে কোনো প্রিয়াই কিছু মনে করবে না বা তার প্রেমের নদীতে ভাটাও লাগবে না। অবশ্যি এই আণবিক যুগে যদি সেই কেতাদুরস্ত যুবকটি উগ্র আধুনিকতার রং মেখে কায়দা করে বলতে পারে স-র-রি ম্যাডাম!

অত্যাচার জর্জরিত সেই যুবক-যুবতীর করুণ মুখচ্ছবি আজও আমার মনে পড়ে। কোনো কোনো সময় এই স্মৃতিগুলো বাস্তব জীবনের চেয়েও সত্য। উল্লসিত জনতার দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাই, অভিজাত সম্প্রদায় প্রসাধনী সামগ্রী কিনতে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করছে। মনে হয় ক্ষুধার্ত জীবনের চাইতে ত্বকের প্রসাধন তাদের বেশি দরকারি। কোনো গৃহকর্তাকে দেখা যায় বউকে খুশি করার জন্য প্রসাধনী কিনতে ব্যস্ত। আবার কোনো কোনো স্ত্রীকে দেখা যায় ক্ষুধার্ত স্বামীর মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার আকুল আশায় রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। কিন্তু সাথিরা আমার, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা কি ভাগ্যের রহস্যটাকে খানিকটা লাঘব করলে পারি না?

মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা

যদিও কোনো করুণ দৃশ্যে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়তাম এবং আমার উপরে এর প্রভাব ছিল ভয়ানক প্রবল, তবু নৃশংস পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে আমার মনে জমা হতে লাগল চরম প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার আগুন। বর্বর পশুগুলো হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ বাঙালিকে গরু-ছাগলের মতো ঘরছাড়া করে নিক্ষেপ করেছে দুঃখের অথৈ সাগরে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের যা কিছু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তাই নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে হিঙ্গলগঞ্জে একটা আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

হিঙ্গলগঞ্জ হাসনাবাদ থেকে বারো মাইল দক্ষিণে। পথের মাঝখানে দুটো নদী। আমার মনে পড়ে, ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন হুদা ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ২০টি রাইফেল নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল তিন চাকাবিশিষ্ট এক প্রকার গাড়ি আর নৌকা। ইছামতী নদী নৌকায় করে পার হতে হতো। কিন্তু এই নদীটা পার হওয়া খুব একটা নিরাপদ ছিল না। কারণ, ওপারে নদীর তীর বরাবর পাক বাহিনীর অসংখ্য বাংকার ও ট্রেঞ্চ খনন করে ওদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করে নিয়েছিল। এই ঘাঁটিগুলো ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে একজন পথিকের চোখে পড়ত।

জুন মাসে যখন থেকে থেকে প্রবল বর্ষা ও বাতাস আরম্ভ হবে তখন হুদার কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাতে যে কি কষ্ট হবে তা আমি এখনই মনে মনে অনুভব করতে পারলাম। কিন্তু আর কোনো উপায় বা বিকল্প পন্থাও নেই। সময়টা এমন সংকটময় যে, তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা করতেই হবে। এক বছর আগে ক্যাপ্টেন হুদা ইস্ট বেঙ্গল মেসে কর্মরত ছিল। মনে পড়ে, ক্যাপ্টেন হুদা একজন দক্ষ পদাতিক সৈন্যের মতো চতুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। হিঙ্গলগঞ্জে ভারতের ৭২ নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একটা স্থায়ী ফাঁড়ি আছে। ক্যাপ্টেন পান্ডে এর অধিনায়ক। তিনি তার ফাঁড়ির এক মাইল দক্ষিণে একটি ঘাঁটি বানাতে ক্যাপ্টেন হুদাকে সব রকম সাহায্য করলেন। এ ঘাঁটিটা ইছামতী নদীর তীর থেকে আধ মাইল ভেতরে। এর ঠিক উল্টো পাড়ে পাক হানাদারের সুদৃঢ় পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। এখানে ঘাঁটি স্থাপন করা কত কষ্টসাধ্য, ক্যাপ্টেন হুদার ভালোভাবেই

জানা ছিল। আমারও ভাবনার অন্ত ছিল না। কেননা, অধিনায়ক হিসেবে তার চাহিদামত তাঁবু, খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, টাকা-পয়সা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলামঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কারণ, তাদের জন্য গভীর সহানুভূতি ছাড়া আমার কাছে কোনো তরবিল ছিল না। এর জন্য দুয়ারে দুয়ারে আমি পাগলের মতো ঘুরেছি। শিগগিরই আমরা জীবনকে কঠিনভাবে উপলব্ধি করতে শিখলাম এবং গভীর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সব বিপদ, সব প্রতিকূল অবস্থাকে রুখে দাঁড়াবার নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলাম। কতটা আমরা সফলকাম হয়েছিলাম তা অনুধাবন করা যাবে। তখনই-যখন আমার পুরো কাহিনি বলা শেষ হবে। বসন্তপুর ইছামতী নদীর পূর্ব তীরে। কেউ শুনে বা বই পড়ে এ দুঃখের কাহিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ভারতের সীমান্তে হিঙ্গলগঞ্জে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যাবে ওপারে বসন্তপুর। মাঝখানে ছোট্ট ইছামতী। দুর্নিবার ইচ্ছা, ভালোবাসা ও আসক্তি সত্ত্বেও ওই রূপসী বাংলার কোলে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টসাধ্য। কেননা ওপারে মারণাস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল মানবতার জঘন্যতম শত্রু। গাণিতিক পরিমাপে বা চোখের দৃষ্টিতে আমার প্রিয় জন্মভূমি রূপসী বাংলা থেকে আমি বেশিদূরে ছিলাম না। কিন্তু মর্মস্পর্শী বেদনাপুত অন্তরে উপলব্ধি করলাম আমার সেই রূপসী বাংলা কত দূরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখতে লাগলাম অসভ্য বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম বাংলার গরিব-নিরীহ নির্দোষে জনতার বুকফাটা আর্তনাদ বুকে চেপে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো পাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠছে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ওই অসভ্য বর্বরদের হাত থেকে আমার মা-বোনদের বাঁচিয়ে আনার উদগ্র বাসনায় উত্তেজিত হয়ে উঠলাম! ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু কি দিয়ে আমি তাদের বাঁচাবো? মাত্র ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা আর ২০টা রাইফেল নিয়ে? হ্যাঁ, এই অসম্ভব কাজেও আমরা জীবনকে বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং সফল হয়েছিলাম।

মনে পড়ছে, ১৯৭১ সালের জুন মাসের ১২ তারিখ। সকাল থেকে ভয়ানক ঝড়। ভেতরে আমার ভয়ানক অস্বস্তি! কারণ, আমি জানতাম যে, ক্যাপ্টেন হুদার সাথের ছেলেরা এই ঝড়ের মধ্যে ছেঁড়া তাঁবুতে বসে বৃষ্টির জলে

অসহায়ের মতো ভিজছে। তাছাড়াও আমি ভাবলাম শত্রুর উপর অতর্কিত আঘাত হানার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ, আমি জানি যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝড় দেখে ভয়ানক ভয় পায়। বর্ষাকালের ঝাপটায় তারা তুলনামূলকভাবে অসতর্ক ও অলস থাকে।

ভাবনাটা মাথায় আসতেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বলিষ্ঠ যুবক ডাক্তার শাহজাহানকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমার সাথে আসতে বললাম। প্রাণ প্রাচুর্যে জীবন্ত এই ডাক্তার সাহেব। কোনো খোঁড়া বা জ্বরের রোগীকে দেখে সে যে আগ্রহ অনুভব করত, তার চেয়ে সে বেশি অনুভব করত শত্রুপক্ষের দিকে স্টেনগান উঁচিয়ে ধরতে বা তাদের বাংকারে গ্রেনেড ছুড়তে।

বোধহয়, আমার এই প্রিয় ডাক্তারটি কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রোর রামাঞ্চকর দর্শনের অনুগামী ছিল। যা হোক, সকাল ৮টায় আমরা দু'জনে দুটো ওভারকোট নিয়ে হাসনাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ইছামতী পার হতে পুরো এক ঘণ্টা সময় লাগল। হিঙ্গলগঞ্জে যাওয়ার পথে এটাই প্রথম নদী। বিক্ষুব্ধ ছোট্ট ইছামতী আজ ভয়ংকর রূপধারণ করেছে। এছাড়া খেয়ার মাঝি এই দুর্যোগময় মুহূর্তে খেয়া ছাড়তেও অস্বীকার করল। টাকায় সবকিছু সম্ভব! তাই সেই হাড্ডিসার রোগা খেয়াঘাটের মাঝি টাকার লোভ সংবরণ করে আমাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারল না। খুব কষ্টে নদী পার হলাম।

কিন্তু বড় বিপদে পড়লাম। কেননা কোনো টেম্পো গাড়িওয়ালা এই দুর্যোগে ঝড়ের মধ্যে গাড়ি ছাড়তে সাহস পেল না। এই দুঃসাহসিক কাজে ওদের রাজি করাবার জন্য বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। শেষপর্যন্ত তিনগুণ ভাড়ায় পৌঁছে দিতে ওরা সম্মত হলো। টারপোলিনে ঢাকা তিন চাকাওয়ালা এই গাড়িটা দেখতে বেশ কৌতুকপ্রদ। ভয়ংকর গর্জনশীল। কিন্তু গতি এর অত্যন্ত মন্থর। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা বরুণহাট নামক একটা জায়গায় নদীর পাড়ে পৌঁছলাম। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা নামক মহকুমার সাথে দুটো প্রধান স্থলপথে বসন্তপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা। একটা, পারুলিয়া হতে কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ হয়ে-অন্যটা সাতক্ষীরা শ্যামনগর রোড। পারুলিয়া থেকে যে রাস্তাটা গেছে সেটা বেশ প্রশস্ত। সি এন্ড বি'র রাস্তা। ভারি সামরিক যানবাহন এর ওপর দিয়ে

অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু পরেরটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তবু পাকিস্তানি শত্রুবাহিনী প্রায়ই এই রাস্তায় চলাফেরা করত। তাই সৈন্য চলাচল ও আক্রমণ পরিচালনার জন্য সামরিক দিক দিয়ে বসন্তপুর ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। বসন্তপুর অধিকার করে উপরোক্ত রাস্তা দুটোর উপর প্রভাব বিস্তার করা অর্থ একশ' বর্গমাইল মুক্ত এলাকা হাতের মধ্যে আসা এবং এই সংকটময় দিনগুলোতে এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

আমরা আমাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছি। তাই আমি ও আমার মতো অনেকের কাছে যারা রূপসী বাংলাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে, যুদ্ধ করেছে-তাদের কাছে এক ইঞ্চি পরিমাণও মুক্ত 'জয় বাংলার মাটি কত উদ্দীপনাময়। আমার মনের অবস্থা পূজনীয় প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একজন প্রেমিকের মত। সেই প্রেমিক যদি কোনো রকমের জানতে পারে যে, তার সেই মহান প্রেমের মর্যাদা ও সম্মান শুধু বিপদের সম্মুখীন নয়, কোনো দুরাত্মা নির্মম হস্তে তার শালীনতা হানি করতে উদ্যত তখন তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তীব্রভাবে অনুভূত হয় বেদনার অসহনীয় দংশন ও জ্বালা এবং যে অনুভূতিগুলো সহানুভূতি ও প্রেমের অফুরন্ত রসে সিক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় প্রিয়ার পাশে-তা শুধুমাত্র একজন প্রেমিকের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

ইছামতী নদীর চাইতে বরুণহাটের এই নদীটি পাশে ছোট। কিন্তু দেখতে ভয়ংকর দৈত্যের মতো। মোটকথা উত্তাল তরঙ্গমালা রুদ্র মূর্তিতে উচ্চতম শিখরে উঠে গভীর খাদের সৃষ্টি করে আবার নিচে নেমে আসত। এই অবস্থায় খেয়াপার হওয়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক। অযথা সময় নষ্ট না করে সুযোগ সন্ধানী এক নৌকার মাঝিকে বেশি টাকা দিয়ে পার হলাম। কোনো যানবাহন ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে হিঙ্গলগঞ্জে ক্যাপ্টেন হুদার আস্তানায় পৌঁছতে হবে। ভয়ানক শীত। তার উপরে বৃষ্টিতে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। মধুময় কল্পনার আবির মেখে হাঁটু পরিমাণ কাদা ভেঙে ক্যাপ্টেন হুদার ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। সামান্য একটু উঁচু জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা আস্তানা গেড়েছিল। তাঁবু ভেদ করে বৃষ্টির পানি পড়ছে। ক্যাপ্টেন হুদাকে বড়ো বিষণ্ন মনে হলো। উঁচু জায়গাটার চারদিকে বৃষ্টির পানি জমে সমুদ্রের মতো মনে হলো। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমাকে আসতে দেখে হুদা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। মুখে তার দৃঢ়

প্রত্যয়ের হাসি। কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম। ডাক্তার অদম্য সাহসে প্রদীপ্ত। পথে সে আমাকে বলেছিল-এ রকম একটা রোমাঞ্চ তার কাম্য। আমরা তিনজনে মিলে তাঁবুর চারদিকে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বচক্ষে দেখলাম। হাঁসের মতো ভিজছে ওরা-তবু মুখে ওদের প্রত্যয়ের হাসি উচ্ছল প্রাণবন্ত।

যখন সারা দেশটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন এই বিপর্যয়ের সময় তাদের মাঝে আমাদেরকে দেখতে পেয়ে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করল। জয় বাংলা বলতেই, সবাই বৃষ্টির মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 'জয় বাংলা' ও 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে আমাদের স্বাগত জানাল। এ দৃশ্য অভূতপূর্ব। এত প্রাণচাঞ্চল্য আমি আর আগে কখনো দেখিনি। ওদের সেই প্রাণচাঞ্চল্যে খুঁজে পেলাম আগামীদিনের বিজয়োৎসবের গোপন সংকেত। রূপসী বাংলার শৃঙ্খল মোচনের কঠিন প্রতিজ্ঞা অনির্বাণ শিখার মতো প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে দীপ্যমান। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেসব করুণ কাহিনি বলে যেতে লাগলাম-বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি পশুগুলো কি মর্মান্তিকভাবে মা-বোনের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে, বর্বরতম পন্থায় অত্যাচার চালাচ্ছে নিরীহ- নির্দোষ জনতার ওপর। এই কাহিনি শুনে মুক্তিযোদ্ধারা একসঙ্গে প্রতিহিংসার আগুনে পড়ল। ওদের মনোভাবের উত্তপ্ততা লক্ষ করে আমি চিৎকার করে প্রশ্ন করলাম আজ রাতেই তোমরা কি সবাই যুদ্ধ করতে রাজি আছ?'

কী আশ্চর্য! ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ৩৫ শত লোকের মতো চিৎকার দিয়ে উত্তর দিল 'হ্যাঁ স্যার, আমরা সবাই প্রস্তুত।'

ওদের উঁচু মানসিক শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি খুব ভরসা পেলাম। আগ্রহী কণ্ঠে বললাম, ও কে।

এই বলে ওদের বিদায় দিয়ে হুদার তাঁবুতে ফিরে গেলাম এবং আমরা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোথায় আক্রমণ চালাতে হবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। এ ব্যাপারে সোবহান নামে একজন হাবিলদার অনেক সাহায্য করেছিল। পাকিস্তানি আক্রমণের আগে সোবহান বসন্তপুরে গোয়েন্দার কাজ করেছে। কাজেই সেখানকার সব খবরই তার জানা ছিল। ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে সে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার

পরিচয় দিয়েছিল। রাত একটায় শত্রুপক্ষের বাংকারে ঝটিকা আক্রমণের পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য, ওদের বাংকারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে কাবু করা এবং পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসা। পরিকল্পনাটা শুনতে মধুর ও উত্তেজনাকর লাগলেও-এই ঝড়ের রাতে এ দুঃসাহসিক কাজটা সমাধা করা ছেলেখেলা নয়। অথবা যে প্রিয়া বুকের সমস্ত উষ্ণতা নিয়ে প্রেমাস্পদের আগমন আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তার প্রেমকুঞ্জে অভিসারে যাওয়াও নয়। বরং এটা হচ্ছে সেই চুপি চুপি অভিসার যার উষ্ণতার অপেক্ষা করছে মেশিনগানের বুলেট আর হিমশীতল রক্তাক্ত মৃত্যু। এটা মুক্তিযোদ্ধারা জানত। তবু তারা বা প্রথম অভিযানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা মোটেই দমলো না। খুব জোরে ঝড় বইছিল। একবার ভাবলাম, ঝড়ের রাতে এই বিক্ষুব্ধ নদীটা পার হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মন থেকে এই নৈরাশ্যকে দূরীভূত করলাম। কেননা, আমাদের বিজয় সম্বন্ধে আমি খুবই আশাবাদী ছিলাম। জানতাম, সবাইকে বিস্মিত করে অভিযান সফল হবেই। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সবাই সামান্য খাবার খেয়ে নিলাম। সৌখিন পাচকেরা এসব পাক করেছিল। তারাও অভিযানে শরিক হলো। যখন আমি হুদার কাছে আমার উদ্দেশ্যের কারণ ব্যাখ্যা করছিলাম, তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা ধারণা এলো যে, একই সঙ্গে টাউন শ্রীপুরে পাকহানাদারদের অপর একটি ঘাঁটি আক্রমণ করব। ভারতের সীমান্তবর্তী শহর টোকিও'র অপর দিকেই টাউন শ্রীপুর। সেখানে শাহাজাহান নামে একজন স্কুল শিক্ষকের অধীনে অনেক ট্রেন্ড মোজাহিদ আছে। মি. শাহাজাহান বুদ্ধিমান, হাসি-খুশি এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ। গণ্ডগোলের আগে মি. শাহজাহান টাউন শ্রীপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি মোজাহিদ বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। তারা টাউন শ্রীপুরের বাসিন্দা হওয়ায় ওখানকার পাকিস্তানি ঘাঁটির সঠিক অবস্থান, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল ছিল। সুতরাং দুর্যোগময় রাতটার তাৎপর্য আমার কাছে দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

ক্যাপ্টেন হুদাকে বিদায় জানিয়ে আমি ও ডাক্তার শাহাজান দু'মাইল রাস্তা হেঁটে 'টাকি' এলাম এবং মি. শাজাহানের সাথে আলাপ-আলোচনা করলাম। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আমার অধীনে কাজ করতে রাজি হলেন। মি.

শাজাহানের অধীনে লে. মুখার্জী নামে একজন অসম সাহসী যুবক কাজ করত। সে পূর্বে যশোরের অধিবাসী ছিল এবং দাবি করত যে, সে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব অফিসার। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। বেশ শক্তিশালী। অন্য দু'জন মোজাহিদ-সেকশান লিডার মি. মণ্ডল ও সোবহানের সাথে লে, মুখার্জী একত্রে ট্রেনিং নিয়েছে। টাউন শ্রীপুরে পাকহানাদারের ঘাঁটি আক্রমণ করব শুনে মি. মুখার্জী উত্তেজিত হয়ে বসন্তপুর অভিযানের মতো এখানেও এদের ইছামতী পার হয়ে যেতে হবে। ইছামতী আরো উত্তরে গোজা ডাঙ্গা পর্যন্ত নিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলোর ঠিক অপরদিকে পাকিস্তানি পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি। আমার সেক্টরে ইছামতী নদীর তীর বরাবর দু'তিন মাইল অন্তর অন্তর পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলোর অবস্থান। সর্ব উত্তরে শংকরা। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে টাউন শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজী, বসন্তপুর, উসা ও সর্বশেষে কৈখালি। এ সমস্ত পাকিস্তানি ঘাঁটি শক্তি বিভিন্ন রকমের। ভাবলাম, আমার প্রথম কাজ হলো, রাতের অন্ধকারে এবং গোপনে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে এই বিক্ষিপ্ত পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলো অধিকার করা। এতে করে গেরিলাদের জন্য কতকগুলো গোপন অবস্থানের পরিকল্পনা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে- যাতে একটা মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা যায়। বাস্তবিকপক্ষে প্রথম অবস্থায় আমার পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় সীমান্তে টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ ও শমশের নগর -এই তিন জায়গায় আক্রমণ ঘাঁটি করে এর ঠিক বিপরীত দিকে পাকিস্তানি ঘাঁটি টাউন শ্রীপুর, বসন্তপুর ও কৈখালি অধিকার করা। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অপ্রতুলতা হেতু আমার আশা সফল হয়নি। তবুও আমার কল্পনার উদ্যম গতি থামেনি। যারা নিজেদের ভাগ্য গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একথার সত্যতা প্রমাণিত হলো ১৩ জুন যখন ক্যাপ্টেন হুদা বাহকের মারফত খবর পাঠাল যে, সেই দুর্যোগময় রাত্রে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করে ২০ জন হানাদারকে খতম এবং ৫০টি রাইফেল দুটি এল এম জি, অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড ও বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমন্ত শত্রুদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। শত্রুপক্ষের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমাদের একজন যুবক সামান্য আহত হয় মাত্র। শত দুঃখের মাঝেও বিজয় গর্বে

বুক ফুলে উঠল। লে. মুখার্জী, মি. মণ্ডল, সোবহান ও মি. শাহাজান আমার সদর দপ্তরে এসে খবর দিল যে, তাদের আক্রমণও সফল হয়েছে। ওদের সবার মুখেই বিজয়ের হাসি। বিজয়োল্লাসে মি. শাহাজাহান আমাকে অভিনন্দন জানাল। আমিও আন্তরিকভাবে ওদেরকে স্বাগত জানালাম। আমার সুন্দরবনের ব্যর্থতার গ্লানি আজ যেন কিছুটা লাঘব হলো। পরক্ষণেই প্রতিহিংসার দাবানল আমার ভেতর আবার দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। মি. শাজাহানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা ৩৫টি রাইফের ও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করেছিল। এই বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র হাতে আসায় আমার আক্রমণ পরিচালনা ঘাঁটির পরিধি আরো প্রসারিত করতে মনস্থ করলাম। ওই দিনই মি. শাহাজানের সহায়তায় টাকিতে আমার অন্তর্বর্তীকালীন ঘাঁটি স্থাপিত হলো। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি দক্ষ সৈন্যের ওপর দুর্যোগের মধ্যে হামলা চালিয়ে এই বিরাট সফলতা অর্জন করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন হুদা, মি. শাহজাহান, লে. মুখার্জী ও মি. মণ্ডলকে অভিনন্দন জানালাম। একই সঙ্গে খুব অল্প সময়ের ভেতর সীমান্তবর্তী সমস্ত পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করার ইচ্ছে ওদের কাছে প্রকাশ করলাম। এছাড়াও আর একটা জিনিসের ওপর জোর দিলাম যে, সীমান্তের ওপারের ছেলেদের জোগাড় করে এ মুহূর্তেই ওদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য টাকি থেকে দুই মাইল দূরে 'টকিপুরে' একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিলাম। সীমান্তের ওপার থেকে ছেলে যোগাড় করার দায়িত্ব মি. শাহজাহানকে দিলাম। বসন্তপুর ও টাউন শ্রীপুরে আমাদের সফলতার খবর সর্বাধিনাকের কানে শিগগিরই পৌঁছে গেল। ভবিষ্যতে আরো এরকম সফলতা আশা করে তিনি স্বাগত জানালেন। ইতোমধ্যে সামরিক বাহিনীর অনেক লোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র সীমান্ত পার হয়ে এপারে চলে এলো। ছাত্রদের টাকিপুর যুবকেন্দ্রে ট্রেনিং-এর জন্য এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের হুদার ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের সাথে বরিশাল থেকে এম এ বেগ নামে একজন লোক এসে পৌঁছল। যুবক, শিক্ষিত ও চটপটে। গায়ের রং কালো। সারা মুখমণ্ডলে প্রতিভা ও চাঞ্চল্যের স্বাক্ষর। সে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে একজন দক্ষ প্যারাসুট সৈনিক ও একজন ফ্রগম্যান হিসেবে অনেক দুঃসাহসিক কাজে নিযুক্ত ছিল। এসব কাজে ওর সমতুল্য বড় একটা কেউ ছিল না। পশ্চিম

পাকিস্তানের 'চেরাটে' দীর্ঘ আট বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর পাকিস্তান নৌবাহিনীতে 'মিডশীপম্যান' হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়। ওখান থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এ রোমাঞ্চকর জীবন ছেড়ে পালিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল: 'বাংলাদেশ"। হেসে জানাল, আরব সাগরের নোনা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় সে বারুদের গন্ধ পেয়েছে! আরো দুটো সাহসী ছেলেকে সাথে নিয়ে বেগ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হাসনাবাদ পৌছল। বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানার কুড়িআনা নামক একটা গ্রামে পাক হানাদারদের সাথে সংঘর্ষের এক চমকপ্রদ কাহিনি শুনাল ও। জায়গাটা স্বরূপকাঠি থানার অনেক ভেতরে। এখানে সারি সারি অনেক পেয়ারা বাগান আছে! দুটো সারির মাঝখানটা নালার মতো। সেখানে যে কেউ অনায়াসে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকতে পারে। বেগ প্রায় একশ' ঝানু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে দিনের বেলায় এই নালার মধ্যে লুকিয়ে থাকত এবং রাতের অন্ধকারে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হানাদারদের ওপর আঘাত হানত। সবার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। কারও কারও কাছে আমাদের পূর্বপুরুষের সযত্নে রক্ষিত-সেই মান্ধাতা আমলের তীর-ধ -ধনুক-বর্শা ইত্যাদি থাকত। বেগ-এর বাহিনীর অবিরাম আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত পাকহানাদাররা একদিন এক দালালের কাছে খবর পেয়ে দিনের বেলায়ই ওদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য অগ্রসর হলো।

বেগও ঠিক সময়মত বাহকের মারফত হানাদারদের অগ্রসর হবার সংবাদ জেনে গেল এবং হাতের কাছে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও পুরানো আমলের তীর-ধনুক পাওয়া গেল-তা নিয়েই ওর লোকজনদের প্রধান প্রধান জায়গায় বসিয়ে দিল। একদিকে নগণ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাংলার দুর্জয় মুক্তিবাহিনী, অন্যদিকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পৃথিবীর অন্যতম দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি সৈন্য সবাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রাচীন রোমনগরী বা অন্য কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধের মতো এখানে বেজে উঠল না কোনো রণদামামা। উত্তেজনা চরমে উঠল যখন দালালরা প্রায় ৫০ জন হানাদারকে সাথে নিয়ে এসে পেয়ারা বাগানের ভেতর তল্লাশি চালাতে চলল। হানাদাররা বাগানে ঢুকে খুব সতর্কতার সাথে বাগানের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। দক্ষশিকারির মতো বেগ তার দুঃসাহসিক মুক্তিবাহিনী নিয়ে অসম্ভব রকমের চুপচুপ।

কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ওরা অপেক্ষায় ছিল কতক্ষণে শত্রুপক্ষ বন্দুকের নলের আওতায় আসবে। পাকহানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তি বলে ডাকত। অনেক তল্লাশি চালিয়ে ও কোনো মুক্তির খোঁজ না পেয়ে হানাদাররা পাকা পেয়ারায় ভর্তি একটা গাছের ওপর বিশ্রাম নিতে লাগল। আর কি! চতুর্দিক থেকে আচমকা ছুটে আসতে লাগল বন্দুকের গুলি, তীর, বর্শা ইত্যাদি। হতভম্ব হয়ে হানাদাররা চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক ছুট দিল। ঘটনাস্থলেই ২০ জন হানাদার খতম হলো। বাদবাকিগুলো জীবনের মায়ায় পেয়ারা গাছের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। ওদের পলায়নের পালাটাও খুব আরামে কাটল না। বাগানের বোলতা ও মৌমাছি ভয়ানকভাবে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতে-মুখে হুল ফুটাতে লাগল। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে বাংলাদেশের বোলতা ও মৌমাছিরাও মুক্তিসংগ্রামে ওদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। কেনইবা করবে না। ওরাওতো শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ডাকে-'যার যা আছে মন্ত্রে একইভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল!

পরে শুনেছি, পেয়ারা বাগানের এ পরাজয় হানাদারদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। কেননা, ওরা ওদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলে বেড়াত, 'আরো ইয়ার-মুক্তিরা কি কামড়ায়?' মাথাভারী পাকিস্তানি পশুগুলো বোলতার কামড়কে 'বাংলার জাদু' বলে মনে করত। মুক্তিযোদ্ধারা না-কি এই জাদুমন্ত্র দিয়েই ওদের কাবু করত। হে বোকাগুলো শেষপর্যন্ত স্থানীয় লোকজন দ্বারা সম্পূর্ণ পেয়ারা বাগান কেটে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে করে ভবিষ্যতে ওরা নিরাপদ হতে পারে। এই ঘটনার পর বেগ তার গোপন আড্ডা ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি জায়গায় গিয়ে 'জাদু' দেখাবার আয়োজন করছিল। ঠিক সেই সময় গোলাগুলির অভাব দেখা দিল। তাই ওকে বাধ্য হয়ে সুন্দরবনের গোপন পথ ধরে হাসনাবাদ আসতে হয়েছে। এই সময় বেগের মতো একজন দক্ষ লোকের সাহায্য ও সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা, যে নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। তার ইচ্ছা ছিল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে শত্রুদের ওপর আঘাত হানবে। কিন্তু ওকে আমি যেতে দিলাম না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ওকে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে

পাঠালাম। হুদা বেগকে ভালো করেই চিনত। কারণ, ছোটবেলা থেকেই বরিশালে পাড়া-পড়শী হিসেবে বসবাস করে আসছে। বেগকে পেয়ে ক্যাপ্টেন হুদা ওর কাঁধেও কিছুটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিল।

বসন্তপুর ঘাঁটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব ওদের একার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমার দৃষ্টি আরো দক্ষিণে শমশের নগরের দিকে নিবদ্ধ করলাম। হাসনাবাদ থেকে শমশের নগরের দূরত্ব চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল। আক্রমণ পরিচালনার জন্য কৌশলগত কতকগুলো মূল অসুবিধা ছিল।

প্রথমত, জায়গাটা আমাদের আওতা থেকে অনেক দূরে। যাতায়াত ব্যবস্থা একমাত্র নদীপথ।

দ্বিতীয়ত যদিও ভারতীয় সীমান্তবর্তী ফাঁড়িতে একটা বেতার ব্যবস্থা ছিল, তবু আমাদের পক্ষে ছিল কষ্টসাধ্য। তাছাড়াও নতুন আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করার আগে জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রীর স্বল্পতার কথা চিন্তা করতে হবে। এ সমস্ত সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নতুন করে কোনো কিছু করতে যাব কিনা এ বিষয় নিজে নিজে ভাবছিলাম। সৌভাগ্যবশত একদিন ভোরে ২০০ ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বিহার প্রদেশের 'চাকুলিয়া' থেকে এসে হাজির হলো। এসব যুবক মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে 'ক্রাশ প্রোগ্রামে' ট্রেনিং লাভ করে। প্রয়োজনের সময় ওদের পেয়ে খুব স্বস্তি অনুভব করলাম। সংবাদ বাহকের মাধ্যমে আমাদের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে আরো খুশি হলাম। তাতে লেখা ছিল:

"ব্যারাকপুরের চারলি সেক্টর থেকে এই দুশো মুক্তিযোদ্ধার জন্য শিগগিরই অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাবেন।' সংবাদটা দ্বিগুণ জোরে আমার কানে বাজতে লাগল। দুশো রাইফেল।

আচমকা গল্পের ইতি টানার জন্য আমি দুঃখিত। আসলে গত রাতের সেই শুভ সংবাদের আমেজে স্বপ্নের ঘোরে গল্পের শেষ পর্বটা খোঁজ করছিলাম। সংবাদটা পাওয়ার পরেই মোজাহিদ ক্যাপ্টেন মি. শাহজাহানকে ডেকে টাকির কাছাকাছি কোথাও একটা ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য স্থান নির্বাচন করতে বলল: নিরাপত্তার খাতিরে আমি চাইনি যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অদক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে টাকিপুর যুবকেন্দ্রে এক হয়ে

মিশে থাক। আমার দপ্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মি. খুরশীদকে নিয়ে জিপে চাপলাম। খুরশীদ তথাকথিত আগরতলা মামলার একজন আসামিও ছিল। ও সাধারণত লে. খুরশীদ নামেই পরিচিত এবং জীবনের মূল্যবান অংশটা পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে কাটিয়েছে। একথা সে আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিত। মি. খুরশীদ খুব সরল, সৎ ও দেশপ্রেমিক। মুখে সবসময় হাসি। এই ভদ্রলোকটি বন্ধুবান্ধবের জন্য যেকোনো সময় নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারত। এক মুখ দাড়ি। প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি। খুরশীদকে একজন পাক্কা গোয়েন্দার মতো লাগত। জন্ম থেকেই ও আশাবাদী। ভয়ানক দুঃসময়ে ওকে আমি হাসতে দেখেছি। এই ধরনের মানুষ আমার খুবই পছন্দনীয়। অন্যের তোষামোদ করে ফুল বাবু সাজা বা নির্জনে অনুশোচনায় দিন কাটানোর মতো লোক নয় সে। সবসময় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর-হাসিখুশি। তার সাহচর্য পেয়ে খুব আশ্বস্ত হলাম এবং তাকে নিয়ে আমাদের সর্বাধিনায়কের সাথে দেখা করার জন্য তার সদর দপ্তরে রওয়ানা হলাম। কি আর বলব-তিনি এমন একটা জায়গায় সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন, যার নাম নিরাপত্তার (!) খাতিরে প্রকাশ করা যায় না।

যা হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তার সাথে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করলাম। কারণ, তিনি স্বল্পভাষী। বেশি কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। কলকাতাতেই মি. খুরশীদ সুলতান আহমেদ নামে চটপটে এক ভদ্রলোককে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। তার মুখেও দাড়ি ছিল। আমার মনে হয়, মুক্তিসংগ্রামের সময় দাড়ি রাখাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার এটাই বোধহয় মাপকাঠি বিবেচিত হতো। কিন্তু সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে। যেমন আমাদের সর্বাধিনায়ক সাহেব। তার কোনো দাড়ি ছিল না। কিন্তু উপরের ঠোঁটটার উপর একটা জিনিস ছিল, যেটা তার চিরকৌমার্য ব্রতে ঘনিষ্ঠভাবে তার সাথে থাকত।

অল্প পরিচয়ে বুঝতে পারলাম, মি. সুতলান আহমেদ বেগের একজন প্রশিক্ষণ-গুরু। এই সংবাদে শুধু সাহসই পেলাম না, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কেননা, এতে করে আমার নতুন আখড়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

ছেলেদের আরো উন্নত প্রণালিতে শিক্ষা দেয়ার সুযোগ এসে গেল। আর এজন্য মি. সুলতানের তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য বেগকে নির্দেশও দিলাম।

সাথিরা আমার,

এই সমস্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষলোক সৌভাগ্যবশত সবাই চিরকুমার। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের চাইতে এরা বরং দুঃসাহসী। আশা করি বিবাহিত সাথিরা এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। কেননা, তাদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাদের অর্ধাঙ্গিনীরাই ভালো জানেন। সুলতান ও খুরশীদকে সঙ্গে করে কর্মচঞ্চল কলকাতার রাস্তা দিয়ে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটলাম। চার্লি সেক্টর খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগে গেল। কেননা, এটা একটা নতুন সংস্থা। আমারও মেজর উসমানের সেক্টর থেকে আক্রমণ পরিচালনা সমন্বয় সাধনের জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এই সংস্থা স্থাপন করেছে। এই চার্লি সেক্টরের খুঁটিনাটি ও মুক্তিসংগ্রামে এর কি অবদান তা পুরাপুরি লিখতে গেলে একটা বড় বই হয়ে যাবে। কাজেই ইচ্ছে করে এ ব্যাপারে আপাতত বিরত রইলাম। পরে সুযোগ পেলে সবিস্তারে লেখার আশা রাখি। সংক্ষেপে চার্লি সেক্টরের পরিচয় হলো-এরা অধিনায়ক একজন ব্রিগেডিয়ার, তার অধীনে দু'জন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন এবং কয়েকজন কেরানি। ব্রিগেডিয়ার জানালেন যে, ভবিষ্যৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্যের জন্য তিনিই দায়ী। সবসময় তার ও স্টাফের সক্রিয় সহযোগিতা পাব বলে আশ্বাস দিলেন। দুর্যোগময় চারটি মাসের ব্যথা, বেদনা, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মাঝে এই প্রথমবারের মতো সক্রিয় আশ্বাসের বাণী শুনলাম। এই প্রতিশ্রুতি আমাকে ভরসা দিল, সাহস যোগাল। আমার ক্লান্ত মন ও দেহটা মুহূর্তে আবার সতেজ হয়ে উঠল নতুন আশার আলোয়।

এই আশ্বাস বাণী শুনে একই সঙ্গে নতুনভাবে উল্লসিত হলাম, আবার ব্যথার দংশনও অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম। যেমন একটি ছোট্ট শিশু কোনো ভয়ংকর স্বপ্নের ভেতর দেখতে পেল তার প্রিয় 'পুষি'টা একটা দৈত্য তার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে তারই সামনে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে। কিন্তু হঠাৎ জেগে উঠে দেখতে পেল যে, তার প্রিয় পুষিটা তারই পাশে শুয়ে আছে এবং মিউ মিউ করে ডাকছে। পুষিকে

হারাবার সেসব করুণ দৃশ্য সবই মিথ্যা-একটা সাময়িক দুঃস্বপ্ন মাত্র। একদিকে প্রিয়জনকে হারাবার ব্যথা, অন্যদিকে তাকে পুনর্বার ফিরে পাবার উল্লাস!

মুক্তিসংগ্রামের এই ক্রান্তিলগ্নে অনিশ্চয়তার নিকষ কালো ঝড়ের দাপটে যখন সামান্য আশার আলোও ক্ষতবিক্ষত তখন যেকোনো প্রতিশ্রুতি শুধু অর্থবহই নয়, চিরন্তন গভীরতার মাধুর্যে ভাস্বর। কারণ, আপনারা জানেন, গভীর অন্ধকারের ভেতর সামান্য একটা দিশলাইয়ের কাঠিও মুক্তির ইশারা দেয়।

আমার ঝিমিয়ে পড়া মনটাকে আবার আশা-আনন্দের নতুন উদ্দীপনায় সজীব করে আরো কঠিনভাবে শত্রুপক্ষের ওপর আঘাত হানার জন্য ফিরে এলাম আমার সদর দপ্তর হাসনাবাদে।

এক এক দলে ছ'জন করে মোট ষাট জন মুক্তিযোদ্ধাকে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলনা পাঠিয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য, শহরের ভেতরে ও চতুর্দিকে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা। মুক্তিযোদ্ধাদের বলে দিলাম, প্রাথমিক কাজ সমাধা করার পর, যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে-তাদেরকে আমার ঘাঁটিতে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। যাতে করে ওরা চেনা গোপন পথ ধরে পর পর গেরিলা দলকে বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যেতে পারে।

এই গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো-বিকল্প গোপন পথ খুঁজে বের করা।

দ্বিতীয়ত, নির্ভরযোগ্য স্থানীয় লোকদের সহায়তায় শহরের ভেতরে ও তার চতুর্দিকে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করা। তৃতীয়ত, পথ প্রদর্শকদের ফেরত পাঠিয়ে খবরাখবর আদান-প্রদান করা। তখনকার দিনে এই কাজগুলো সমাধা করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। কেননা, পাকিস্তানি পশুগুলোর হিংস্র থাবা গ্রামবাংলার সব জায়গায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে। তবু অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। ওদের ভেতর কোনো রকম অনিচ্ছা বা বিষাদের ভাব খুঁজে পেলাম না। এমনকি ওদের তীব্র চোখেমুখে দেখতে পেলাম চরম উত্তেজনা ও প্রতিহিংসার দুর্বার আগুন। ওদের এই আত্মবিশ্বাসের দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত খুলনার অধিবাসী, দ্বিতীয়ত পাকিস্তানি হানাদাররা নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠলেও

ভেতরের জনসাধারণের আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা ছিল। গেরিলাদের কাছে ছিল স্টেনগান, গ্রেনেড ও চাকু। ওদের নিরাপত্তা ও পথে যদি ওরা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা শত্রুর সামনে পড়ে, তাহলে ওদের মোকাবিলা করার জন্য কিছু হালকা ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্যও সাথে দিয়ে দিলাম। প্রাণঢালা আশীর্বাদ করে আগের নির্দেশানুযায়ী ওদের বিভিন্ন রাস্তায় পাঠিয়ে দিলাম। সময়টা ছিল ১৪ জুলাইয়ের রাত্রি। কল্পনার রশিটা ছেড়ে দিয়ে দেখতে পেলাম মনের দিগন্তে আমার আক্রমণের দ্বিতীয় পর্বটা উড়ন্ত ঘুড়ির মতো মেতে উঠেছে, হাস্যোজ্জ্বল খেলায়। শত্রুপক্ষের সামরিক যন্ত্রটাকে স্তব্ধ করার জন্য শিল্প এলাকায় আমার দ্বিতীয় পর্বের আক্রমণ শুরু হলো। শিল্প এলাকাগুলোর কার্যক্ষমতা অচল করে দিতে পারলে সামরিক যন্ত্রটাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো হানাদারদের অর্থে অনটন ঘটবে। এই কাজটা খুবই মর্মান্তিক। কেউই চায় না তার নিজের দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিসাধন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কেননা, আমাদের সামগ্রিক সাফল্য অর্জনের জন্য এ কাজটা ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করবে। এবং সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ধারাও পঙ্গু করে দেবে। ইতোমধ্যে। ক্যাপ্টেন হুদাও তার ঘাঁটি থেকে আক্রমণের গতি বেশ সন্তোষজনকভাবে বাড়িয়ে দিল। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ৩৫ জনের ছোট্ট বাহিনীটি বাড়তে বাড়তে ৩৫০ জনে এসে দাঁড়াল। শত্রুপক্ষের ওপর রীতিমত আক্রমণ চালিয়ে তারা বেশকিছুটা সাফল্য অর্জন করল। বেগের অক্লান্ত সহযোগিতায় হুদা পাক-বাহিনীর তিনটি সীমান্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। এর ভেতর ছিল দক্ষিণে উকসা, বসন্তপুরের উত্তরে দেবহাটা ও খানজী সীমান্ত ফাঁড়ি। মাইন, ডিনামাইট ও গ্রেনেড বিস্ফোরণে ওই ফাঁড়িগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের জন্য শুধু অবশিষ্ট ছিল কতকগুলো ধ্বংসস্তূপ উকসা অঞ্চলে পাকিস্তানি সৈন্যরা পাহারায় বেরুলে মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে ওদের কাবু করেছিল- সে সম্বন্ধে হুদা আমাকে একটি চমকপ্রদ কাহিনি শুনাল। ওঁৎপেতে পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর আঘাত হানার জন্য জুলাই মাসের ২৮ তারিখ রাত্রে ক্যাপ্টেন হুদা ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে ইছামতী পার হলো। পাকিস্তানি সৈন্যরা উকসা ঘাঁটিতে খুব ভোরে পাহারায় বেরুতো। হুদা ও তার সাথের লোকেরা একটা খুঁটির সাথে

জয়বাংলা পতাকা লটকিয়ে তার চারদিকে 'এলটিপারসনাল' মাইন পুঁতে রেখে নিকটবর্তী একটা ধান ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে ওরা ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনতে পেল। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখনো গাছের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু আবছা অন্ধকার। হুদা ও তার সাথের লোকজন জল-ভর্তি ধান ক্ষেতের মধ্যে চুপচাপ প্রস্তুত হয়ে রইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হানাদাররা এদিকে আসল না। উড়ন্ত জয় বাংলা পতাকাটা চোখে পড়তেই মাথা ভারী কুত্তার দল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং ওটাকে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলার জন্য বিশ্রি ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে ছুটে আসল। আর যায় কোথায়? সমস্ত পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হাতির মতো পাকিস্তানি দৈত্যগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। এবং হুদা তার লোকজন ও শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে এলো। একটা গুলিও খরচ না করে এতবড় একটা বিরাট সাফল্য অর্জন করায় হুদা বিজয়ের হাসি হাসতে লাগল।

বেগও অপর একটা লোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনাল। একদিন সে মাত্র দশজন লোক নিয়ে বসন্তপুরের দক্ষিণে যমুনা নদীর তীরে কালিগঞ্জ আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল। বেশকিছুক্ষণ একটা দেয়ালের পিছনে ওরা লুকিয়ে রইল। কিন্তু রাতটা ভয়ানক অন্ধকার থাকায় শত্রুবাহিনীর বাংকারের কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল না করে ফেরার মতো লোক বেগ নয়। কাজেই সে তার পুরানো কৌশল অবলম্বন করল। ঠিক অবিকল শিশুর মতো কাঁদতে পারত বেগ। কাজেই দেরি না করে ভয়ানক কান্না জুড়ে দিল। কিন্তু সদা সতর্ক। হঠাৎ দেখতে পেল মানুষের দুটো প্রতিমূর্তি দরজা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। মনে হলো, শিশুর কান্না শুনে ওরা খানিকটা বিচলিত হয়েছে। অবশ্য বিচলিত হবার কারণ, মানবতার তাগিদে মানুষের দুঃখমোচন নয়-বিচলিত হওয়ার একমাত্র কারণ-ওরা কামুক ও নারীলোভী।হয়তো এই প্রবাদ বাক্যটির ওপর ওদের খুব আস্থা ছিল-যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন।' হ্যাঁ, আগুন এখানে ছিল। কিন্তু যে আগুন তারা চেয়েছিল এটা তা নয়। এটা বেগের স্বয়ংক্রিয় স্টেনগানের আগুন। দুটো হানাদারই ঘটনাস্থলে খতম হলো। বেগ তাড়াতাড়ি দেয়ালের ওপারে কিছু গ্রেনেড ছুড়ে দিয়ে ওদের অস্ত্রগুলো নিয়ে অন্ধকারের ভেতর সরে পড়ল। আর

ওদিকে হানাদার বাহিনীর মেশিনগানগুলো মানুষের গন্ধ না পেয়েও কুকুরের মতো খামাখা গর্জন করতে লাগল। বস্তুতপক্ষে এমন একটা সময় এলো যখন পাক হানাদাররা এত ভীত ও ছোট ছেলেরা ওদের অবস্থানের চারদিকে পটকা ফুটালেও ওরা ভয়ে মর্টার ও মেশিনগানের গুলি ছুড়ত। সুতরাং হানাদারদের ওপর আক্রমণ করাটা একটা ছেলে-খেলে হয়ে দাঁড়াল। মুক্তিযোদ্ধারা আর ওদের ভয় করত না।

আমার মনে পড়ে, 'ভট্টাচার্য' নামে দশ বছরের একটি ছেলে বেগের বিশেষ 'বাহিনীতে' যোগ দেয়। এই বিশেষ বাহিনীটির নাম 'হার্ড করপস অব সার্জেন্টস্'।-এর বিশেষত্ব ছিল বারো বছরের ঊর্ধ্বে কোনো বালককে এ বাহিনীতে নেয়া হতো না। নতুন এসেও ভট্টাচার্য কঠিন পরিশ্রমের বলে সার্জেন্ট মেজরের পদে উন্নীত হলো। কেনইবা হবে না? সে নিজে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। উপরন্তু পারুলিয়া ব্রিজের খুঁটিনাটি-সব মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহের জন্য তার ক্ষুদে বাহিনীকে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করেছে। পারুলিয়া ব্রিজটা লম্বায় প্রায় ১৫০ ফুট। এই ব্রিজের ওপর দিয়েই হানাদাররা তাদের রসদ সম্ভার, অস্ত্রশস্ত্র কালিগঞ্জ ও বসন্তপুরে নিয়ে যেত। ব্রিজটার ওপর হামলা চালানোর দিন ভট্টাচার্য রাতের অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ব্রিজের এক প্রান্তে পাহারারত-সান্ত্রীদের কয়েক গজের মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আর এদিকে বেগ ব্রিজের নিচে বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে দিল। সংকেত দিতেই এই দশ বছরের সার্জেন্ট মেজরটি ঝোপের আড়াল থেকে শত্রুর দিকে গ্রেনেড ছুড়ে মারল। কোনো দিক থেকে গ্রেনেড ছুড়েছে টের পাবার আগেই সান্ত্রীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর সার্জেন্ট মেজরটি তার ছোট কনুইয়ের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বেগের সাথে এসে মিলিত হলো এবং নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল কখন বিস্ফোরণের ভয়ানক গর্জনটা কানে ভেসে আসবে। দীর্ঘমেয়াদি বিস্ফোরক দ্রব্য বুকে নিয়ে ব্রিজটা অসম্ভব রকমের নীরব ও শান্ত। মগজহীন হানাদার সান্ত্রীরা ভারী বুট পায়ে ব্রিজের ওপর প্রান্তে পায়চারি করছিল। বেগ হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো। সময় আসন্ন। উহ্! কী ভয়ানক উত্তেজনা। প্রচণ্ড শব্দ করে ব্রিজের বেশিরভাগ অংশ উড়ে গেল। আর পোশাক পরা পাকিস্তানি পশুগুলো চিরদিনের জন্য ভেসে গেল

স্রোতের জলে। আমাদের উপর্যুপরি সাফল্যে একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল উন্নত হলো, অন্যদিকে অনেকগুলো অসুবিধাও দেখা দিল। কেননা, মুক্তিযোদ্ধারা ঘন ঘন আক্রমণ করায় পাক হানাদাররা ক্ষেপে গিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনের ওপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করল। ওদের পরাজিত মনটাকে শান্ত করার জন্য গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে লাগল। ওদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে স্থানীয় লোকজন আমাদের ওপর কিছুটা বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল। এর ফলে আমাদের গেরিলা কৌশলও অনেকটা ব্যাহত হলো। বেসামরিক জনসাধারণ আমাদের শত্রু মনে করত না। কোনো অঞ্চল মুক্ত হলে সেখানে আমরা অবস্থান করি, এটা তারা মনে মনে সবসময় কামনা করত। কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য আমরা মুক্তাঞ্চলে থাকতাম না। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে কোনো জায়গা দখলে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ছেলেরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। তৃতীয়ত, লোকসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে ওরা আমাদের চাইতে অনেক উন্নত। খণ্ডযুদ্ধ চালাবার মতো শক্তি আমাদের ছিল না।

সুতরাং যে একমাত্র কৌশল আমাদের সামনে খোলা ছিল, সেটা হলো সেই পুরানো কায়দা 'আক্রমণ করো এবং পালিয়ে এসো'। এ কৌশল অবলম্বন করায় যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকের নিরীহ লোকদের জীবনে নেমে আসল অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু আমাদের কোনো বিকল্প পন্থাও ছিল না।

বেয়নেট ও গুলির মুখে নিরীহ বেসামরিক জনগণের অসহায়তার কথা মনে হলে অনেক সময় আমার অবাধ্য চোখ দুটো ছল ছল করে উঠত। বেঁচে থাকার এই দীর্ঘ অনিশ্চয়তা এদের কাছে কত মর্মান্তিক-কত বেদনাদায়ক। বেঁচে থাকার এই অদম্য ইচ্ছাটাকে যেকোনো সময়ে নিষ্ঠুর-অনিশ্চয়তা গ্রাস করে ফেলতে পারে। ওদের ব্যথা, ওদের বেদনা তীব্রভাবে অনুভব করতাম। আর মনে মনে কামনা করতাম-মানবতার এই দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই অবসান হোক। জুয়াড়ি যেমন তার শেষ ঘুটির ফলাফলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, আমরাও তেমনি নতুন সূর্য উঠার দুরন্ত আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগলাম কবে কত শীঘ্র এই অমানিশার শেষ হবে। কিন্তু একজন জুয়াড়ির মতো হারাবার ব্যথাকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। কেননা, বিজয় অর্জন করা ছাড়া

আমাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পাক খেতে খেতে মুক্তিসংগ্রাম গড়িয়ে ছ'মাসের কানায় এসে পৌঁছল। তবু পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদের স্বীকৃতি দেয়নি-বাস্তবিকপক্ষে কেউ এগিয়ে আসেনি এই নতুন জাতিকে স্বাগত জানাতে। ভারত শুধু পিছন দুয়ার খোলা রেখেছিল। বাঙালি একটা নতুন জাতি হিসাবে আজ প্রায় প্রতিষ্ঠিত। ভেতো বাঙালি আজ আর অলস নয়। পিছনে পড়েও নেই। তারা যেমন রক্ত দিতে শিখেছে, তেমনি প্রতিহিংসার রক্ত নিতেও শিখেছে। মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত এই অসম সাহসী বাঙালি জাতিকে স্বীকৃতি দেওয়া পৃথিবীর সব দেশেরই পবিত্র কর্তব্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যাকে ফুটবল খেলা দেখার মতো শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে। এর বেশি কিছু নয়। আগামীদিনের উত্তেজনা বুকে চেপে প্রতি রাতে আমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এর বাস্তবায়নেরও কোনো লক্ষণ দেখলাম না। সেই সঙ্গে এও জানতাম, আমাদের জয়ী হতেই হবে।

কিন্তু সাথিরা আমার,

ধৈর্যেরও একটি সীমা আছে। এদিকে আমরা জনগণের সহানুভূতি হারাচ্ছিলাম, অন্যদিকে শুনলাম, আমাদের লোকেরা রাজাকার হয়ে পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে। তাদের রাজাকার হবার অনেক কারণ থাকতে পারে।

প্রথমত, জন্মগত সুবিধাবাদীরা স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছে, কতক লোককে জোর করে নেয়া হয়েছে, আবার কতক গরিব লোক জীবিকা অর্জনের জন্য ওদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কেউ হয়তোবা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের দলে ভিড়েছে। দ্বিতীয়ত পশ্চিম পাকিস্তানি রেনজার্স, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোক পুলিশ ও কিছুসংখ্যক বিহারী মুসলমান নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে চিন্তিত করে তুলেছে, সেটা হলো স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের দীর্ঘসূত্রতা। তখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়ার কোনো লক্ষণই পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একদম নিষ্ক্রিয়।

চতুর্থত, জুলাইয়ের শেষপর্যন্ত আমরা মাত্র হালকা রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করেছি। তাও আবার প্রচুর পরিমাণে নয়। শেষমেষ প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী স্রোতের মতো ভেসে আসতে আরম্ভ করল। কোনো মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে এই করুণ দৃশ্য নির্বিকারভাবে চেয়ে দেখতে পারে না। এর ওপর কোনো কোনো তরফ থেকে শুনতে পেলাম, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সাথে একটা রাজনৈতিক আপস-মীমাংসার চেষ্টায় আছে। ভাগ্য ভালো, এরকম বিশ্রি পরিস্থিতিতে দ্বিধাসংশয় ও গুজবের ধূম্রজালে হারিয়ে যাইনি। আমি আমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এটা আমার পক্ষে একটা সান্ত্বনা। দীর্ঘ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও সাফল্যের অনিয়ম একটা কালো দৈত্যের মতো আমার মনটাকে তোলপাড় করে তুলল। বস্তুতপক্ষে অনিশ্চয়তার কালো রূপটাকে কে ভয় বা ঘৃণা না করে?

আসুন অনিশ্চয়তার বেড়াজাল ভেঙে যেখানে নিশ্চয়তা আছে, সেখানে এগিয়ে যাই। আমার সাথে আসুন, দেখুন উত্তর দিকের শঙ্গরা ফাঁড়িটা কীভাবে উড়ে গিয়েছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদারদের চরম ক্ষতিসাধন করেছে। শুনলাম, ওরা নাকি বেসামরিক জনগণের বাড়ি অধিকার করে সেখানে ঘাঁটি বানাচ্ছে। আমাকে আরো অনুসরণ করুন, দেখবেন, টাউন শ্রীপুর ফাঁড়িটা কীভাবে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বার বার পরাজিত হয়ে পাক সৈন্যরা ওদের অনেক বন্ধুবান্ধবকে চিরদিনের জন্য এখানে রেখে চলে গিয়েছে।

সারা এলাকাটা এখন মি. শাহজাহানের অধীনস্থ বাহিনীর আয়ত্তাধীন। এই অকুতোভয় বীর স্কুল শিক্ষক তার পবিত্র বিদ্যানিকেতন শত্রুমুক্ত করেছে। আরো নিচে আসুন, দেখুন, দেবহাটা ফাঁড়িটা পোড়া ইট আর ভাঙা দেয়ালে দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে কীভাবে শুয়ে আছে। আসুন তাড়াতাড়ি আসুন, কেননা, আমাদের অনেক দূরে। যেতে হবে। এক নজর দেখে নিন কীভাবে খানজী ফাঁড়িটা একা ধুঁকছে, যেন এখানে কেউ কোনো দিন ছিল না। কেন থাকবে না? এই তো সেদিনও জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমি অনেক পাকিস্তানি বর্বরকে এখানে দেখেছি।

আসুন, আর একটু নিচের দিকে যাই। সতর্ক থাকবেন কিন্তু। এটা কালিগঞ্জ- বসন্তপুর অঞ্চল। পাকিস্তানি সৈন্যদের সুদৃঢ় ঘাঁটি। অন্যসব ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে, ওরা এখানে জড় হয়ে শক্তিশালী বাংকার বানিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর ওরা কখনোবাইরে থাকতে পারত না। দিনের বেলা তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম সেরে সন্ধ্যার আগেই বাংকারে এসে ঢুকত আর বসে বসে সারা রাত প্রহর গুণতো। এটা অবশ্য ওদের জন্য খুবই বিজ্ঞজনোচিত কাজ। কেননা, প্রায়ই আমরা দেখাশোনা করতে যেতাম। কিন্তু আমাদের প্রেম করার কায়দাটা ছিল বড় অশালীন। অবশ্য এর কোনো উপায়ও ছিল না। কেননা, মর্টার এলএমজির স্বর-মাধুর্য আমাদের আগেকার প্রেম করা রীতিটা ভুলিয়ে দিয়েছিল। যা হোক, আসুন আমরা তাড়াতাড়ি শ্যামনগরের দিকে যাই। শ্যামনগর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার বেশ বড় একটা থানা। অনেক বড় বড় জোতদার এখানে বাস করে। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপ্টেন হুদা যখন দু'শ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে এখানে হামলা চালায়, তখনই শ্যামনগর সম্বন্ধে জানতে পারি। উসক্ ফাঁড়ির অনেক দক্ষিণে শ্যামনগর।

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কিছু লোকজন হিঙ্গলগঞ্জে রেখে ক্যাপ্টেন হুদা। ইতোমধ্যেই তার দপ্তর উসক্ নিয়ে এসেছে। উকসায় তাঁকে পর্বত প্রমাণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা, নদীর তীর বরাবর উঁচু বাঁধ ছাড়া আর কোনো জায়গা ছিল না, যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসতে বেশিরভাগ সময় আধ পেটা খেয়ে দিন কাটাত। কেননা, রান্নাবান্না করার অনেক অসুবিধাও ছিল। যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে হুদা ওদের মনোবল বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভাবতে অবাক লাগে, মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার চাইতে যুদ্ধের দিকে আসক্তি ছিল বেশি। শত্রুর ওপর হামলা করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদা ও সহ-অধিনায়ক বেগ দু'শ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একদিন রাতে শ্যামনগরের দিকে অগ্রসর হলো। সময়টা এমনভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল যে, রাতে রওয়ানা হয়ে ভোর হওয়ার কিছু আগেই শ্যামনগর পৌঁছে যায়। যাতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এই দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়া খুব আরামদায়ক ছিল না। নিচে পায়ে কাঁটার আঘাত, উপরে ঠান্ডা বাতাস আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওরা অন্ধকারের ভেতরে এগিয়ে চলল শ্যামনগরের দিকে পথের সাময়িক বাধাকে ওরা ভ্রুক্ষেপই করল না।

কেননা ওদের অন্তরে ছিল বাংলার সোনালি ভবিষ্যৎ। আর শত্রুপক্ষের হিংসার চরম আগুন। সারাদিন তীব্র সংঘর্ষের পর, সন্ধ্যা নামতেই শত্রুপক্ষের কামান, মর্টার, মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেল এবং হানাদাররা চরম পরাজয় বরণ করল। যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু পিছনে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশ জনের একটা দল বেতার যন্ত্র ও ভারি অস্ত্রপাতি নিয়ে অবস্থান করছিল। ওদের মর্টার ও কামানের গুলি শ্যামল শস্যক্ষেত পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিল। কিন্তু আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারল না। শত্রুপক্ষের লোকজন পালিয়ে যাবার সময় পথে গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকা আমাদের ছেলেরা অতর্কিতে ওদের ওপর হামলা চালিয়ে খতম করে দেয়।

শ্যামনগর থেকে পালাবার দুটো মাত্র পথ খোলা ছিল। একটা ভেটখালির দিকে, অন্যটা বসন্তপুরের দিকে। এ দুটো রাস্তাতেই হাবিলদার সোবহান ও মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকতের অধীনে আমাদের ছেলেরা ওঁৎপেতে বসে ছিল। লিয়াকত দুর্দান্ত সাহসী। নভেম্বর মাসের কোনো একসময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার পদের প্রশিক্ষণের জন্য সে চলে যায়। শ্যামনগরের উপরে এ আক্রমণ আমার সেক্টরে একটা বিরাট বিজয়। এ বিজয়ে জনসাধারণেরও মনোবল অনেকাংশে বেড়ে গেল। শত্রুপক্ষের ক্ষতির তুলনায় আমাদের তেমন বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ওদের অনেক লোকজন মারা যায়। আমাদের চারটি ছেলের মধ্যে মারাত্মকভাবে দু'জন জখম হয়। আর দু'জন সামান্য আঘাত পায়।

শ্যামনগর মুক্ত হওয়ায় জনগণের চক্ষু খুলে গেল। ওরা এই প্রথমবারের মতো মুক্তিবাহিনীর শক্তির পরিচয় পেল। হুদার কাছে খবর পাঠালাম, যেভাবেই হোক একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শ্যামনগরকে আমাদের দখলে রাখতেই হবে। কেননা, আমার ইচ্ছা দখলকৃত রাস্তা ধরে খুলনা, মংলা ও চালনা পোর্টে মুক্তিবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানাব। আমার নির্দেশমত হুদা বেগের ওপর শ্যামনগরের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কালিগঞ্জ-বসন্তপুর অঞ্চলে শত্রুপক্ষের ওপর হামলা জোরদার করার জন্য সে নিজেই হিঙ্গলগঞ্জে ছুটে এলো।

পদাতিক বাহিনীর দ্বারা সাহায্যপুষ্ট শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য এই অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। ওরা নদীপথে ইছামতী দিয়ে যাতায়াত করতে পারত না। কিন্তু ওদের গানবোটগুলো কালিগঞ্জ বরাবর যমুনা নদী দিয়ে

দক্ষিণে পাইকগাছা পর্যন্ত পাহারা দিত। যাতায়াত ও সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার এটাই প্রধান রাস্তা। শত্রুদের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য উত্তর-পূর্বদিকে যমুনার তীর বরাবর গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে একটা পরিকল্পনা তৈরি করে দিলাম। যখন খবর পাওয়া গেল যে, পাকিস্তানি গানবোটগুলো যমুনায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা দল রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ এসে ঘাঁটি গাড়ল। এ দূরপাল্লার রাইফেল দিয়ে গানবোটগুলোকে সহজেই আঘাত করা যায়। আমার মনে পড়ে, এ বাহিনীর রাজপুত রেজিমেন্টের একটি অংশ ছিল।

সেন বর্মা নামে একজন অল্পবয়স্ক লেফট্যানেন্ট এই বাহিনীর অধিনায়ক। ভারতের প্রধান নির্বাচনি কমিশনার মি. সেন বর্মার পুত্র। পূর্বে বরিশাল জেলার অধিবাসী ছিলেন। দেশ বিভাগের আগেই পশ্চিম বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে চলে আসেন। বাংলার এ দুর্দিনে এত সব দুরূহ সমস্যা সমাধানে সে যে শক্তিমত্তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিল, তা থেকেই বোঝা যায় পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। এই সময় ভারতীয় সৈন্যরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত না। প্রয়োজনবোধে মুক্তিযোদ্ধারা কোনো সাহায্য চাইলে, ভারতীয় সৈন্যরা পিছন থেকে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ করত। কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত যুবক এই সেন বর্মাকে বাধা দেবে কে? ও ক্যাপ্টেন হুদার সাথে ইছামতী পার হয়ে হানাদারদের উপর ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়ে আবার এপারে ফিরে আসত।

জন্মভূমিকে মানুষ কি করে ভুলতে পারে? ক্যাপ্টেন হুদা লে. সেন বর্মাকে সহযোগী হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি হলো। উভয়ই পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বাংলার এই বর্তমান দুরবস্থায় সমানভাবেই ব্যথিত। কিন্তু ভবিষ্যতের ওই রক্ত-রাঙা সূর্যটা দেখে মনে ওদের আনন্দের জোয়ার এলো। আক্রমণ পরিচালনায় হুদার যোগ্যতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে নিয়ে শমসের নগরের যুদ্ধ পরিচালনা ঘাঁটি স্থাপন করার পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। সলিমুল্লাহ শক্তিশালী ও সাহসী। তখনকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাকেই উপযুক্ত মনে করলাম।

ওকে আমি স্কুলজীবন থেকে জানি। ভয়ানক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হাসনাবাদে আমার যে লঞ্চটি ছিল-তাতে করে ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে সলিমুল্লাহর অধীনে শমসের নগর পাঠিয়ে দিলাম। আমি পূর্বেই বলেছিলাম, শমসের নগর অনেক দূরে রায়মঙ্গল নদীর তীরে অবস্থিত। এই জায়গাটায় অনেক রকমের অসুবিধা ছিল। কিন্তু আমার সার্বিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য স্থানটার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রথমত, আমি চাচ্ছিলাম, সমগ্র সুন্দর বনাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য একটা নিরাপদ রাস্তা। দ্বিতীয়ত, আমি ভাবছিলাম, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটা আক্রমণকারী দল। পাঠিয়ে বরিশাল, পটুয়াখালি ও গোপালগঞ্জে যেসব বিক্ষিপ্ত মুক্তিবাহিনী শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের সাথে একটা সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপন করা। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তাঁবু রেশন ও পোশাক না থাকা সত্ত্বেও সলিমুল্লাহ হৃষ্টচিত্তে শুধুমাত্র সাহসের ওপর ভর করে, আগস্ট মাসের শেষ দিকে শমসের নগরে ঘাঁটি স্থাপন করতে উঠেপড়ে লেগে গেল।

সলিমুল্লাহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু যে অস্ত্র তার কাছে ছিল, তা ওই কাজের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। কতকগুলো অবশ্যম্ভাবী কারণের জন্য সেগুলো সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কোনো কিছুর অভাবের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকা ওর ধাতে সইতো না। আসল কাজ যুদ্ধের জন্য সে পুরাপুরি তৈরি হলো। বিমান বাহিনীতে থাকাকালীন সেই চিরাচরিত উচ্চারণ ধ্বনি। প্রয়োগ করে সে বলল, 'স্যার, আমি যুদ্ধ চাই।' দীর্ঘ বিমান বাহিনীতে থাকা সত্ত্বেও সলিমুল্লাহ উচ্চারণ রীতিটা পালটাতে পারেনি। যাহোক, বর্ষা ঋতুতেই সে। ঘাঁটি বানাবার মনস্থ করল। শমসের নগরে ভারতীয় সীমান্তবর্তী ফাঁড়ির আধ মাইল দক্ষিণে নদীর তীরে বাঁশ দিয়ে একটা ঘাঁটির মতো তৈরি করা হলো। এর চতুর্দিকে কাদাপানি। ওকে যে কাজের ভার দিয়েছিলাম, তার সমাধা করার জন্য এ জায়গাটা নির্বাচন খুবই উপযোগী হয়েছিল। এই বর্ষা ঋতুটার জন্যই ঘটিটার চারদিকে জল-কাদা। আসলে সলিমুল্লাহ সাহেব একজন কেতাদুরস্ত লোক। বর্ষা ও কাদামাটির ভেতর

যখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, তখন ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে খুবই খুশি মনে হতো।

বিশেষভাবে তাগিদ দেয়ার ওর ছেলেদের জন্য বর্ষাতি পাঠিয়ে দিলাম। সপ্তাহশেষে প্রয়োজনীয় রেশনপত্রও পাঠিয়ে দিতাম। সলিমুল্লাহর তেমন আর কোনো অভিযোগ ছিল না। শুধু প্রধান লঞ্চচালক মোশাররফ মিয়া মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্রের একটা বড় তালিকা নিয়ে হাজির হতো।

মনে পড়ছে, একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে ভারি অস্ত্রপাতি যেমন–মেশিনগান, রকেট লাঞ্চার, রিকয়েললেস রাইফেল ইত্যাদি পাওয়া মাত্রই ওদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অস্ত্রপাতি কী করে জোগাড় করা যায়, সে সম্বন্ধে ওর চাইতে আমি কম চিন্তান্বিত ছিলাম না। কিন্তু যখনই কোনো লোক শমসের নগর থেকে আমার দপ্তরে আসত, তখনই সলিমুল্লাহ সাহেব অস্ত্রশস্ত্রের বড় একটা তালিকা আমার কাছে পাঠিয়ে দিত। ওর নিজস্ব নামকরণ করা কতকগুলো অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেখে আমার খুব হাসি পেত। কেননা, এ রকম অদ্ভুত অস্ত্রপাতির কথা ওর পক্ষে সৌখিন কল্পনাই মাত্র। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর উন্নত দেশের কারখানায়ও এ রকম অস্ত্রপাতি তৈরি হয়নি। ওর এরকম প্রবল ইচ্ছাটার প্রতি আমার একটা প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'আলাদীনের প্রদীপের অভাবে ওর সেই ইচ্ছাটা আমি পূরণ করতে পারিনি। তা নইলে এটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

মোটের ওপর সে কী চেয়েছিল? সে চেয়েছিল দূরপাল্লার কিছু রকেট লাঞ্চার, কিছু ভারি মেশিনগান ইত্যাদি। যেন তার বাঁশের খুঁটিতে বসে রায়মঙ্গলে পাকিস্তানি গানবোটগুলোর মোকাবিলা করতে পারে। আমি বুঝতে পারি, শত্রুপক্ষের গানবোটগুলোর দুর্ব্যবহারে ওর মনটা খুবই বিষিয়ে উঠেছিল। সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রের তাগিদটা ওর কাছ থেকে রীতিমতই আসতে লাগল। প্রতি সপ্তাহ শেষেই আশা। করতাম, ওর কাছ থেকে একটা তাগিদ আসবেই। ঠাট্টা করে অনেক সময় ওকে খবর পাঠাতাম যে, সময়মত তার চাহিদার তালিকা না দেয়ায় প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে পারিনি। কিন্তু তার পরেই অস্ত্রশস্ত্রের এক বিরাট তালিকা এসে হাজির হতো, এতে অবশ্য বোঝাতো না যে সে কাজের লোক নয়।।

শমসের নগরে যাবার কিছুদিন পরেই কৈখালিতে পাক বাহিনীর উপর উপর্যুপরি কয়েকবার হামলা চালিয়ে সীমান্তবর্তী ঘাঁটিটা অধিকার করি। এবং সরাসরি এ পারে সলিমুল্লাহ আর একটা ঘাঁটি স্থাপন করে।

ইতোমধ্যে সুন্দরবনের রাজা নওয়াবদীর সাথে তার পরিচয় হয়। সুন্দরবন এলাকায় এই নওয়াবদী রূপকথার সেই কালো দৈত্যটার মতো। বেশ বড় মুখমণ্ডল। সারামুখ ভর্তি দাড়ি। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। দেহগঠন অত্যন্ত সুদৃঢ়। সারা সুন্দরবন এলাকায় সে একটা ভয়ানক ত্রাস। তার একমাত্র ব্যবসা-চোরাচালানি। পূর্বের কুকীর্তি সত্ত্বেও যখন আমি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তার সাথে দেখা করলাম, তখন আমার কাছে সে অত্যন্ত লাজুক, ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ বলে মনে হলো। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, তারিখটা ৩ সেপ্টেম্বর। আমার সেক্টরের একটা লঞ্চে করে যাচ্ছিলাম। আমার অধীনস্থ লঞ্চগুলো শিগগীরই বাংলাদেশ নেভি নামে পরিচিত হলো। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমার নৌবাহিনীতে ছ'টা মটর লঞ্চ জোগাড় করা হয়। এগুলো শত্রুবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া। শুধুমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত রাখার চাইতে, আমি ভাবলাম, এগুলোকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে গানবোটের কায়দায় ব্যবহার করা ভালো। সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর কাছে আমি আমার পরিকল্পনার কথা জানাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন।

তারপর অধিনায়ক মুখার্জীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় বাহিনীকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার ছ'টি লঞ্চের জন্য ৫০টি ব্রাউনিং বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান নিয়ে এলাম। হালকা মেশিনগান ও ছোট ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য এক একটি লঞ্চে দশজন করে নাবিক মোতায়েন করলাম। আমার ভাগ্য ভালো যে, আমি সব নৌবাহিনীতে লোকজন পেয়ে গিয়েছিলাম। আগে তারা পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরিরত ছিল। বদরে আলম নামে একজন বেশ অভিজ্ঞ লোকের অধীনে নৌবাহিনীর এসব লোকজনদের একত্র করলাম। যুদ্ধের সময় বদরে আলমকে সম্মানসূচক লেফট্যানেন্ট পদে ভূষিত করা হয়।

লে. খুরশীদ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। সে এই নৌবাহিনী গড়তে আমাকে সাহায্য করেছে। এসব লোকদের জোগাড় করার জন্য সে এক সেক্টর থেকে আর এক সেক্টরে অক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। ছেলের মনের

মতো কাজ পাওয়ায় ওর উপর খুব কৃতজ্ঞ হলো। আমার এই সংস্থাটি পরে 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী' নামে পরিচিত হয়ে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই বাহিনীর উপর প্রথম কাজ দেয়া হলো, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রীতিমত সরবরাহ করা। দ্বিতীয়ত নদীতে আক্রমণাত্মক পাহারা দেয়। তৃতীয়ত নৌসংক্রান্ত কাজকর্ম সমাধা করা। নৌসংক্রান্ত কাজকর্ম বলতে বোঝায়- মুক্তিযোদ্ধাদের একটি নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে নামিয়ে নেয়া। তারপর কাজ সমাধা হলে আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

নৌবাহিনীর কাজটা আপাতত রেখে দিয়ে চলুন, সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ রাতে যার সাথে দেখা হয়েছিল, সুন্দরবনের রাজা' সেই নওয়াবদীর কাছে যাই। হাসনাবাদ থেকে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা লঞ্চে থাকার পর শমসের নগর পৌঁছলাম। তখন রাত গাঢ় অন্ধকার! মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এত অন্ধকার যে, দু'গজ সামনে পর্যন্ত দেখা যায়। চালকের পক্ষে লঞ্চ চালনা করা বেশি কষ্টকর হয়ে উঠল। সার্চলাইটের আলোতেও বেশিদূর দেখা যায় না। প্রমত্তা রায়মঙ্গল-এর উপর ভেসে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ তীর থেকে আমাদের উপর টর্চলাইটের আলো এসে পড়ল। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম যে, ওটা ভারতের সীমান্ত ফাঁড়ির আলো। এই ফাঁড়ির লোকেরা সলিমুল্লাহর আস্তানায় পৌছতে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করল। এই সময় বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেয়ে সলিমুল্লাহ আনন্দে আত্মহারা। ওখানকার সব ছেলেদের সাথে আমি দেখা করলাম। বৃষ্টির ঝাপটা এসে বাঁশের ঘরের মধ্যে ঢুকছিল। ছেলেদের এই দুরবস্থা দেখে আমার খুবই কষ্ট লাগল। ওরা অনেক রাত অনিদ্রায় এভাবে কাটিয়ে দিয়েছে। আমি জানতাম, নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর কোনো লোকজনও এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো এমন কষ্ট সহ্য করতে পারে না। যুদ্ধজয় নয়, সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ওরা সব দুঃখ, সব যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করেছে।

এই বর্ষার রাতেই সুন্দরবনের রাজা নওয়াবদীর সাথে আমার দেখা হয়। পাক-বর্বরদের নৃশংস অত্যাচারে টিকতে না পেরে, সুন্দরবনের হরিনগর গ্রামের তার পৈতৃক ভিটামাটির মায়া ত্যাগ করে ঝড়ের মধ্যেই পরিবারের সবাইকে তিনটি নৌকায় নিয়ে নওয়াবদী বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দরবনের রাজার চোখে জল! সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার জীবনে এমন দুঃখের দিন কখনো আসবে এবং পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে। হারিকেনের আবছা আলোতে দেখতে পেলাম, তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। চপলমতি ছোট্ট বালকের মতো হঠাৎ সেই শক্ত মানুষটা ডুকরে কেঁদে উঠল। সে আমাকে জানাল যে, মাত্র চারটা রাইফেল পেলে আজ রাত্রেই তার পরিবারের লোকজন নিয়ে সে গ্রামে ফিরে যাবে। তখুনি তাকে চারটা রাইফেল দিয়ে দিলাম। নিকষ কালো লোকটা প্রচণ্ড উল্লাসে সাদা দাঁতগুলো বের করে দুরন্ত বাতাসের সাথে দৈত্যের মতো অন্তর্হিত হলো। এর ফলে শিগগীরই সে সুন্দরবনের গভীরে আমাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রসারিত করতে নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করেছিল। মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তার যে এই অকুণ্ঠ নিষ্ঠা-আমি বলব, এটা কোনো রাজনৈতিক কার্যকরণের জন্য নয়, এটা তার নিজের নিরাপত্তার তাগিদে। দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের বেলায়ই একথা প্রযোজ্য। ভয় ও অনিশ্চয়তার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে বাঁচার তাগিদে তারা নিজেরাই অস্ত্র তুলে নিয়েছে। শতকরা পাঁচজন লোক মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলে আমার মনে হয়। আক্রমণের এক মাস পরেও যদি পাকিস্তানি সৈন্যরা জনসাধারণের উপর অত্যাচার বন্ধ করত তাহলে ইতিহাসের গতি হয়তো অন্যদিকে মোড় নিতে পারত।

এমন কতক মুক্তিযোদ্ধা আছে যাদের তাকিয়ে দেখারও সময় নেই, কে তাদের পিছনে এলো-কে এলো না। কোনো কাজ সমাধা করার জন্য এই দুর্জয় সেনানীরা ভয় বা দ্বিধাসংকোচে মুহূর্তের জন্যও ভেঙে পড়ত না। বেগের একটি যুদ্ধবাহিনী ছিল। তারা সবাই স্বেচ্ছাসেবী। বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় যেকোনো ঝুঁকি নিতে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকত। সংখ্যায় সব মিলিয়ে দুশো হবে। সবাই যুদ্ধ করার মতো উপযুক্ত। যা কল্পনা করেছিলাম-সেই প্রস্তুতি, সেই উৎকর্ষী। ওদের মাঝে দেখতে পেয়ে আমি সুন্দরবনের গভীরে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করার লোভ সামলাতে পারলাম না। সুন্দরবনটা দেখতে প্রায় ভিয়েতনামের 'হো, চি, মিন' সড়কের মতো। কোনো কারণে যুদ্ধ বিলম্বিত হলে, প্রাকৃতিক গুপ্তস্থানে ভরপুর এই সুন্দর বনাঞ্চল ছাড়া বাংলার আর কোনো জায়গা এতটা সুবিধাজনক। নয়। ব্যূহ রচনার কৌশলাদি ঠিকমত নিরূপণ করে এই

অঞ্চলে যদি ঘাঁটি স্থাপন করা যায় তাহলে মুক্তিযুদ্ধ যেকোনো ভাবে, যেকোনো সময়সীমা পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনা মনে রেখে কৈখালিতে সলিমুল্লাহর জায়গায় বেগকে বসিয়ে দেয়ায় আমি তাকে শ্যামনগর থেকে নিয়ে এলাম। কাজ শুরু করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বেগকে 'বুড়ি গোয়ালিনী হরিনগর ও মুন্সিগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপন করার দায়িত্ব দিলাম। ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে রাতের বেলায় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে দু'জন পাকিস্তানি সৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার খতম করে এক সপ্তাহে আগে এই 'বুড়ি গোয়ালিনী' অধিকার করা হয়। বুড়ি গোয়ালিনীতে বনবিভাগের অফিস ও একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার ছিল। দুঃসাহসিক কাজের জন্য সলিমুল্লাহকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়। এই বুড়িগোয়ালিনী অধিকার করা আমাদের পক্ষে একটা বিরাট সফলতা কেননা, এখান থেকেই পাক সৈন্যরা সুন্দরবনের ভেতরে ও অগ্রভাগে আমাদের চলাচলের উপর নজর রাখতে এবং খবর সংগ্রহ করত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ট্রান্সমিটারটাই আমার প্রথম যাত্রার উদ্দেশ্যটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল। সলিমুল্লাহর কাছ থেকে দায়িত্ব নেয়ার পর বেগ ও তার বাহিনী। শত্রুপক্ষের উপর হামলা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। গানবোটগুলোর ওপর আঘাত করার জন্য বেগ সবসময় ওৎপেতে প্রস্তুত হয়ে থাকত । বুড়ি গোয়ালিনী পতনের পর, পাক হানাদাররা মাঝে মাঝে আমাদের ঘাঁটির নিম্নাঞ্চলে গানবোট নিয়ে পাহারায় বেরুতো। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও উপর্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ চালিয়ে হরিনগর ও মুন্সিগঞ্জ থেকে হানাদার বাহিনী বিতাড়িত করে বেগ সেখানে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করল। এসব ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত হবার পর পাক হানাদাররা সহসা পাল্টা আক্রমণ করত না। কোনো কারণে তারা যেন নরম হয়ে গেল। আমরা কখনো আক্রমণ করলে, হানাদাররা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। রোধহয় ওদের ভয় ধরেছিল যে, আমরা ওদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছি। কেননা, একদিকে সুন্দরবনের উপরিভাগ থেকে বেগ ও তার দুঃসাহসী যোদ্ধারা শত্রুদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল। আর অন্যদিকে, দক্ষিণ শরণখোলা থেকে কঠিন আঘাত হানছিল ক্যাপ্টেন জিয়া। জিয়া অত্যন্ত সাহসী যুবক। একদিন টাকি সদর দপ্তরে বসে আছি। হঠাৎ বেগের কাছ থেকে তার পেলাম, ভোরে বিউটি

অব খুলনাকে ধরেছি। ওকে নিয়ে শিগগীরই আসছি।' সারাটা সকাল খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলাম, 'বিউটি'কে দেখার জন্য। কল্পনায় কতভাবে ওর কাছে যেতে চাইলাম, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। কেননা, 'বিউটি' সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। শেষপর্যন্ত অধৈর্য হয়ে আমি হাসনাবাদ খেয়াঘাট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, বেগ তার পাতলা মুখে এক ঝলক হাসি নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। সে চিৎকার করে বলল, "স্যার, এদিকে আসুন। সত্যিই খুব সুন্দর। আপনি দেখলে পাগল হয়ে যাবেন।" গলাটা পরিষ্কার করে নিলাম। উত্তেজনায় দম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তীর ধরে বেগের সাথে দৌড়াতে লাগলাম। কোনো কোনো সময় বেগকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাই। নদীর তীরে শরণার্থীর অসম্ভব ভিড়। কতক্ষণ পর বেগ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই যে স্যার বিউটি।'

অপূর্ব! অপূর্ব সুন্দর! বেশ শান্ত, প্রশান্ত। কিছু সময় পর্যন্ত চোখ ফেরাতে পারলাম। বেগের মুখে বিজয়ের হাসি। বিউটিকে আটকাতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করায় ওর বুকটা আনন্দে, গর্বে ফুলে উঠল। চোখ ছেড়ে দিয়ে সুন্দরীর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো করে নিরীক্ষণ করলাম। অনেকক্ষণ লোভাতুরের মতো চেয়ে থাকার পর ওর কাছে যাবার জন্য, ওর সান্নিধ্যে গিয়ে ওর যোগ্যতা যাচাই করার জন্য মনটা ভয়ানক উৎসুক ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। সত্যিই উত্তেজনাকর সেই মুহূর্তটার চরমলগ্ন এসে দেখা দিল।

কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলাম। কিন্তু 'সুন্দরী' কোনো সাড়া দিল না। অস্বীকার বা উপেক্ষাও করল না। হ্যাঁ, সাহসে করে শুধু সাহসে বুক বেঁধে আমি পা বাড়ালাম। 'বিউটি অব খুলনা অত্যন্ত মনোরম। আপনারা হয়তো ভাবছেন, খুলনার সুন্দরী পথভ্রষ্টা হয়ে এখানে এসেছে। কিন্তু তা নয়, পাক হানাদার ও রাজাকাররা ওকে জোর করে এই পথে নিয়ে আসে। সামরিক হামলার আগে আইয়ুব খার একান্ত দোসর ও একজন নামকরা মুসলিম লীগ পন্থি মি. হাসান এই 'বিউটি'র মালিক ছিল। যাই হোক না কেন, মালিকের চাইতে আমরা আপাতত খুলনার সুন্দরীকে নিয়েই ব্যস্ত।

ঢাকা ও খুলনার মধ্যে যাতায়াত করে এই সুন্দরী মালিককে অনেক পয়সা এনে দিয়েছে। একই সময়ে দুশো'জন যাত্রী ও মালামাল বুকে নিয়ে সুন্দরী চলাচল করত। সৌভাগ্যবশত সুন্দরীর স্বীদেহ রক্ত-মাংসে তৈরি নয়। লোহা ও কাঠ দিয়ে গড়া। 'বিউটি অব খুলনা রাজাকার ও পাক হানাদারদের নিয়ে কপোতাক্ষ নদী দিয়ে যাচ্ছিল। দেড় দিনের না খাওয়া ক্যাপ্টেন বেগ ও তার দুর্দমনীয় গেরিলা বাহিনী নদীর উভয় তীরে ওৎপেতে গানবোট ধরার আশায় গোপনে আস্তানা গেড়ে অপেক্ষা করছিল। দিন গড়িয়ে রাতের গুমোট অন্ধকার নেমে এলো।

পরের দিন ভোর বেলা নাস্তার সময় আশা-নিরাশার ধূম্রজাল কাটিয়ে বিউটি অব খুলনা আবির্ভূত হলো। দেখামাত্রই নদীর দুই তীর থেকে শূন্যে গুলি ছুড়তে লাগল বেগ ও তার বাহিনী। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পাক-হানাদাররা বলির পাঠার মতো নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আর ওদের অনুগত রাজাকাররা গেরিলাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রভুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাল। রাজাকারদের হাত-পা বেঁধে কেবিনের মধ্যে রেখে দিয়ে সুন্দরীকে মহা আরামে মুক্তাঞ্চলে নিয়ে এলো। এই ঘটনাটা ঘটেছিল গাবুরার নিকটে। এই গাবুরার নিকটেই একদিন পাক হানাদাররা ওৎপেতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আল্লাহকে অসংখ্য শোকরিয়া। বিউটি অব খুলনাকে দেখে আমার পুরানো ঘাটা অনেকাংশে শুকিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বিউটি, দুশো মণ চাউলও নিয়ে এসেছে। এই সংকটময় মুহূর্তে দুশো মণ চাউল! সাংঘাতিক ব্যাপার। বেগ ও তার বাহিনী বহুদিন যাবৎ মশা, জোঁক ও বন্য শূকরের সাথে পাশাপাশি একত্রে বাস করার ফলে ওদের ভেতর যেন একটা সহমর্মিতা ও সখ্যের ভাব গড়ে উঠেছিল। বন্য শূকর এই সংকেতের ছদ্মাবরণে বেগ তার সকল কাজকর্ম সমাধা করত। পাড়াপড়শীর শক্তিকে বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না করে মাঝে মধ্যে বেগ হরিণ-হরিণীকে অনুকম্পার সাথে কিছুটা মনঃকষ্ট দিত। এছাড়া ওদের সম্পর্ক ছিল মধুর। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সৌজন্যবোধ দেখে যখন বেগ সম্ভ্রমে মাথা নোয়াত, তখন বানর বেচারাগুলো হিংসায় জ্বলে উঠে কেউ মুখ ভ্যাংচাতো, কেউ ঘুসি দেখাতো, আরো কত কী কসরত। মৃদু হেসে সবাইকে বললাম, "কিছু

মনে করো না বেগ, ওরা। আমাদের পূর্বপুরুদের বংশধর কিনা!' সূক্ষ্ম কর্তব্যবোধ ও দৃঢ় সংকল্পের জন্য সবাইকে মোবারকবাদ জানালাম।

মাত্র সীমান্ত পরিধির ভেতর সীমাবদ্ধ এই যুদ্ধে আমি সুখী ছিলাম না। কেননা, সীমান্ত এলাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল জুড়ে আমাদের মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং পাকিস্তানের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সার্বিক বিজয় অর্জন করতে আমাদের বহু বছর লাগতে পারে। কারণ, ওরা বৃত্তাকারে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করছে। এবং যতই সময় যাচ্ছে, ওরা নিজেদের অবস্থান খুবই মজবুত করে নিচ্ছে। যদিও পাকিস্তানি হানাদাররা বৃত্তাকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তবু তারা মানসিক দিক দিয়ে একদম ভেঙে পড়েছিল। তৎসত্ত্বেও ওদের উপর বড় রকমের আঘাত হানার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধেও খুব বেশি পারদর্শী নয়। তাড়াতাড়িতে যেটুকু প্রশিক্ষণ পেয়েছিল, তাতে কোনো কোনো খণ্ডযুদ্ধে সবাইকে একত্রে জড় হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে দেখা গিয়েছে। এটা আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী। যখনই আমাদের বড় রকমের একটা বিপর্যয় এসেছে, তখনই দেখা গেছে যে, এটা ওদের একত্রে জড় হবার চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণতি। ডলার, পাউন্ডের মতো ইচ্ছেমাফিক ছেলেদের ছেড়ে দিতে পারিনি। অবশ্য মুক্তিসেনাদের সাহস যে দুর্বার ছিল-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন যুবক-নেতৃত্বের অভাব দুর্ভাগ্যজনকভাবে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। কাজেই আমাদের আক্রমণ ধারা প্রবলভাবে নানান বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল।

যাহোক, সময় সময় যুদ্ধ করে যতটা সফলতা আমরা অর্জন করেছি, তা থেকে আমি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, যুদ্ধ-কৌশল নয়, আক্রমণের গতিধারা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সফলতা আসবেই। এক কথায়, সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত করে শত্রুর উপর সবসময় আঘাত হানতেই হবে। কেননা, ওদের উপর চরম আঘাত হানার মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে-চরম বিদ্বেষ আর ঘৃণা।

এই রূপরেখাটা মনে রেখে বিশদভাবে পরিকল্পনা তৈরি করলাম যে, দেশের প্রতি আনাচে-কানাচে মুক্তিযোদ্ধাদের ছড়িয়ে দিতে হবে ও

আক্রমণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে-প্রতি থানায়। থানা থেকে গ্রামে। গ্রাম থেকে প্রতি ঘরে ঘরে যেন শত্রুরা পিছন ফিরেও দেখতে পায়'আজরাইল' ওদের সামনে। যে হারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আমার নতুন ক্যাম্প বাকুনদিয়াতে এসে জড় হচ্ছিল, তাতে ওদের জন্য যদি প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা যায়, তাহলে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ মোটেই কষ্টকর নয়। বাকুনদিয়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যস্ততম ও বৃহত্তম পাদপীঠ-যেখানে মুক্তিকামী মানুষের এই মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা প্রবল প্রাণোদ্যমে ভরপুর হয়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে উল্কার মতো ছুটে গিয়েছিল ঐ মানুষ থেকে বাঘ ও হিংস্র জন্তুর অবাধ লীলাক্ষেত্র সুন্দরবনের গভীর অভ্যন্তরে এবং বাংলার মাঠে-ঘাটে প্রতিটি গ্রাম ও গঞ্জে।

গেরিলা অভিযান

যশোর ক্যান্টনমেন্টের নির্জনতার মাঝে মনটাকে ছেড়ে দিলাম। আমার সেই গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যস্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। সুদৃঢ় বাকুনদিয়া ক্যাম্প, বিভিন্ন আক্রমণ ঘাঁটি এবং আমার ছোট্ট সদর দপ্তরটি পরিদর্শন করে বলাকা মনে আবার ফিরে এলো। এখন যেমন মনে হয়, গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তন করা ততটা সোজা ছিল না। যেমন পিতা তার ছেলে-মেয়েদের পকেটে টিফিনের পয়সা ও বই-পত্র হাতে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়, এটা তেমনি স্রেফ গেরিলাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ নয় বা তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়াও নয়, অথবা একই পথে বার বার স্কুলে যাওয়ার সৌখিনতাও নয়। গেরিলাদের পক্ষে কোথাও যাওয়া খুবই বিপদসংকুল। পথও দুর্গম- কণ্টকাকীর্ণ। ওদের ভেতরে পাঠাবার আগে সুচিন্তিত পরিকল্পনা দরকার। আরো দরকার উপযোগী আক্রমণ ঘাঁটি ঠিক করা, গোপন পথের সন্ধান নেয়া, আমাদের নিজস্ব সংবাদ বাহক ও পথ প্রদর্শক দ্বারা বিকল্প পথের ব্যবস্থা রাখা। আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপযুক্ত ঘাঁটি স্থাপন করা যেখানে প্রয়োজনের সময় গেরিলারা আত্মগোপন করতে পারে। ঠিক একইভাবে প্রয়োজন গেরিলাদের দল ও তার সুষ্ঠু অধিনায়ক নির্বাচন, আক্রমণের উদ্দেশ্য বিশদভাবে ওদের কাছে বুঝিয়ে বলা, কাজের গুরুত্ব অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করা, প্রস্তুতির শেষ

পর্যায়ে ভালো করে তদারক করা, সরকার ও বাংলাদেশের জন্য শপথ গ্রহণ, ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভে ও প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেয়া ইত্যাদি। প্রস্তুতির এখানেই শেষ নয়। কেননা এরপর তাদের যানবাহনে করে পৌছে দিতে হবে দূরবর্তী আক্রমণ ঘাঁটিতে। যানবাহনের সমস্যাটা খুবই তীব্র থাকায় বাস ও ট্রাক জোগাড়ের জন্য চারদিকে আমার লোক পাঠাতে হয়েছিল। ৯ নং সেক্টরে আমার অধীনে সর্বসাকুল্যে তিনখানা জীপ, একটি বাস ও একটি ট্রাক ছিল। এর ভেতর মেজর উসমানের কাছ থেকে নেয়া টয়োটা জীপটাও আছে।

আমি খুব ভাগ্যবান যে, গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় এই যানবাহনগুলো পেয়েছিলাম। গাড়ি ও ট্রাকগুলো বৃষ্টির মধ্যে অনেক সময় চলতে পারত না। এই গাড়িগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কেননা, মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে এই গাড়িগুলো বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়। তারপর থেকে এর কোনো রক্ষণাবেক্ষণই হয়নি। অবশ্য শেষের দিকে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক সময়ে ব্যারাকপুরের চার্লি সেক্টর পশ্চিম রণাঙ্গনের 'জয় বাংলা' গাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

এটা কাহিনির একটা দিক মাত্র। নৌকায় খালবিল দিয়ে গেরিলা পাঠানোর চেয়ে স্থলপথে পাঠানো অনেককটা কম সমস্যাসংকুল। স্থলপথে যারা যাবে, তাদের শুধু রেশনের টাকা দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু যারা জলপথে যাবে, তাদের জন্য চাই নৌকা পথঘাট ভালো চেনে এরকম উপযুক্ত মাঝি। এ সময় ওই রকম মাঝি জোগাড় করা খুবই দুষ্কর ছিল। পাকবাহিনী দখলীকৃত সন্ত্রাসের এলাকা থেকে যে একবার নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছে গেছে, তারা কেউই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আবার সেই সন্ত্রাসের রাজ্যে যেতে সাহস করে না। তাছাড়া এই বর্ষাঋতুতে নদীগুলো এমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যে, নৌকায় করে গেরিলা পাঠানো রীতিমত বিপজ্জনক। সদর দপ্তরে বসে এরকম একটা বিপজ্জনক খেলার পরিকল্পনা করতে অবশ্যি কেউ আমাকে বারণ করল না। তবু অধিনায়ক হিসেবে গেরিলাদের পথের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা আমার অবশ্য কর্তব্য ভাগ্য ভালো, এ ব্যাপারে 'আদম সন্তান' পাচার করে-এ রকম একজন চোরাচালানীর সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। সারা জীবন সুন্দরবনের খাল-বিল দিয়ে সে চোরাকারবার করেছে। সুতরাং মানচিত্রের চাইতেও সুন্দরবনের

গোপন পথঘাটের খবর তার কাছে সঠিকভাবে পাওয়া যেত। সে প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে এবং কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে পথ দেখিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বরিশাল, ভালো ও পটুয়াখালীতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে। প্রত্যেক যাত্রায়ই তার পুরানো অভ্যাসটার খবরাখবর আমার কানে এসে পৌঁছত। কিন্তু খুব সীমিত ধরনের।

তার নাম রইজুদ্দিন। এক সময়ের কোটিপতি। আজ তার সর্বস্ব পাক হানাদাররা কেড়ে নিয়েছে। বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি, পাতলা কালো এই রইজুদ্দিন ভয়ানক ধূর্ত ও চটপটে। একদিন সে গর্ব করে বলল, 'স্যার, হানাদারদের বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। কেননা, এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ ওদের চোখে ধূলো দিয়ে কাম করে আসছি, কিন্তু আমি খোদাকে বিশ্বাস করি। তিনি নারাজ হলে যেকোনো মুহূর্তে আমি ধরা পড়তে পারি।'

চোরাকারবারিরাও দেখছি ওদের প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর নাম মুখে নেয়, তার উপর বিশ্বাস রাখে।

যা হোক, একবার যদি নদীপথে গেরিলা পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে এর প্রস্তুতি নেয়া আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠবে। নৌকা, পাল ও দাঁড়ের জন্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, রান্নার বাসন-কোসন, কমপক্ষে দু'সপ্তাহের রেশন, তার উপর পথে সম্ভাব্য বিপদ কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এটা শুধু ব্যয়বহুল খেলাই নয়, রীতিমত বিপদে ফেলার মতো। যদিও কতক লোক তাড়াহুড়ার ভেতর দিয়ে এরকম একটা প্রস্তুতি নেয়ার জন্য নেমে পড়েছিল কিন্তু সব চিন্তা সব দায়িত্ব আমারই। মনে পড়েছে, পুরো ছ'ফুট লম্বা মোস্তফা নামে বরিশালের আইন কলেজের একটি ছাত্র এই গেরিলা বাহিনী গঠনের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে করতে কয়েকবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে কত যে বিনিদ্র রজনী আমাদের কাটাতে হয়েছে, তার পরিমাণ লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। যা হোক, সংক্ষেপে এ পদক্ষেপটাই গেরিলা যুদ্ধের প্রথম শুভ সূচনা।

আপনাদের হয়তো মনে আছে যে, জুলাই মাসে ৬০ জন লোকের একদল মুক্তিযোদ্ধা খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। আরও দল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার পথ প্রদর্শকদের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ফেরত পাঠিয়ে দেবার

কথা ছিল। কিন্তু ওরা মাত্র চারজন ফিরে এসে খবর দিল যে, রাজাকারদের জন্য খুলনায় থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগের পান্ডারা বাঙালিদের দিয়ে এ রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে। জুন মাস থেকেই রাজাকার বাহিনীতে লোক ভর্তি বেড়ে যায়। কেননা, ওই সময় বেশিরভাগ জোয়ান ছেলেরা প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসে! তখন থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটা থমথমে ভাব। এ সময়ে রাজাকারদের ঘৃণ্য সহযোগিতায় পাক-বর্বররা নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মাত্রা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। এর ওপর এ সময় বিহারী মুসলমানদের নিয়ে গঠিত আর একটা বাহিনী দেশব্যাপী অবাধ লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠল। এমনকি, ওদের প্রভুদের পশুপ্রবৃত্তিকে খুশি করার জন্য এ পা-চাটা কুকুরের দল নারীহরণ পর্যন্ত করতে এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধা করল না। এসব হৃদয়বিদারক খবর শুনে আমরা যে কিরূপ মর্মাহত হয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে প্রতিহিংসার অনির্বাণ শিখা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সারা জুলাই মাস ধরে পুরো বর্ষা। দপ্তরে দপ্তরে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, অধিনায়ক এখনই, এ মুহূর্তে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই যুদ্ধংদেহী চিৎকারে ফেটে পড়ল। এ বর্ষাকালেই শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে ফেলে বাংলার পবিত্র মাটিতে যুদ্ধ করার সাধ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে হবে। বর্ষাকাল শিগগিরই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাজেই এ সময়েই সামরিক জান্তার সাধের অট্টালিকা ভেঙে খান খান করে ফেলতে হবে।।

প্রতিহিংসায়, ক্ষোভে, দুঃখে নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ছিঁড়তে টেবিলের ওপর ঘুসি মারতে লাগল। কিন্তু কোনো উপায় না দেখে, ছেলেরা নিজেরা নিজের বস্তিতে ফিরে গেল। মুখে ওদের ক্রুরহাসি। এই বর্ষাকালেই আমাদের একটা কিছু করতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কিছু করা উচিত। সব ব্যাপারটা অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখলাম। কিন্তু আগস্ট মাসের আগপর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্তন আসবে বলে মনে হলো না।

অসমর্থিত সূত্র থেকে আমাদের বিজয়ের অতিরঞ্জিত খবর পেয়ে উত্তেজনা ও আনন্দে বুকের ছাতিটা গর্বে ফুলে উঠত। এছাড়া আর কিইবা করার

ছিল। মোটকথা, জুলাই আগস্ট-এ দু'মাস মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ উভয়ের কাছেই ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ। অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তেজনার মুখে রাজনীতিবিদের কার্যকলাপ পুরাপুরি ম্লান হয়ে গেল। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে, সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো-বৃত্তাকার যুদ্ধে শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে বেশি সংখ্যায় দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে রাজাকার ও অন্যান্য গজিয়ে ওঠা সাহায্যকারী সংগঠনগুলোর প্রসার এখনই স্তব্ধ করে দেয়া।

পাকহানাদাররা আমাদের তরফ থেকে কোনো বাধা না পেয়ে যদি অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দেয়, তাহলে জনগণের সহানুভূতি থেকে আমরা পুরাপুরি বঞ্চিত হব। আমাদের সর্বাধিনায়ক যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তাতেও এই গেরিলাবাহিনী প্রবর্তনের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছিল। তাই আমিও গেরিলা বাহিনী প্রবর্তনের জন্য একটা বিপদে পরিকল্পনা তৈরি করলাম। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী এ চারটি জেলাকে ১৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। আগের কার্যক্রম অনুযায়ী এক একটি অঞ্চলে দু' থেকে তিনটি থানা থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আগে হতেই যেসব গেরিলা ঘাঁটি ছিল-তা সর্বমোট প্রায় ৮৩টি। প্রতিটি জেলা, প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি থানার দায়িত্ব যথাক্রমে একজন সামরিক অফিসার, একজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, অথবা অভিজ্ঞ নন-কমিশন্ড অফিসার এবং বাছাই করা একজন ছাত্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে। সকল পর্যায়ে এদের সাথে থাকবে একজন করে সহ-অধিনায়ক।

আরো স্থির করলাম যে, উপরের সংখ্যানুযায়ী একই অনুপাতে রাজনৈতিক নেতারাও তাদের সহকারীদের নিয়ে এ সমস্ত ঘাঁটিতে থাকবেন। যেন গেরিলারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় কার্যকরীভাবে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা, আমি জানি যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।

রাজনৈতিক শক্তি এসে যোগ না দিলে যেকোনো রকম সামরিক সফলতা, ঐক্যবদ্ধ সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাবে চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

যা হোক, আমাদের সর্বাধিনায়ক এবং চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন. এ. সালিক আমার পরিকল্পনাটা অনুমোদন করলেন এবং তাড়াতাড়ি এর বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশও দিলেন। কিন্তু আমার সমস্যা হলো, কোথেকে আমি রাজনৈতিক নেতাদের খুঁজে বের করব। অযথা দেরি না করে এক্ষুনি কাজ শুরু করা উচিত। কেননা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। শত্রুহননের নতুন জ্ঞান অর্জন করায়, ওরা যুদ্ধের জন্য ভয়ানক চঞ্চল। আত্মবিশ্বাসের সাথে মাটির পুতুল নিয়ে যেমনভাবে খেলা করে ওরাও তেমনি মাইন, গ্রেনেড ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে ক্যাম্পের ভেতর মেতে উঠল। খুবই উত্তেজনাকর দৃশ্য। মাত্র দু' সপ্তাহের । ভেতর যে উঁচু মানের গেরিলা কৌশল আয়ত্ত করেছিল ওরা, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এবং গুণগত দিক দিয়ে সহজেই তা অনেক দিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এর কারণ, ওরা সবাই শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে গেরিলা কৌশল রপ্ত করেছে। তারা জানত যে, এটা স্কুল নয়, কোনো রকমের তাড়াহুড়ার পাঠ শেষ করে পরীক্ষায় বসা-তারপর শিক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে ফিরে আসা।

এটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে তাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এখানে কোনো রকমের নির্বুদ্ধিতা বা অশিক্ষা শুধুমাত্র ব্যর্থতাই নিয়ে আসবে ন-এর একমাত্র পরিণতি হবে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গেরিলাদের দৃঢ়সংকল্পের সামনে বেচারা মরণটার বাজার দর একেবারে কমে গিয়েছিল। শুধুমাত্র শেখ মুজিবকে হারাবার ভয়ে ওরা বিচলিত। শেখ মুজিব ওদের মহান নেতা। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির গর্ব। মহান নেতার জাদুমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। একটা বিরাট শক্তির রূপপরিগ্রহ করে পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তিসংগ্রামে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। আমি চারটি কেন্দ্রের খবর জানতাম। সেগুলো হলো-চাকুলিয়া ও মূর্তি বিহার প্রদেশে, একটি মেঘালয়ে ও অপরটি বীরভূম জেলায়। বিভিন্ন কেন্দ্রের ছেলেদের নিকটবর্তী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হতো। বাংলাদেশের সাহায্য ও পুনর্বাসনমন্ত্রী জনাব কামারুজ্জামান, ভারতীয় সাহায্য ও পুনর্বাসনমন্ত্রীর সহযোগিতায় এই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করতেন। বাংলাদেশ

সরকার, ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করে সাধারণ নীতিমালা গ্রহণ করেন যে, পঞ্চাশ হাজার লোককে গেরিলা ও বিশ হাজার লোককে নিয়মিত সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে। জুলাই মাসে সব সেক্টর কমান্ডারদের যে আলোচনা সভা ডাক হয়, তাতে মি. তাজউদ্দীন আহমেদ (তখনকার প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) একথা প্রকাশ করেন। আমাদের কেউ কেউ গেরিলা ও সৈন্য সংখ্যা এই নির্দিষ্ট অঙ্কে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। কেননা, আমরা মনে করতাম যে, নিম্নতম সংখ্যায় হয়তো সীমারেখা বেঁধে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু উর্ধ্বতম সংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা উচিত নয়। মনে হলো, এর কারণ তিনি নিজেও জানতেন না। কাজেই অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। ভাবতে এখনো আশ্চর্য লাগে যে, মাত্র এই দুটো বাহিনীর ওপর নির্ভর করে এত তাড়াতাড়ি তিনি বিজয়ের আশা করেছিলেন কোনো আশ্বাসের ওপর ভর করে?

যা হোক, এ সমস্যাটা গেরিলা যুদ্ধের অগ্রগতিকে কোনোক্রমেই ব্যাহত করতে পারল না। একজন বা দু'জন ছাড়া আমার সাথে কোনো অভিজ্ঞ গেরিলা নেতা ছিল। যে দু'জন ছিল তারা কাজকর্ম ভালোই জানত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা, যারা সময় সময় আমার ক্যাম্পে আসত-তাদের ভেতর দিয়ে দলের নেতা হবার যোগ্যতা যাদের আছে-তাদেরকেই বেছে নিতে হলো। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য চারটি জেলার চারজন সামরিক অফিসার পাঠানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আগে থেকেই মুক্তিবাহিনীকে নির্দেশ দেবার জন্য খুলনা ও বরিশালে ক্যাপ্টেন জিয়া এবং পটুয়াখালীতে লে. মেহদী ছিল। কিন্তু ফরিদপুরে কেউ না থাকায় মি. নূর মোহাম্মদ নামে একজন অভিজ্ঞ নৌবাহিনীর গেরিলা শিক্ষককে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। সে প্রথমে পাকিস্তানের 'চিরাট'-এ সামরিক ট্রেনিং নিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকা যায়। এই নূর মোহাম্মদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী। চারটি জেলার জন্য চারজন সামরিক অফিসার পাওয়া যাওয়ায় আমি তাদের নির্দেশ দিলাম সৎ লোকদের ভেতর দিয়ে কমান্ডার নির্বাচন করে প্রতিটি অঞ্চল ও থানায় পাঠিয়ে দিতে। পাকিস্তানি সামরিক তৎপরতার পর থেকেই যারা নিজেদের উৎসাহ ও উদ্যোগে বাংলাদেশের

ভেতরে শত্রু হননের কাজে নিয়োজিত আছে-তাদের সাথে যাতে করে কোনো মতবিরোধ না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য ওদের আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। আমার উদ্দেশ্য হলো, তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত ও সৎ লোককে না সরানো। কেননা, তারা বাংলার দুঃসময়ে জনগণের পাশে থেকে শত্রুর মোকাবিলা করে রূপকথার নায়কের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কাজেই ওদের মনে যেন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়। পুরানো লোকদের জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করা খুব ছিল না। পুরাতনরা মনে করত, নতুনদের চাইতে তাদের দাবি বেশি সমর্থনযোগ্য। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, উপযুক্ত নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো অফিসার পাঠিয়ে দিলে একটা বিষয়ে অন্তত ভালো ফল পাওয়া যাবে।

সেটা হলো, আগে থেকে সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কোনো সুষ্ঠু নেতৃত্বে বা সমন্বয় ছাড়াই কাজ করে যেত। এখন নতুন অফিসার নতুন জায়গায় গিয়ে ওদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে লাগল এবং সহজেই আনুগত্য স্বীকার করে নিল। এটা সবার জন্যই খুব ভালো হয়েছিল। কেননা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গেরিলারা একক নিয়ন্ত্রণ শক্তির অধীনে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, যুদ্ধ পরিচালনা সহজ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও এটা খুব পছন্দ করত। এবার উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের আওতায় এসে গেলে সংশয়হীন চিত্তে ওরা যেকোনো নির্দেশ তামিল করবে। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাত্মক গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য আমি তিনটি জায়গা ঠিক করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে বনগাঁওয়ের নিকট বাগদাতে একটা, হাসনাবাদের দক্ষিণে শমসের নগরে একটা এবং আর একটা টাকিতে। এ তিনটি ঘাঁটির ভেতর বাগদাই সবচেয়ে ব্যস্ততম । এর কারণ, মুক্তিযোদ্ধারা এই পথেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসত এবং এই দিকের পথঘাট ওদের ভালো জানা ছিল। শমসের নগর ঘাঁটি থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভালো জেলার গেরিলাদের পরিচালনা ও নির্দেশ দেয়া হতো। খুলনা জেলার গেরিলারা নদীপথে টাকির সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করত। শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে আক্রমণের গতিপদ্ধতিও পরিবর্তিত হতো।

পাঁচ মাসে অর্থাৎ জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে সরকারি হিসাবমতে, আট হাজার গেরিলা আমার সেক্টর থেকে হালকা অস্ত্রপাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়েছিলাম। অস্ত্রশস্ত্রে স্বল্পতাহেতু শতকরা পঞ্চাশজন গেরিলাকে অস্ত্র দেয়া সম্ভব হয়েছিল। বাদ-বাকি সবাই কেউ গোলা-বারুদ, কেউ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেত। সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থার পরিবর্তন হলো। তখন থেকেই সবাই হাতে অস্ত্র পেল। তাছাড়াও রাজাকার, পুলিশ ও পাক হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্রপাতি দিয়ে বেশি সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম। এমন একটা সময় এলো, যখন আমার সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় বিশ হাজার। মুক্তাঞ্চলে স্থানীয় অধিনায়করা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করায়, মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা আরো বাড়তে লাগল। আমার মতে, এতে ছেলেদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হতো। কেননা, বিপদসংকুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ভারতে আসার কষ্টের হাত থেকে ওরা বেঁচে যেত।

মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও সফলতার পরিমাণ আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। সময় সময় বাহকের মারফত যেসব খবর পেতাম, তা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানত রাজাকার পুলিশদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সফলতা অর্জন করছে। পাক-সৈন্যের বিরুদ্ধে খুব কমসংখ্যক আক্রমণই পরিচালিত হতো। এর কারণ, গেরিলারা যে পাকহানাদারদের ভয় করত-তা নয়। অল্প সময়ের প্রশিক্ষণে ওরা শুধু আক্রমণ করে শত্রুকে কীভাবে খতম করতে। হয়, তাই শিখেছিল। আক্রমণ করে কীভাবে পালাতে হয়, সে কৌশল ওদের ভালো করে জানা ছিল না। অথচ গেরিলা যুদ্ধের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে, আঘাত করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়ার ওপর। যদিও গেরিলা যুদ্ধের রীতি- আঘাত করো ও পালিয়ে যাও, এ সম্বন্ধে তাদের একটা মোটামুটি ধারণা ছিল, তবু আমার কাছে মনে হলো, ওরা যেন কম আঘাত করে বেশি করে পালিয়ে আসত। আমার এ ধারণা অনেকাংশে সত্যি। তা না হলে, যদি গেরিলারা নির্দেশ মোতাবেক তাদের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করত, তাহলে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সেক্টর থেকে যে পরিমাণ গেরিলা ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাতে পাক সামরিক যন্ত্রটাকে মাত্র দু'মাসের ভেতরই বিকল করে দেয়া সম্ভব হতো। কোনো এলাকা মুক্ত হলে, গেরিলারা

দুঃখজনকভাবে স্ব-স্ব এলাকায় অলসভাবে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করে বিনা কাজে সময় হরণ করত এবং অন্য এলাকায় অপরাপর গেরিলা অধিনায়কদের দিকে বড় রকমের একটা সহযোগিতার হাত বাড়াত না। এই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব মুক্তিসংগ্রামের অগ্রাভিযানকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছিল। আরো একটা জিনিস লক্ষ করে মনে খুব ব্যথা অনুভব করলাম। সেটা হলো, আমরা বাঙালিরা যেন একটু বেশি আত্মকেন্দ্রিক। নিজেদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমার মনে হয়, এই ব্যাধিটা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। জাতির এই দুঃসময়ে যখন আমাদের সম্মিলিত হয়ে কাজ করা একান্ত অপরিহার্য তখন এই আত্মকেন্দ্রিকতা শুধু অশুভই নয়, মারাত্মক বিপর্যয়কারীও বটে। যা হোক, এতে অবশ্য বোঝা যায় না যে, আমাদের দেশে ভালো লোকের অভাব রয়েছে। খুলনা জেলার তেরখাদা, মোল্লার হাট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট, সুন্দরবন, পাইকগাছা এবং ভালো, পটুয়াখালী ও বরিশাল শত্রুপক্ষের সাথে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে উত্তেজনায় সর্বদা উত্তপ্ত থাকত। বস্তুতপক্ষে গতিশীল নেতৃত্বের জন্যই উপরোক্ত জায়গাগুলো মুক্তিসংগ্রামে ভালো অবদান রাখতে পেরেছিল। দেশের ভেতরের এতসব ঘটনার কথা আমাদের কাছে পৌঁছত না। বাহকের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অনেক বাহক আমাদের সদর দপ্তর পর্যন্ত পৌছতে পারত না। পথেই কঠিন মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ত। যখন দেশের আনাচে-কানাচে হানাদাররা জাল পেতে বসে আছে, তখন বাহকের কাজটা খুব আরামদায়ক নয়। বর্ষাকালে রাতের অন্ধকারে বুক পরিমাণ জলের ভেতর দিয়ে হেঁটে সংবাদ নিয়ে আসা কতটা কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। মনে পড়ছে পনেরো বছর বয়স্ক পাতলা গড়ন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী আলমের কাছ থেকে শোনা একটা লোমহর্ষক কাহিনির কথা।

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের ছেলে আলম। শত শত গেরিলাদের পথ দেখিয়ে সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বরিশাল থেকে সুদূর পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে। একজন পথপ্রদর্শক ও সংবাদবাহক হিসেবে আলম নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত করেছিল। দেখতে খুবই বেমানান এই ছেলেটি, জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শত শত

গেরিলাকে শুধু পথ দেখিয়েই ভেতরে নিয়ে যায়নি, ভেতর থেকে শত শত অদক্ষ যুবককে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে এসেছে। এই ছেলেটি চতুর ও বুদ্ধিদীপ্ত। অনেকবার সে পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়েছে। তার চেহারার ভেতর একটা সরল মাধুর্য আছে। সে এত ভালো উর্দু বলতে পারত যে, মাথাভারী দেহসর্বস্ব পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে বিহারি মুসলমান বলে ভুল করে ছেড়ে দিয়েছে। জুলাই মাসে সীমান্তবর্তী বাগদা থেকে আলমই সর্বপ্রথম গেরিলাদের বরিশাল ও ফরিদপুরে নিয়ে আসে। জুলাই ও আগস্ট মাসের সেই বর্ষণমুখর রাতগুলোর কথা আজও আমার মনে পড়ছে। প্রতি রাতে বর্ষা মাথায় করে বাংলার অতন্দ্র প্রহরী এই গেরিলারা বাগদার সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে চলে যেত। প্রমত্তা ইছামতী ছুটে চলেছে। দুকূল তার বহুদূর পর্যন্ত প্লাবিত। এরই ভেতর কত রাত দেখেছি, বাংলার এই অগ্নি-সন্তান গেরিলারা ভয়কে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, কোনো রকম ওজর-আপত্তি না করে অন্ধকারে অস্ত্র হাতে নিয়ে পানি কাদার মধ্যে শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে। শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। রাইফেলটায় যাতে পানির স্পর্শ না লাগে, সেজন্য ওটাকে উপর দিকে তুলে ধরত। কী অভূতপূর্ব দেশপ্রেম। আকাশটা কান্নায় ভেঙে পড়ে ওদের সারাদেহ কাদাপানিতে একাকার করে দিল। তবু চোখে-মুখে আগুন দিয়ে এই দুর্জয় সেনানীরা সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ঠান্ডা বাতাস ও বর্ষার ঝাপটা মাথায় করেই অন্ধকারের ভেতর তাদের সীমান্ত পার হতে হবে। একটা বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল। আর শূন্যটাকে মেলে দিলাম ওদের পথের দিকে।

কোন পথ? আদতে কোনো পথ নেই, শুধু পানি, কাদা, বৃষ্টি, অন্ধকার ও শত্রুর বুলেট। এই অনিশ্চয়তার মাঝে ওরা এগুতে লাগল কোনো সাহসে? ওরা কেনইবা এরকম দুঃসাহসী হলো? স্বাধীনতা বলতে ওরা কী বুঝেছিল? স্বাধীনতার পরে ওরা কী আশা করেছিল? কীসের তাড়নায় ওদের ভেতরটা উত্তেলিত-এত উন্মত্ত? কোন জাদুমন্ত্র যন্ত্রচালিতের মতো ওদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? কুৎসিত মৃত্যুর চেহারাটা বুঝতে পারে না বলেই কি এই নিরীহ নির্দোষ কচিকাঁচার দল সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে? জন্মভূমির এ করুণ ছবিই কি ওদের এই অসাধ্য সাধনের কঠিন

ব্রতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল? এতসব চিন্তা প্রেতাত্মার মতো আমার পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগল। অনেক সময় এসব ছোট ছোট ছেলেদের জন্য মনটা আমার দারুণ কেঁদে উঠত। আমি যেন এসব ছোট ছেলেদের প্রাণশক্তিকে তুচ্ছ মনে করে এই মহান ব্রতের তীর্থযাত্রা থেকে ওদের ব্যথা না দিই, সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝেও ওরা সবসময় প্রাচুর্য ও আনন্দের উচ্ছলতা প্রাণবন্ত থাকত। ওদের সরল সন্দর মুখের দিকে চেয়ে যখন চিন্তা করতাম- ওদের অপরিণত মৃত্যুর কথা, তখন আমার মনটা ঢুকরে কেঁদে উঠত। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে আঁসু। শত্রুর বুলেটে ঝাঁঝরা ওদের দেহগুলো কীভাবে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে। কীভাবে খালে বিলে ভেসে বেড়াবে। হয়তো ওদের পিতা- মাতার স্নেহময় নীড়ে আর কখনো ফিরে যাবে ন–এসব চিন্তা করে মনে আমার তীব্র ব্যথার যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

নিজেকে অভিশাপ দিতাম, কেন ওদের সাথি না হয়ে অধিনায়ক হলাম। কেন ওদের পাশে থেকে যুদ্ধ করে ওদের মুখের হাসিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। ওদের রক্তের সাগরে দাঁড়িয়ে মুক্তির আনন্দকে আজ বড় বিস্বাদ লাগল। মনে হলো, যুগ-যুগান্তরের রক্ত শোষণকারী একটা নির্দয়, নিষ্ঠুর প্রেতাত্মা আমার চারদিকে অহর্নিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণের 'জয় বাংলা', 'তোমার নেতা আমার নেতা-শেখ মুজিব-শেখ। মুজিব'-এই ধ্বনিই তো ওদের অনুপ্রাণিত করেছিল-অনিশ্চয়তার আঁধার ও চরম বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কোনো পুরস্কার বা প্রতিশ্রুতির লোভে ওরা এ কাজ করেনি। দেশ ও নেতার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় ওদের জাদুমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছিল-এই মৃত্যুভয়কে জয় করতে।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, স্বাধীনতার পরে ওদের ক'জনকে আমরা মনে রাখব? কিন্তু জন-প্রাচুর্যে ভরা এসব মৃত্যুঞ্জয় তরুণ এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। আত্মোৎসর্গের কঠিন ব্রতে দীক্ষা নিয়ে বাংলার এই গেরিলারা স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। বর্ষার ঔদ্ধত্যকে সংকল্পের দৃঢ়তায় ছিন্নভিন্ন করে ওরা এগিয়ে চলল। অন্ধকারের মাঝে ওদের এগিয়ে যাওয়া আমি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম, যুদ্ধ না করেই বজ্রকঠিন শপথের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হানাদারদের কব্জা থেকে মুক্তির আলো একদিন ওই সূর্য সন্তানেরা ছিনিয়ে আনবেই।

ঘটেছিলও তাই। পাক-হানাদাররা ক্রমাগত থানা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। গ্রামে যেখানেই গেরিলাদের সাথে তাদের মোকাবিলা হয়েছে, সেখানেই ওরা পুনর্বার যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর হানাদাররা থানা ছেড়ে জমা হতে থাকে সামরিক ছাউনিতে এবং রাজাকারদের ওরা পুরো সুযোগ দিতে লাগল, থানা ও গ্রামের ওপর প্রভুত্ব চালাতে। দুর্জয় গেরিলাদের হাতে চরম মার খেয়ে রাজাকাররা তাদের রাজত্ব চালাতে খুবই অসুবিধায় পড়েছিল। ওদের জঘন্য কার্যকলাপের জন্য গেরিলারা নির্মমভাবে রাজাকারদের নিশ্চিহ্ন করে দিত। আমার কাছে খবর আসল যে, গেরিলারা পুরাদমে আক্রমণ চালিয়ে শত শত রাজাকার খতম করছে। এতে সুফল হলো-যারা একদিন রাজাকারদের বর্বরতার শিকার হয়েছিল, সেই নিঃস্ব গ্রামবাসী আবার মনের বল ফিরে পেল।

বাঙালি রাজাকারদের হত্যা করাটা আমি যেন পছন্দ করতে পারলাম না। কারণ, আমি জানতাম যে, এই হত্যার দ্বারা শুধু অনাথ ও বিধবার সংখ্যাই বেড়ে গিয়ে দেশের সমস্যা আরো জটিল করে তুলবে। একবার আমি নির্দেশও পাঠিয়েছিলাম যে, রাজাকারদের মানসিক পরিবর্তন এনে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করতে হবে।

এই মর্মে কিছু প্রচারপত্র বিলি করা হলো। দেখা গেছে, এর ফলে অনেক রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে দুটো সুফল পাওয়া গেছে। প্রথমত, গ্রামবাসী রাজাকার ও পাক বর্বরদের অত্যাচারের হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেল। দ্বিতীয়ত, হানাদাররা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোপন আস্তানায় ঢুকে আত্মরক্ষা করতে লাগল। তাছাড়াও রাজাকারদের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ ও বিভেদ সৃষ্টি করতে সফল হলাম। এর ফলে হানাদারদের পরিকল্পনায় সহজেই ফাটল ধরল।

আর কোনো পথ খোলা না দেখে পাক-বর্বররা গানবোটের সাহায্যে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈন্যরা গানবোটে চেপে নদীর পথ ধরে চলতে থাকত। আর মেশিনগান ও রকেট দিয়ে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে নদীর তীরববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। পাকিস্তানি গানবোটগুলোর এরূপ আকস্মিক হামলায় ক্ষেত খামারে

কর্মরত শত শত কৃষক, জেলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করল। বাংলাদেশের নদীপথ দিয়ে গানবোটগুলো চালিয়ে নেয়ার সময় হানাদাররা যাদেরই সামনে পেত- তাদের উপরই পৈশাচিক উল্লাসে মেশিনগানের গুলি ছুড়তে থাকত। মনের অবস্থা যখন ভালো থাকত না-তখন হানাদাররা নদীর তীরে কোনো গ্রামের কাছে গানবোট ভিড়িয়ে অসভ্য তাতারের মতো গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ছিনিয়ে আনত। যারা আপত্তি করত, তাদের খতম করে দিত। যদিও আমাদের গেরিলারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এই গানবোটগুলো কাবু করার জন্য কিন্তু ওদের কাছে নিম্নমানের অস্ত্রপাতি থাকায় গানবোটগুলোর মোকাবিলায় পেরে উঠত না। এভাবে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে গানবোটগুলো গ্রামের লোকদের ভেতর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। গানবোট কাবু করার জন্য ভারি অস্ত্রপাতি চেয়ে গেরিলারা আমার কাছে অনেক খবর পাঠাল। আমরা যদি জনগণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে যত রকমের সফলতাই আমরা অর্জন করি না কেন, জনগণ অচিরেই তা ভুলে গিয়ে আমাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বন্ধ করে দেবে। বিশেষ করে আমার ৯নং সেক্টর নদীনালায় ভর্তি। পাকবাহিনী গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার হাজার হাজার গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসলে যে কী ঘটছে-আমি জানতাম। গানবোট ধ্বংস করার উপায়ও আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার কাছ থেকে বার বার তাগিদ যাওয়া সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সেসব নতুন অস্ত্রশস্ত্র যোগাবার জন্য কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টাই করেনি। গানবোট কাবু করতে সামনে কয়েকটা রকেট-লাঞ্চারই যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেগুলোও পাইনি।

এ নিয়ে অনেকবার আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দরবারে গিয়েছি। কিন্তু তিনিও তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে গানবোট ধ্বংস করার মতো ভারি অস্ত্র জোগাড় করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। আজকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, কেন এসব প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার মিত্রবাহিনীর কাছে অনুরোধ জানাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, গানবোট কী করে ধ্বংস করা যায়-এ সম্বন্ধে আমি

একটা রিপোর্টও তৈরি করেছিলাম। আমি এই রিপোর্ট তদানীন্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী মি. তাজউদ্দীন আহমদকে দেখিয়েছিলাম। তখন তারা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের আশ্বাস সত্ত্বেও এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অর্ধ মীমাংসিতই রয়ে গেল। তাদের এই নির্লিপ্ততায় আমি খুব ব্যথা পেলাম, পাগলের। মতো ছুটে গেলাম চার্লি সেক্টরের অধিনায়কের কাছে। তিনি তার নিজের প্রচেষ্টায় আমাকে গোটা দুয়েক রকেট লাঞ্চার যুগিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ওগুলো খুবই অপর্যাপ্ত। যা হোক, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন এ সালিক মংলা পোর্টের কাছাকাছি একটা গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করতে কিছু পথ প্রদর্শক প্রস্তুত রাখতে বললেন। তার কথামত পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধাসহ আফজাল নামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদারকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। এ ছাড়াও আগে থেকেই মি. খিজিরের অধীনে সেখানে একশত গেরিলা ছিল। মি. খিজির খুলনার একজন মেকানিক। হাবিলদার আফজালের যোগ্যতা ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মি. খিজির উদ্দীপনা পেল এবং 'বানীশান্ত' নামক একটি জায়গায় আর একটি ঘাঁটি স্থাপন করল। এখান থেকেই মংলা বন্দরে হানাদারদের গতিবিধি, সামরিক শক্তি, জাহাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য ওরা কতটা সতর্কতা অবলম্বন করছে ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কাছে। খবরাখবর এসে পৌঁছতে লাগল।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 'ফ্রগম্যান' পাঠানো। আগস্টের শেষ সপ্তাহে লে. জিয়া ছ'খানা নৌকা নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহের আশায় ভারতে এসে পৌঁছল। সুন্দরবনের একটা বৃহত্তম গেরিলা ঘাঁটির অধিনায়ক লে. জিয়া। তার কাছে যেসব অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ ছিল, তা খুবই অপ্রতুল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের খবরাখবর সে সবিস্তারে আমার কাছে খুলে বলল। কথার মাঝখানে বারবার সে গানবোট ধ্বংস করার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতে লাগল। সে জানাল যে, পাক হানাদারদের মনোবল একদম ভেঙে গেছে। এখন একমাত্র গানবোটের সাহায্যেই আক্রমণ অব্যাহত রাখছে। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপ্টেন শাহজাহানকে বরিশাল জেলায় আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তার ওপর বিশ্বাস রেখে জিয়া জানাল যে, শাহজাহান

ভালো কাজই করছে। ক্যাপ্টেন ওমর-এই ছদ্মনামে শাহজাহানকে ডাকতাম। ক্যাপ্টেন শাহজাহান পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সিগন্যাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার। সে দুঃসাহস করে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি পার হয়ে প্রায় একশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে আসে। সে সাধারণ সিগন্যাল অফিসারের মতো নয়। লম্বা ও শক্ত গড়ন। দেখতে অনেকটা পদাতিক বাহিনীর অধিনায়কের মত। আমার সেক্টরে যোগ দেয়ার আগে সে গেরিলা বাহিনীতে দীর্ঘ ছ'মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ভালোই হলো। একটা গেরিলা বাহিনী তার অধীনে বরিশাল পাঠিয়ে দিলাম। কেননা, ওমর অধিবাসী বরিশালের। এবং ওখানকার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে ওর ভালো জ্ঞান ছিল। জিয়ার কাছ থেকে এসব খবর পেয়ে আংশিকভাবে খুশি হলাম। এবং পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একমাত্র ওকে আমাদের সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য সর্বাধিনায়ক সাহেব কোনো ঔৎসুক্যই দেখালেন না। স্বভাবতই আমি আশা করেছিলাম যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আসা একজন গেরিলা অধিনায়কের মুখ থেকে খবর শোনার জন্য তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তার এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে আমি খুবই হতাশ হয়ে গেলাম। যা হোক, কোনো রকম বুঝিয়ে-শুনিয়ে সর্বাধিনায়ক সাহেবকে জিয়ার সাথে একটিবার দেখা করার জন্য কতকটা বাধ্য করালাম।

'বানরের মতো ঘুর ঘুর করছ কেন?' তার এই প্রিয় বাক্যটি উচ্চারণ করতে শেষপর্যন্ত তিনি জিয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে রাজি হলেন! সর্বাধিনায়কের কথাটার সংশোধনী টেনে বললাম, বানরের মতো ঘুর ঘুর করতে ও আসেনি এখানে- বহুদূর থেকে এই প্রথমবারের মতো এসেছে। ভয়ানকভাবে সমস্যাপীড়িত সর্বাধিনায়ক সাহেব শেষপর্যন্ত অনেক নিয়মকানুন পালনের পর জিয়াকে ডেকে পাঠালেন। নিয়মশৃঙ্খলা মানার তার সেই পুরানো বনেদি হাবভাবটা গর্বের সাথে তিনি মেনে চলতেন। আহা! আত্মম্ভরিতার কি সুন্দর নজির রেখে গেছে ওদের তৎকালীন প্রভু সাদা চামড়ার দল। অসংখ্য ধন্যবাদ-কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ সাক্ষাৎপর্ব শেষ হলো। এরপর ব্রিগেডিয়ার এন এ সালিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য জিয়াকে নিয়ে আমি ব্যারাকপুর গেলাম। এটা

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ব্রিগেডিয়ার সালিক খুব ধৈর্য সহকারে লে. জিয়ার কথাবার্তা শুনলেন এবং তাকে আশ্বাস দিলেন যে, ভারতীয় ৯নং ডিভিশনের অধিনায়কের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তিনি শিগগিরই যতটা সম্ভব রকেট লাঞ্চার ও অন্যান্য ভারি অস্ত্রপাতি সরবরাহ করবার চেষ্টা করবেন। লে. জিয়াও গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পেল না। তাকে পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ব্রিগেডিয়ার সালিক, ভারতীয় নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার সামান্ত ও লে. কমান্ডার মার্টিস মংলা ও চালনা বন্দরে ফ্রগম্যান পাঠানোর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। এই ত্রিকোণা দ্বীপটা শিবসা ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থল থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে। সমুদ্রের মধ্যে পাক বাহিনীর একটা গুপ্ত ঘাঁটি আছে বলে সন্দেহ করা হতো। ওখানে হয়তো অনেক রসদ-সম্ভার, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হানাদাররা জমা করে রেখেছে। সুতরাং আগামী 'ফ্রগম্যানশীপ' পরিকল্পনার সর্বাত্মক কর্মসূচিতে 'ত্রিকোণা'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। লে. জিয়ার গেরিলা বাহিনী ফ্রগম্যানদের সহায়তায় ত্রিকোণায় আক্রমণ পরিচালনা করবে। চার্লি সেক্টরের সদর দপ্তরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এ ব্যাপারে সমস্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নেয়া হলো। চার্লি সেক্টরের মেজর রায় চৌধুরী ও মেজর ভট্টাচার্য কতকগুলো দেশি নৌকা তৈরি করাতে লোকজন কাজে লাগিয়ে দিল। যাতে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়, সেজন্য নৌকাগুলোতে অস্বাভাবিক রকমের কিছু থাকবে না। সাদাসিধা দেশি নৌকা। পাক-সৈন্যরা বড় নৌকা দেখলেই তল্লাশি চালায়। ফ্রগম্যানদের সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখছি। এই ফ্রগম্যানদের দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা হয়নি। তারা দেশেরই সরল নিরীহ যুব সম্প্রদায়। বেশিরভাগই ছাত্র। জুনের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ওদের জোগাড় করা হয় এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের পলাশীনগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মার্টিস ও প্রশংসনীয়ভাবে মাত্র দু'মাসের ভেতর এ সমস্ত কচি গ্রাম্য ছেলেরা দক্ষ লে. দাসের সহযোগিতায় ফ্রগম্যানশীপ ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়ে আসে। যেকোনো মূল্যায়নে মি. মার্টিস, মি, দাসের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

লে. দাস ভারতীয় বাহিনীর দক্ষ ফ্রগম্যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অক্টোবর মাসে কোনো এক জীপ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। বিভাগ-পূর্বকালে তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। অবিরাম দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। মুক্তি সংগ্রামে তার অবদান অবিস্মণীয় হয়ে থাকবে। জন্মভূমিকে সেবা করতে গিয়ে বাংলার এই সুসন্তান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর একদল লোকপলাশীতে এই ফ্রগম্যানশীপ প্রশিক্ষণের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। তারা পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাব মেরিনে কাজ করত। ফ্রান্সে যখন একটি বিশেষ কাজে ওদের পাঠানো হয়, তখন সেখান থেকে মুক্তিসংগ্রামের প্রাক্কালে ওরা পালিয়ে লন্ডনে আসে। সেখান থেকে ভারতীয় হাইকমিশনের সহায়তায় দিল্লি পৌছায়। সংখ্যায় তারা আটজন। খুলনা জেলার অধিবাসী মি. রহমতউল্লাহ ওদের অধিনায়ক হয়ে নিয়ে আসে। সত্যিকারভাবে রহমত উল্লাহ একজন দেশপ্রেমিক। ফ্রগম্যানশীপের কলাকৌশল সম্বন্ধে সে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে।

মনে পড়ে, লে. দাস টাকিপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে ফ্রগম্যানশীপ ট্রেনিং-এর জন্য ছেলেদের ভেতর থেকে পনেরজন ছাত্রকে নির্বাচিত করেছিলেন। তারা সবাই ভালো সাঁতার জানত। ভালো ফ্রগম্যান হতে হলে ভালো সাঁতার জানা দরকার।

৯ সেপ্টেম্বর। পরিকল্পনামাফিক বাংলার ফ্রগম্যানরা সবাই যখন প্রস্তুত, তখন নৌকাগুলো কি আর পিছনে পড়ে থাকতে পারে! ত্রিকোণা আক্রমণ করার জন্য লে. জিয়ার আটজন ফ্রগম্যানসহ আগেই যাত্রা করার কথা। তাকে দুটো রকেট লাঞ্চার, কিছু এল এম জি এবং অভ্যন্তরের মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ধারিত তারিখমতো লে. জিয়া কলকাতার উত্তর-পশ্চিম দিকের বাসন্তী নামে একটা বন্দর নগরী থেকে রওয়ানা হলো। বর্ষার মাতামাতি। আবহাওয়া ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। নদীগুলো যেন এক একটা দৈত্যের মতো রাগে ফুলছে। উকে তার প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়া বিদ্রোহী তরঙ্গমালা। ফ্রগম্যানদের গোপন ঘাঁটি থেকে নৌকায় করে শমসের নগর পৌঁছুতে হবে। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা মি. আসাদুল্লাহর নেতৃত্বে তিনটি নৌকায় ত্রিশজন ফ্রগম্যান

'লিম্পেট মাইন' নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর মংলা এবং চালনা বন্দরের পাকিস্তানি বাণিজ্যিক ও নৌবাহিনীর জাহাজগুলো আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ওদের বিদায় দেবার জন্য ১ সেপ্টেম্বর লে. কমান্ডার মার্টিস, মেজর রায় চৌধুরী এবং আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটা লঞ্চে করে শমসের নগর পৌঁছে একটা বাঁকের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখান হয়েই জিয়ার নৌকাগুলো যাওয়ার কথা।

সকাল বেলা-ভয়ানক ঝড় থেকেই উথাল-পাতাল ঢেউয়ের বুক চিরে নৌকা চালনা করা খুবই কষ্টকর। বেলা তিনটা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ওদের আসার কোনো হদিস পেলাম না। দেরি হবার অবশ্য অনিবার্য কারণ ছিল, কিন্তু ওদের পৌঁছুতে বিলম্ব দেখে আমরা খুবই চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে উঠলাম। বিকাল প্রায় সাড়ে চারটার সময় প্রথম নৌকাটা এসে বাঁকের কাছে পৌঁছুল। কেউ তাদের শিক্ষিত বা মুক্তিবাহিনীর লোক বলে চিনতে পারল না। কেননা, ওরা বুদ্ধিমত্তার সাথে সাধারণ মাঝি ও জেলের বেশ ধরে আত্মগোপন করেছিল। পরনে ছিল লুঙ্গি ও ছেঁড়া শার্ট। বৃষ্টির জলে ওদের জামাকাপড় সব ভিজে গিয়েছিল। কেউ কেউ চা বা অন্য কিছু গরম করার জন্য আগুন জ্বালাতে খুব চেষ্টা করতে লাগল। ভেজা বাতাসের বুক চিরে কীভাবে ধূসর ধুম্র কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে উপর দিকে উঠে যাচ্ছিল-আজও আমার মনে পড়ছে।

যা হোক, আমাদের অপেক্ষা করতে দেখে ওরা খুবই উল্লসিত হলো। ইতোমধ্যে দেখা গেল, আরো দুটো নৌকা বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। নৌকাগুলো সব এক জায়গায় হলে, মুক্তিযোদ্ধাদের সবাইকে আমাদের লঞ্চে এনে গরম চায়ে আপ্যায়িত করলাম । ছেলেদের মনোবল খুবই উঁচু বলে মনে হলো।

একজন লিডার নিয়ে, চারজনসহ এক একটা দল। লিডারদের আমার কেবিনের ভেতর ডেকে নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কিছু টাকা-পয়সা দিলাম- যেন পথে ওরা খাবার জন্য কষ্ট না পায়। সবই প্রস্তুত। কিন্তু ঝড়ের দাপট প্রশমতে হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এই ঝড়ের মধ্যে ওদেরকে পাঠানো আমি সমীচীন মনে করলাম না। কাজেই কাজটা রাতের মতো স্থগিত রইল। এবং ১১ তারিখে খুব ভোরে ওদের যাত্রা করতে বললাম। পথ দেখিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে নিয়ে যাবার জন্য মোশাররফ নামে

একজন অভিজ্ঞ লোককে ওদের সাথে দিলাম। এই মোশাররফই পথ দেখিয়ে আমাকে ভারতে পৌঁছে দেয়। সে সুন্দরবন এলাকার মুন্সিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা। সবার মুখেই হাসি। সবাই খুশি। শেষবারের মতো সবাইকে উপদেশ দিয়ে এবং ওদের মঙ্গল কামনা করে ওই রাতেই আমরা হাসনাবাদ রওয়ানা হলাম।

ভাবছিলাম, বিক্ষুব্ধ শিবসা নদীতে এখনো বাংলার ওই দামাল ছেলেরা নৌকা বেয়ে চলছে। যেহেতু আমি বাঙালি, তাই শিবসাকে নদী বলছি। অন্যথায় শিবসার মূর্তি ও বিস্তৃতি দেখে যেকোনো দিল সাগর বা মহাসাগর দেখেনি, সে ওকে সাগর বলেই মনে করবে। একবার ভেবে দেখুন, কীভাবে কাঠের ছোট্ট নৌকাগুলো একদল দেশপ্রেমিক নিয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ শিবসা ও শশুরের বিরাট বুকের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। যেকোনো সময় মাঝ-নদীতে নৌকাগুলো উল্টে যেতে পারে। কিন্তু নৌকার আরোহীরা অচঞ্চল, ভ্রুক্ষেপহীন। ওরা মেদবহুল সাঁতার নাজানা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের মতো নয়। ওরা আধুনিক নৌবাহিনীর যেকোনো দক্ষ নাবিকের মতো দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। তবু বাংলার ওই দুর্জয় সন্তানেরা কত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দেশমাতৃকার কঠিন শৃঙ্খল মোচনের দুর্নিবার আশায়। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ঠিক তিনদিন পরেই অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর ভোরে ওরা নিরাপদে ঠিকমত জায়গায় পৌঁছে গেল । ১৫ সেপ্টেম্বর সামনে। শত্রুর ওপর চরম আঘাত হানার মাহেন্দ্রক্ষণ। যে জায়গা থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে, তার সাথে সংযোগ সাধন, আক্রমণের পর যেখানে গিয়ে সবাইকে জমা হতে হবে, সেখানে গেরিলাদের ঠিকমত জায়গায় রাখা, উদ্দেশ্য সমাধা করার পর সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড় ইত্যাদি প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য হাতে খুব কম সময়ই আছে। ১৪ তারিখ ভোর থেকে ১৫ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের প্রস্তুতি নিতে কেটে গেল।

হাবিলদার আফজাল ও খিজিরের স্থল-গেরিলারা ওদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা লোভাতুর চোখে চেয়ে দেখল, আটটি বাণিজ্যিক জাহাজ চালনা বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। পশুর নদীর মাঝখানে সবগুলো নোঙর করা ঠিক হলো, জোড়া পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাতে হবে। অর্থাৎ

দু'জন ফ্রগম্যান একটি একটি জাহাজ আক্রমণ করবে। এক একটা জাহাজকে আঘাত করার জন্য এক একজন ফ্রগম্যানের কাছে চারটি করে, দু'জনার কাছে মোট আটটি লিম্পেট 'মাইন' থাকবে।

লিম্পেট মাইন পানিতে ভাসে। সুতরাং ওদের পক্ষে এতগুলো মাইন এক সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হলো। ঘাঁটি থেকে প্রায় পনের শ" গজ দূরে জাহাজগুলো এলোমেলো অবস্থায় নোঙর করা। ১৫ সেপ্টেম্বরের সারাটা দিন কেটে গেল-ওদের সবকিছু বুঝিয়ে দিতে। এক একটা জাহাজ আক্রমণ করার ভার এক একটা দলের ওপর ন্যস্ত করা হলো।

ষোলজন ফ্রগম্যান নিয়ে মোট আটটি দল। ওরা আক্রমণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলে, বাকি চৌদ্দজনকে পরবর্তী পর্যায়ে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য রিজার্ভ রাখা হলো। আঘাত করার সময় নির্ধারিত হলো রাত সাড়ে চারটা। সাধারণত এই সময়েই পাহারাদাররা বিরক্তি ও ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে। আর যারা ঘুমিয়ে থাকে, একই সঙ্গে তারা আরো বিভোরে ঘুমাতে থাকে। স্থির হলো, একই সঙ্গে আটটি জাহাজের ওপর হামলা চালাতে হবে।

বর্ষণমুখর রাত। বাইরে বাতাসের গোঙানি আর বজ্রের ভীষণ গর্জন। সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর, মুক্তিযোদ্ধারা চরম অস্থিরতা ও উত্তেজনা বুকে নিয়ে সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। শিকারি তার সামনে শিকার রেখে কি করে ঘুমাতে পারে?

রাত আড়াইটা। এখানে অন্ধকার। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি। দমকা বাতাসের চাবুক খেয়ে পিছন দিকের অরণ্যটা আর্তনাদ করে উঠল। অধিনায়ক মি. আসাদুল্লাহ ছেলেদের কানে কানে বলল, আঘাত করার এইতো উপযুক্ত সময়। সতর্কতার সাথে শেষবারের মতো আবার সে সবাইকে পরীক্ষা করে নিল। এখন থেকে মাত্র দু'ঘণ্টা পরে সমস্ত নদীর বুক জুড়ে তরঙ্গায়িত হবে লাল টকটকে উত্তপ্ত রক্তস্রোত। নদীর অপর পাড়ে শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত। কেননা, ওরা ভাবতেই পারেনি, অলস বাঙালিরা ওদের পায়ের তলায় কোনোদিন আঘাত হানতে পারবে। নদীতে হিংস্র জীবজন্তু আছে জেনেশুনে দুর্যোগময় এই ঝড়ের মাঝরাতে প্রমত্তা নদীর

বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। মৃত্যুভয়কে দূরে ঠেলে, দেশপ্রেমের জ্বলন্ত বহ্নিশিখা বুকে নিয়ে ওরা ষোলজন সবাই এক সঙ্গে দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখে লেশমাত্র ভীতির চিহ্ন নেই। আত্মপ্রত্যয়ের মহান আদর্শে উদ্ভাসিত। বেয়াড়া প্রকৃতির রক্তচক্ষুকে ভয় না করে মুক্তিযোদ্ধারা নদীর বুক চিরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল লক্ষ্যবস্তুর দিকে। ওদের কোমল ডানাগুলো ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ল। কিন্তু জলের ওপর ভেসে ভেসে, ঢেউয়ের কোলে মাথা রেখে ওরা লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে পৌঁছুল। সবার অলক্ষ্যে বড় বড় জাহাজগুলোর গায়ে ওরা যখন হাত বুলাতে লাগল "উহ! তখন কী উত্তেজনা? কী আনন্দ! অল্পক্ষণ পরেই এই বিরাট জাহাজগুলো টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে। জাহাজের গা ধরে কিছুক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিল ওরা। সাড়ে চারটা বাজতে এখনো পাঁচ মিনিট বাকি। অর্ধ আবৃত তারপলিনের নিচে আবছা আলোতে ওরা সান্ত্রীদের দেখতে পেল। হঠাৎ আকাশটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভয়ানক বৃষ্টি আঘাত করার সময় এসে গেল। ঠিক চারটা ত্রিশ মিনিট। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে ওরা লিম্পেট মাইনগুলো জাহাজের তলায় লাগিয়ে দিল। এই মাইনগুলোর উপরের দিকে চুম্বক লাগানো। লোহার সংস্পর্শে এলে গায়ে লেগে থাকে। তারপর ওরা সাঁতরিয়ে ঘাঁটির দিকে ফিরে চলল। এই সময় ওরা খুব তাড়াতাড়ি সাঁতরাতে লাগল। কেননা, ওদের সাথে তখন বোঝা ছিল না। শুধু ছিল চরম উত্তেজনা।

ওরা জানল যে, মাইন লাগানোর এক ঘণ্টা পরে, এই সুন্দর জাহাজগুলো বিকট শব্দে বিদীর্ণ হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার বহুৎসবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। মাইনগুলো বিস্ফোরণের জন্য 'ফিউজে'-এক ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল-যেন ওরা নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারে। আবেগ ও উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা ষোলজন সবাই তীরে ফিরে এলো। যারা তীরে সাগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিল, তারা সবাই ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চুমু খেতে লাগল। শুয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা অধীর আগ্রহে জাহাজগুলোর দিকে চেয়ে রইল-কখন সাড়ে পাঁচটা বাজবে। হ্যাঁ, চরম লগ্নটি এলো। সমস্ত পৃথিবীটাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে বিকট শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলো। প্রমত্তা নদীর বুকে কী সুন্দর বহুৎসব।

খুলনার দৌলতপুর কলেজের স্নাতকোত্তর বিজ্ঞানের ছাত্র মুখার্জী বলল, 'স্যার, জাহাজগুলো বার্লিন নগরীর মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিল।' আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ জ্বলছিল। কিন্তু বার্লিন নয়-পাকিস্তান। আটটি জাহাজের মধ্যে সাতটি ডুবে গেল। আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হলো। এই ঘটনার পর, বন্দরের শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারল, পালিয়ে গেল। বেশ কিছুদিনের জন্য চালনা ও মংলা বন্দর জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল। শমসের নগরে ফিরে আসার সময় মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিসেনারা একটা ফরেস্ট অফিসে হামলা চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র অধিকার করে। এর মধ্যে 'বনবালা ও 'বনমৃগী'-এই দুটো লঞ্চও ছিল। এই লঞ্চে চেপে বিজয়ের উত্তেজনায় আত্মহারা মুক্তিযোদ্ধারা শমসের নগরে ফিরে এলো। পাকিস্তানি ঘাঁটির অবস্থানের অনিশ্চয়তার জন্য লে. জিয়ার ত্রিকোণা অভিযান স্থগিত রাখা হলো। তাছাড়া আবহাওয়াও খুব অনুকূলে ছিল না।

পাকিস্তানি জাহাজের উপরে এই অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তানি জেনারেলরা খুবই ভাবনায় পড়ে গেল। অবশ্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হানাদাররা বুঝতে পেরেছিল যে, বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র নেই। দেশের সর্বত্রই যুদ্ধক্ষেত্র। যখন কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র নেই, তখন ওরা নিজের মনেই প্রশ্ন করত, অগ্রগামী। আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটি কোথায়?- হানাদাররা ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেল। কেননা, সতর্কতা ও প্রস্তুতি সত্ত্বেও গেরিলারা ওৎ পেতে অতর্কিতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। হানাদারারা যে কতটা ভীত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তা ওদের গোপন সংবাদ থেকেই জানা যেত। এসব খবরাদি মিত্র বাহিনীর 'ওয়ারলেস' মারফত আমরা জানতে পারতাম। সব রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গেরিলাদের ভেতরে আসা বন্ধ করতে না পারায় পাক হানাদাররা ভয়ানকভাবে ক্ষেপে গিয়েছিল। সুতরাং ওরা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে চালনা পোতাশ্রয়ের বিপরীত দিকে সুন্দরবনে আগুন ধরিয়ে দিল এবং গানবোট নিয়ে পাহারায় বেরিয়ে সুন্দরবনের সমস্ত পথঘাট একদম বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে হানাদাররা শ্যামনগর ঘাঁটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল। আমাদের হাতেই কিছুদিন আগে এই ঘাঁটির পতন ঘটে।

এবার শ্যামনগর ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করার জন্য হানাদাররা গানবোট ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ভীষণভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করল। তিন দিন তীব্র যুদ্ধ চালাবার পর, হানাদারদের চরম ক্ষতি করে, সমর কৌশলের দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটা জায়গায় আমরা সরে গেলাম। এই যুদ্ধে আমরা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধাকে হারিয়েছিলাম। এর মধ্যে সুবেদার মোহাম্মদ ইলিয়াস মেশিনগানের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর চারজন নতুন ভর্তি মুক্তিযোদ্ধাকে হানাদাররা বন্দি করে। শ্যামনগর পুনরুদ্ধার করেও হানাদাররা গেরিলাদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ করতে পারল না। ওরা অনেক দেরি করে ফেলেছে। কেননা, আগেই হাজার হাজার গেরিলা পাঠিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাওয়ার অনেক গোপন পথের সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি।

এক মাস পরে ঠিক একই উপায়ে ফ্রগম্যানরা আবার মংলা ও চালনা বন্দর আক্রমণ করল। ১৬ অক্টোবর আলম নামে পাক-নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা একজন সৈন্যের অধীনে দ্বিতীয় দলটি শ্যামনগরের অনেক দক্ষিণ দিক দিয়ে হেঁটে ভেতরে গেল। এবারেও আমরা সফল হলাম। এই আক্রমণে শত্রুপক্ষের চারটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একটির নাম 'লাইটনিং' এবং অপরটার নাম 'আল-মুরতজা'। অন্যগুলো চীনা জাহাজ বলে শনাক্ত করা হয়। আমাদের এই দ্বিতীয়বারের আক্রমণ চালনা ও মংলা বন্দরকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিল। এর উপরও নভেম্বর মাসে রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে খুলনায় আক্রমণ চালিয়ে সাফল্য অর্জন করা হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অন্যান্য সেক্টরের নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরেও শত্রু জাহাজের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এ আক্রমণের মোটামুটি ফল হলো-এসব জায়গার শ্রমিকরা সবাই পালিয়ে জান বাঁচাল। এবং ডিসেম্বরে দেশমুক্ত হবার আগ পর্যন্ত ওরা আর ফিরে এলো না। এই ঘটনার পর, এমনকি কোনো বিদেশি জাহাজও বন্দরে নোঙর করতে রাজি হতো না। আমরা এটাই চেয়েছিলাম। আমি জানি না, এই আঘাত হানাদার বাহিনীর অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা বিপর্যস্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে, হানাদাররা আদতেই খুব বেসামাল হয়ে পড়েছিল। তার উপর নতুন করে আঘাত পেয়ে ওরা ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গেল। দিনের পর দিন পরাজয়বরণ করে

হানাদারদের মনোবল একদম ভেঙে পড়েছিল। ওরা হয়তো অপেক্ষা করছে, কখন ওদের প্রভু ইয়াহিয়া খাঁ বাংলার কোমল মাটিতে নাক চুঁইয়ে নতুন 'জয় বাংলা'র গন্ধ নেবে। কেননা, অক্টোবর মাসেই হানাদারদের 'পায়জামা' গরম হয়ে গিয়েছিল। নেহাত ঠেকা, তাই অস্ত্র নিতে হয়। নইলে ইচ্ছা করে কি কেউ অস্ত্র হতে নেয়! ভোমা ভোমা মোচওয়ালা জানায়োরগুলো বাংকারে বসে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে বেরুলে 'মুক্তিরা আবার যদি ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়! বাংলার গেরিলারা 'বিচ্ছু' নামে খুবই পরিচিত

যদি সর্বস্তরেই যোগ্য নেতৃত্ব ও সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকত, তাহলে গেরিলারা আরো ভালো কাজ করতে পারত। সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা দূরের কথা-কোনো রকম ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের গতি শুধু মন্থরই হয়নি, অনেক সময় ভুলবশত আমাদের সৈন্যরা আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানি সৈন্যদের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল উন্নত ধরনের। এসব বাধাবিপত্তির কথা বিচার করলে আমার মনে হয়, মুক্তিসংগ্রামে নিয়মিত সৈন্যদের চাইতে গেরিলাদেরই অবদান বেশি। নিয়মিত সৈন্যরা শুধু দেশের পূর্বাঞ্চলে বৃত্তাকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। বোধহয়, পূর্বাঞ্চলীর ২নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফই (এখন কর্নেল) সর্বপ্রথম এই গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনা করেন। পরে অবশ্য অন্যান্য সেক্টর কমান্ডাররাও তার এই পথ অনুসরণ করেন। তিনি সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেপ্টেম্বরের কোনো একসময় একটা গোলার আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এবং দেশমুক্ত হওয়ার পর ঢাকায় এসে কাজে যোগ দেন। মেজর জিয়া (এখন কর্নেল), মেজর শফিউল্লাহ (এখন চীপ অব স্টাফ) ই পি আর এর নিয়মিত সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন। মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত (এখন কর্নেল) সিলেট জেলার কোনো কোনো জায়গা থেকে ছোটখাটো গেরিলা বাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়েছিলেন। আমার সেক্টরের উত্তরে ৮নং সেক্টরের অবস্থাও একই রূপ। মেজর উসমানের উধীনে তার বাহিনী বেশিরভাগ সময়ই সীমান্তে শত্রুপক্ষের সাথে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতো। কিন্তু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি চার্লি সেক্টরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তিনি গেরিলা দল পাঠানো বৃদ্ধি করলেন।

পাকবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা পদাতিক বাহিনীর অফিসার মেজর মঞ্জুর মেজর উসমানের কাছ থেকে ৮নং সেক্টরের দায়িত্ব বুঝে নেয়। এবং মেজর উসমানকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে ময়মনসিংহ জেলার ভার সামলিয়ে নিয়েছিলেন মেজর তাহের। তিনিও পাকিস্তান গেরিলাবাহিনীর একজন সুদক্ষ অফিসার ছিলেন।

যা হোক, মুক্তিসংগ্রামে সবচেয়ে উত্তেজনাকর অধ্যায় হলো, গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তন। প্রতিদিন নতুন মুখ, সারল্যের প্রতিমূর্তি। এই মুখগুলো প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। কখনো বিশৃঙ্খল। পরক্ষণেই আবার কর্তব্যপরায়ণ, সুসংবদ্ধ। ঠিক নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মতো গতানুগতিকতার বন্ধনে ওরা আবদ্ধ নয়। আমি ভাগ্যবান যে, আমার মতো একজন নিয়মিত সৈন্যের পক্ষে ওদেরকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। ওদের সম্বন্ধে এতকিছু লেখার আছে যে, সেটা শেষ করা সম্ভব হবে তখনই, যখন প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা নিজের দুঃসাহসিক কাহিনির বর্ণনা ওরা নিজেরাই লিপিবদ্ধ করবে।

অনেক ঘটনার উল্লেখ করতে হয়তো ভুলে গিয়েছি। কিন্তু তাই বলে এটা যেন কেউ না ভাবে যে, ইচ্ছা করেই তার মনে ব্যথা দিয়েছি। সবিনয়ে তাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং এই বলে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, মুক্তিসেনাদের আত্মত্যাগ অনির্বাণ দেশপ্রেম মহত্ত্বের আদর্শে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। ওদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। মুক্তিসংগ্রামের স্মৃতি আমার মনে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে।

ফেলে আসা বাকুনদিয়া

সামরিক ছাউনির বন্দি জীবনে বিরক্তি ও নির্জনতার মধ্যে আমার মতো একজন নগণ্য। লোকের পক্ষে অতীতের স্মৃতিচারণ করা ছাড়া আর কিইবা উপায় আছে? এই স্মৃতিচারণই আমার জীবনের আজ প্রধান অবলম্বন। যশোর পাক আমলের বেশ বড় ক্যান্টনমেন্ট। এখন এখানে শুধু কিছু বাঙালি সৈন্য আছে। তারা দিনের বেলায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ সরাবার জন্য এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকে। থমথমে রাতের নীরবতা ভেঙে শৃগালের দল ওদের ভোজনপর্ব উদযাপনে ব্যস্ত। ওরা ভয়ানক খুশি ও প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল।

মনে হয়, শৃগালের দল বর্বরদের দেহগুলো তাড়াতাড়িতে খোঁড়া কবর থেকে উঠিয়ে ভাগাভাগি করার জন্য পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত। শৃগালের একঘেয়ে ডাকে মনটা বিষিয়ে উঠল। মুক্তিসংগ্রামের দখলটা আমার স্বচ্ছতায় স্মৃতিপটে একটা ক্ষত রেখে গেছে। ক্ষতটা খুবই গভীর। যত দিন যাচ্ছে ততই ঘা-টা প্রকট হয়ে উঠছে। মুক্তিসংগ্রাম, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য কি এনে দিয়েছে? আমার হৃদয়, আমার আত্মাও কি স্বাধীন হয়েছে? সংগ্রাম চলাকালে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা পরিচালনা করেছি। সময়ের আবর্তে ওরা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমায়। সেই অসহায় মানুষগুলোর করুণ মুখচ্ছবি আজও আমার মনের আয়নায় পরিষ্কারভাবে ভেসে ওঠে। বাস্তবিক পক্ষেই এটা মূল্যবান সম্পদ। এর সাথে এসে যোগ দেয় টাকিপুর বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণ ও বাকুনদিয়া। ভারতে চলে যাওয়ার পর আমি মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু, মি. আব্দুল গফুর ও মি. শাহজাহানের সহায়তায় সর্বপ্রথম এই টাকিপুর বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করি।

মি. শাহজাহান একজন স্কুল-শিক্ষক। মুক্তিসংগ্রামে তার অবদান খুবই প্রশংসনীয়। মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু ও মি. আব্দুল গফুর উভয়েই গণপরিষদের সদস্য। সাহস ও আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিজেরাই তদারক করেছেন।

টাকিপুর থেকেই আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। স্কুলের মধ্যে ছোট্ট একটি কক্ষকে অফিস করে নিয়ে মাত্র পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রথমে কাজ শুরু করি। স্কুল ক্যাম্পে হাজার হাজার ছেলে এসে জড় হতে লাগল। যখন কাজ

শুরু করি, তখন এখানে মাত্র দুটো তাঁবু ছিল। এখন লোকের সমাগম দেখে বাকুনদিয়া তীর্থযাত্রার পবিত্র পীঠস্থানের মতো মনে হলো।

শত শত লোকের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে আমার বেশিরভাগ সময়ই কেটে যেত। ওদের দেখাশোনা করার জন্য সারাক্ষণ জিপেই থাকতাম।

মনে পড়ছে, মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু ও মি. গফুরকে নিয়ে কাপড়-চোপড়, রান্নার বাসন-কোসন কেনার জন্য মাঝে মাঝে বশিরহাট যেতাম। বশিরহাটের মহকুমা প্রশাসক মি. সপ্তবর্ষী আমাদের সাথে খুবই ভদ্র ব্যবহার করতেন। তিনি মাদ্রাজের অধিবাসী। খুবই অমায়িক। শরণার্থীদের জন্য তার কাছ থেকে তাঁবু চেয়ে আনতাম। যখনই তার কাছে কোনো কিছুর জন্য গিয়েছি, তিনি তখনই আমাদের সব রকমের সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। যুব কেন্দ্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদা উৎফুল্লিত মি. মঞ্জু ও মি. গফুর সবসময় নতুন সাহায্য পাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতেন। উপরোল্লিখিত গণপরিষদ সদস্যদ্বয় ও নাম না-জানা অনেক সাথিদের আন্তরিক সাহায্য ও প্রচেষ্টায় যুবকেন্দ্রের কাজকর্ম পুরোদমে চলতে লাগল। বাকুনদিয়ার জনসাধারণের ওপর মি. শাহজাহানের বেশ প্রভাব ছিল। তার প্রচেষ্টাই আমাকে বাকুনদিয়া নিয়ে এলো। বশিরহাট যাওয়ার পথে বশিরহাট হাসনাবাদ রাস্তার ডানদিকে ইছামতী নদী থেকে এক মাইল দূরে বাকুনদিয়া।

বড় রাস্তার ডান দিকে ছোট্ট একটা পথ ধরে বাকুনদিয়া যেতে হয়। পথের দু'ধারে ঘন জঙ্গল। বাকুনদিয়ায় মি. প্রফুল্ল চন্দ্র নামে একজন বড় জোতদার আছেন। তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান। তার বাড়ির চারদিকে একটা উন্মুক্ত জায়গায় তিনি আমাদের ক্যাম্প করতে দিলেন। জায়গাটা প্রশিক্ষণের জন্য খুবই উপযোগী। প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রও এখানে আছে। এছাড়াও আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো, এই জায়গাটার গঠন কতকটা দুর্গের মতো। নিরাপত্তার জন্য খুবই উপযুক্ত স্থান। মি. প্রফুল্ল চন্দ্রের দালানের সামনে বেশ বড় একটা পুকুর। পুকুরে পদ্মফুলের সমারোহ। পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলো খুব মনোরম। আশ্রয়, নিরাপত্তা ও ছেলেদের জন্য এ স্থানটা খুবই উপযোগী।

আমি সৌভাগ্যবান যে, মি. সুলতান উদ্দীন আহমেদ, সুবেদার আযম, খুলনার জনৈক ছাত্রনেতা আজাদ, নায়েব সুবেদার হাফিজের মতো নিঃস্বার্থ সাথি পেয়েছিলাম। আরো পেয়েছিলাম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অনেক কর্মী, অনেক ছাত্র। এদেরই পরিশ্রম ও সমবেত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠল বাকুনদিয়া ক্যাম্প।

সুলতান আহমেদ কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি। বুদ্ধিদীপ্ত পাকিস্তান নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন গেরিলা। পানির নিচে কী করে আক্রমণ পরিচালনা করতে হয়-এ বিষয়ে তিনি আমেরিকায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ অবদানের জন্যই বাকুনদিয়া ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা অনেক বিজয়ের গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল। বাকুনদিয়ায় আমার গেরিলা ঘাঁটি। এর দ্বারা আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা, যাদের বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হতো, তাদের শেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য এখানেই নিয়ে আসা হতো। মিত্রবাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও মি. সুলতান উদ্দীনের নেতৃত্বে এখানেও একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলবার পরিকল্পনা নিলাম। এর প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে বসে বসে এই চিন্তা করে ওরা যেন স্থবির হয়ে না যায়।

ভারতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাদের শিক্ষা দেয়ার একটা নির্ধারিত সংখ্যা ছিল। নির্জন বাকুনদিয়া দিন দিন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ রাইফেল নিয়ে ধানক্ষেত বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে, কেউবা বেয়োনেট নিয়ে হুংকার ছেড়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কেউবা অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছে। মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে কেউবা গাড়ির আশায় অপেক্ষা করছে। আবার কেউ কেউ জোরে জোরে শপথ নিচ্ছে। কতক পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরটাকে ঠান্ডা করছে। কেউবা মগ বা থালা নিয়ে লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। মোটের ওপর সারা বাকুনদিয়া জুড়ে প্রাণের বন্যা।

বাকুনদিয়া এসব কারণের জন্য খুবই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। কেননা, একদিকে মিত্রবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাকুনদিয়া এসে জমা হতে লাগল। অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও সংবাদবাহকরা নতুন

রসদের আশায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। যেসব মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করত, তাদেরই শুধু ওরা খাবার বন্দোবস্ত করত এই শর্তে যে, ট্রেনিং নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ওদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেতে হবে। কোনো কারণে যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো না যায় ও তদুপরি আরো লোকজন ভেতর থেকে এসে জমা হয়, তাহলে রেশনের সমস্যা প্রকট হয়ে উঠত। সুতরাং ক্যাম্পে খাদ্য, বাসন-কোসন তাঁবু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রায়ই অভাব দেখা দিত। সুলতান মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে বিষণ্ন মনে মাথা চুলকাতে চুলকাতে আমার কাছে এসে বলতেন, "স্যার কী করব এখন, খাবার, তবু কিছু নেই।"
কথাগুলো অসহায় পিতার মতো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলত। যেন তার ডজনখানেক ছেলেপুলে অনেকদিন ধরে উপোস করে আছে। সত্যিই ভরণ- পোষণের জন্য ওর অনেক লোকজন ছিল। বিজ্ঞ দাদা ঠাকুরের ভাবখানা দেখিয়ে আমি তখন উত্তর দিতাম, 'আ-হা, চিন্তা কর না। সবকিছুই আছে, সবকিছুই হবে।'
বস্তুতপক্ষে আমি জানতাম, আত্মবিশ্বাস ও কয়েকজন অকৃতিম বন্ধু ছাড়া আমার পাশে আর কেউ নেই। দিনরাত বৃষ্টি ও রোদ উপেক্ষা করে সময়ে অসময়ে-বন্ধুদের দুয়ারে গিয়ে করুণ আকুতি জানিয়েছি। তারা সাহায্যের হাত বাড়াতে কখনো কার্পণ্য করেনি। হৃদয় উজাড় করে সব রকমের সাহায্য দিয়েছে আমার দুঃসময়ে। মুক্তিসংগ্রামে-বিশেষ করে আমার সেক্টরে তাদের অবদান স্মরণীয়। তাদের ঋণ আমি কোনো দিনই শোধ করতে পারব না। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমার মানবিক কর্তব্য। এসব লোকই বাকুনদিয়া ক্যাম্পকে একটি ইতিহাসখ্যাত স্থানে পরিণত করতে আমাকে সাহায্য করেছিল। এখান থেকেই হাজার হাজার অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা বর্বর পশুদের ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য বেরিয়ে পড়ত। অনেক বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাকুনদিয়া ক্যাম্পের তৎপরতা মুহূর্তের জন্যও স্তিমিত হয়নি। কেননা আমরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করেছি। মুক্তিযোদ্ধারা অল্পবয়স্ক হলেও কোনো করম হালকা ব্যবহার করেনি। বরং তারা সুশৃঙ্খল চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। এমনকি বাইরের অনেক গণ্যমান্য লোকজনও ওদের ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছিলাম, যা সাধারণত যুব সম্প্রদায়ের ভেতর পাওয়া যায় না। সেটা হচ্ছে, ওদের সহনশীলতা। ওদের চোখে মুখে ছিল সহিষ্ণুতার দীপ্তি, যা বাঙালির চরিত্রে কচিৎ দেখা যায়। যেন দেখতে পেলাম, বাঙালির স্বভাবজাত সুকোমল কবিতার লালিত্যও রাজনীতির অঙ্গন থেকে একটা নতুন জাতির অভ্যুদয় অত্যাসন্ন। আমি তাদের আরম্ভ দেখেছি এবং দোয়া করেছি সুষ্ঠু সাবলীল নেতৃত্বের ছায়াতলে ওরা যেন জীবনের সঠিক গতিশীলতা অর্জন করতে পারে। বাকুনদিয়া এমন একটা পীঠস্থান, যেখানে নতুন জাতির অধিকাংশ যাত্রীকেই একবার ক্ষণিকের জন্য থামতে হয়েছিল। আর সুন্দর স্মৃতিমঞ্জুরির বন্যায় পুষ্পায়িত করে পিছনে ফেলে গিয়েছিল ঘন নারিকেল কুঞ্জ, পায়ে হাঁটা শীর্ণপথ আর দুর্গার প্রতিটি ধূলিকণা। অনেক দিন, অনেক রাত আমি এর গভীরতায় ডুব দিয়ে হারিয়ে যাওয়া মনটাকে খুঁজে পেয়েছি।

যুদ্ধ শেষ। শত্রুপক্ষ পর্যুদস্ত। পূর্বাকাশে স্বাধীনতার নতুন সূর্য উদ্ভাসিত। একটা নতুন জাতির অভ্যুদয়। মুক্তিযোদ্ধারা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। কেউ মৃত কেউবা জীবিত। ওরা আর কখনো কোনো দিন বাকুনদিয়া ফিরে আসবে না। নির্জন বাকুনদিয়া, নির্জনই থেকে যাবে। প্রাণচাঞ্চল্য ও গভীরতার ফাঁক দিয়ে জন্ম নিয়েছে একটা নতুন জাতি- একটি জীবন্ত বাকুনদিয়া। এরই সাথে সাথে মনে পড়ছে নিঃস্বার্থপরায়ণ দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুনে উদ্দীপ্ত সুলতান উদ্দিনের কথা। ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ইতিহাস তাকে ভুলবে না। আমার বিশ্বাস, যারা একবার বাকুনদিয়ার বুকে মৃদু বর্ষার গুঞ্জন ধ্বনি শুনেছে, তারা এর স্মৃতি কখনো ভুলবে না। ভাবনাটা আমার খুবই এলোপাতাড়ি। জীবনটা ছড়িয়ে আছে চারদিকের অসীমে। বলে দিন, কীভাবে আমার এই অবিন্যস্ত জীবনকে একই তারে বাঁধব? কেননা, আমি যে আবার একা থাকতে চাই। নির্জনতার মাঝে নিজেকে আবার খুঁজে বের করতে চাই। কিন্তু হায়! আমি কি তা খুঁজে পাচ্ছি? না, চোখের দৃষ্টিতে এবং মনের গভীরতায়-দুটোতেই যেন বার বার ভেসে উঠছে-খুঁজে পাচ্ছি ইছামতীর রক্তাক্ত তীর, শ্যামল বনানী, শহিদের করুণ মুখচ্ছবি, প্রাণচঞ্চল ক্যাম্প, মুখরিত বাকুনদিয়া, হাজার হাজার দুস্থ মানবাত্মার হৃদয়বিদারক কাফেলা, আগুন, ধ্বংস, মুমূর্ষু

নরনারীর বুকফাটা আর্তনাদ এবং হ্যাঁ, কালো, ধূসর বারুদের তীব্র গন্ধময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী যার মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ী অমরতার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাত্র স্মৃতিসৌধ সেই ফেলে আসা বাকুনদিয়ায়।

ব্যারাকপুরের চার্লি

মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়তাম। একা থাকা কোনো রকমেই সম্ভব হয়ে উঠত না। যখন কোনো অস্ত্রশস্ত্র, রেশন ও টাকা-পয়সার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় পাগলের মতো ছুটে বেড়াতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলো সংগ্রহ হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম এ জি ওসমানী সাহেব ভয়ানক বদমেজাজি লোক। তার কার্যকলাপ প্রমাণ করতে তিনি যেন অর্ধ শতাব্দী আগের শান্তিকালীন সময়ের একজন সমরনায়ক। যে পাকিস্তানি বর্বরদের বিরুদ্ধে আমরা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত, সেই পাকিস্তানি আমলের সামরিক মানসিকতায় সব ব্যাপারকেই তিনি আইনের ধারালো মারপ্যাচে বিচার করতে চাইতেন এবং কঠিন মনোভাব গ্রহণ করতেন।

যাহোক আমাদের সর্বাধিনায়ক সাহেব তার সদর দপ্তরে বসে একা একা যা খুশি তাই ভাবুন। কোনো না যতদূর আমি জানি, সমস্ত সেক্টর কমান্ডার বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে নিজের সাধ্যানুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। আমি ভাগ্যবান যে, চার্লি সেক্টরের সাথে জড়িত ছিলাম।

ব্যারাকপুরে অবস্থিত এই চার্লি সেক্টর থেকেই আমার সাহায্য আসত। ব্রিগেডিয়ার এন এ সালিক এই চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে তাঁর এই সাহায্যের জন্যই শেষপর্যন্ত মাত্র ১৪ দিনের যুদ্ধে বিজয় মাল্য ছিনিয়ে আনার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। মেজর জেনারেল পালিত নামে ভারতের একজন বিখ্যাত সামরিক ভাষ্যকার তাই এ বিজয়কে অভিহিত করেছিলেন, 'একটি চমকপ্রদ আক্রমণ' বলে। ব্যারাকপুরে একটি পুরানো সামরিক ছাউনি আছে । টাকি থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে। এখানেই প্রথম

প্রজ্বলিত হয়েছিল, ঐতিহাসিক সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। এই দূরত্বটার সাথে আমি নিবিড়ভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলাম। রাস্তার বাঁক, কালভার্ট, খাদ এমনকি পংশু ভিক্ষুকদের বসার জায়গাটি পর্যন্ত আমার মনে পরিষ্কারভাবে জাগরূক ছিল।

ব্রিগেডিয়ার সালিক শুধু একজন যোগ্য অফিসারই নন, অনেক মানবোচিত গুণাবলিরও অধিকারী। সামরিক বাহিনীর অনেক লোকের ভেতরই এসব সদগুণের পরিচয় সচরাচর পাওয়া যায় না। তার দপ্তরের অপর একজন অধিনায়ক মেজর রায় চৌধুরীও অত্যন্ত বিনয়ী এবং অমায়িক। সীমাহীন চাহিদা নিয়ে আমি যখন সংযম হারিয়ে ফেলতাম, তখনো তিনি শান্ত, অচঞ্চল থাকতেন। কেননা, তার সংগতি ছিল সীমিত। কিন্তু আমার মতো একজন সমস্যা জর্জরিত মুক্তিযোদ্ধার জন্য সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তিনি অনেক সময় ধরাবাঁধা নৈতিকতার গণ্ডি পেরিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। মেজর ভট্টাচার্য নামে আর একজন অফিসারও আমার সমস্যাসংকুল দিনগুলোতে নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। তিনিও আমার অসংখ্য সমস্যা লাঘব করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আমাদের সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ ও মধুর। আমি তার সামনে সমস্যার পর সমস্যা তুলে ধরতাম। আর তিনি খুঁজে বের করতেন এর সমাধানের পথ। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল। কোনো ব্যাপার পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা একে অপরের প্রতি রাগ, মান-অভিমান করতাম। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে শুধু জবাব আসত 'ভট্ট বলছি'। কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো উত্তরই শুনতে পেতাম না। পাঁচ মিনিট পরে আবার কানে ভেসে আসত ভট্ট বলছি, ফোনের একপান্তে ভট্ট, অপরপ্রাপ্তে এই গরিব বেচারা। ফোনটা ছেড়ে দিয়ে জিপে লাফিয়ে উঠতাম দীর্ঘ ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে ভট্টকে আমার সেক্টরের খবরাখবর জানাবার জন্য। কেননা, বারবার চেষ্টার পরও ফোনে তার সাথে যোগাযোগ করে সঠিক অবস্থা জানাতে পারতাম না। ফলে এই হলো-চার্লি সেক্টরে চাহিদামাফিক সরবরাহ। সংস্থাগুলো আমাদের জন্য শুধু রেশনের বন্দোবস্ত করত। ভট্টর কাছে সময়মত খবর না পৌঁছানোয়, ক্যাম্পে যেসব বাড়তি লোকজন এসে হাজির হতো, তাদের জন্য কোনো রেশনের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হতো না। মেজর ভট্টরও কোনো উপায় ছিল না যে, তিনি আমাদের কোনো প্রকার

সাহায্য করতে পারেন। তিনি তো আর মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী নন যে, তার গুদাম ঘর খুলে দেবেন। আইন-কানুনের গণ্ডিতে আবদ্ধ একজন সামরিক অফিসার। আমি এটা বুঝেও বুঝতে চাইলাম না। কেননা আমার বোঝার অর্থ হলো, সে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা অনিয়মিতভাবে আমার ক্যাম্পে এসে হাজির হচ্ছিল, তাদের উপবাসী রাখা। সুতরাং মি. ভট্ট তার যুক্তিতর্ক নিয়ে আমার সাথে বসতেন আমিও আমার যুক্তিতর্ক নিয়ে তার সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতাম। শেষপর্যন্ত যুদ্ধে আমিই জয়ী হতাম। এর কারণ এই নয় যে, আমি একজন ভালো তার্কিক। এর প্রধান কারণ, মেজর ভট্টর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক সময় তার উপর আমি রুক্ষ হয়েছি। কোনো কুশলাদি জিজ্ঞেস না করেই সোজাসুজি তাঁর কাছে আমার চাহিদার কথা জানিয়েছি। যেন, এটা আমার জন্মগত অধিকার। কিন্তু তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে স্মিতহাস্যে আমার চাহিদা পূরণ করতেন। চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধু আমার প্রশাসনিক সমস্যা দূর করতেই এগিয়ে আসতেন না, দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামের এই বিপদসংকুল অবস্থায় মহান পথ প্রদর্শক হিসেবে আমাকে ফলপ্রসূ সাহায্য করেছেন। তারা সহজেই কোনো কাজে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারতেন। কেননা, এটা তাদের মুক্তিসংগ্রাম ছিল না, আমাদের। কিন্তু এ রকম মনোভাবের পরিবর্তে জুলাই মাস থেকে তারা দিন-রাত আমাদের জন্য কাজ করেছেন। উপরোক্ত দু'জন মেজর ছাড়াও যাদব ও কৌশল নামে আরো দু'জন যুবক ক্যাপ্টেন আমার ও আমার সেক্টরের অন্যান্য অফিসারের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা যুবক হওয়ায় সবসময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সময়মত আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন, কোনো ছুটির উপভোগ না করে ঝটিকা বেগে কাজ করে যেতেন। মুক্তিসংগ্রামের নয় মাসে রবিবারে ছুটির অবসর কোনোদিনই আসেনি। এই রবিবারেই আমাদের অনেক কাজ করতে হয়েছে। কেননা, চার্লি সেক্টর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৮ ও ৯ সেক্টরের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই দুটো সেক্টরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

নিয়ন্ত্রণ শব্দটার ব্যাপক অর্থ আছে। ৮ ও ৯ নং সেক্টরে বেতন, রেশন জ্বালানি ও যানবাহন সরবরাহ করার জন্য চার্লি সেক্টরের অফিসারবর্গই দায়ী ছিলেন। ওরা বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জড় করে

প্রশিক্ষণের জন্য তাদের নিয়ে যেত এবং প্রশিক্ষণের পর, আবার ওদের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে একত্র করত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেবার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভেতর পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও পাকিস্তানি মুদ্রা সংগ্রহ করার দায়িত্বও নিয়েছিল চার্লি সেক্টর। যদিও চার্লি সেক্টর স্বাধীনভাবে কাজ করত, কিন্তু মিত্রবাহিনীর অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে এ চার্লি সেক্টরকেই ৯ নং ভারতীয় পদাতিক ডিভিশনে পাঠাতে হতো।

মেজর জেনারেল 'দলবীর সিং' এ ডিভিশনের অধিনায়ক। তিনি সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। সীমান্ত আঞ্চলিক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের চাইতে ভিন্নতর। এটা গড়ে উঠেছিল নিয়মিত বাহিনীর ভূতপূর্ব সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। এদের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল, সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ করা। অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার সালিক যদি সুষ্ঠুভাবে ও যোগ্যতার সাথে তার বাহিনীকে পরিচালনা না করতেন তাহলে কর্মচারী, যানবাহন, সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা ও অন্যান্য সমস্যার চাপে চার্লি সেক্টর গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতো। অসীম ধৈর্য, প্রখর দায়িত্ববোধ ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ও তার সহকর্মীবৃন্দ সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। চার্লি সেক্টরের সাহায্যেই আমরা মংলা ও চালনা বন্দরে অনেক পাকিস্তানি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম। যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সাথে চার্লি সেক্টরের কর্মদপ্তর কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকায় সরিয়ে নিতে হয়েছিল। দেশমুক্তির পরে, চার্লি সেক্টরের কর্মদপ্তর যশোরে স্থানান্তরিত করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় বাহিনীর বিগ্রেডিয়ার এন এ সালিকের মতো একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সান্নিধ্যে আসায় আমি খুবই গৌরবান্বিত।

চার্লি আজ চোখের আড়ালে। তবু ওর কথা আজও আমি ভুলতে পারিনে। চার্লি আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর ও জীবন্ত। স্মৃতি আর স্মৃতি-এ অন্তহীন স্মৃতির মাঝখানে আমি আজ কতো একা!

সেই তীর্থভূমি

এমনকি আজকেও আমার সদর দপ্তরের স্মৃতিচারণ করলে মনে হয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটা কক্ষে দৌড়ে গিয়ে শরীরটাকে জুড়িয়ে নিই। শেষের দিকে আমার দপ্তরটা একটা পাগলা গারদের মতো হয়ে গিয়েছিল। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউবা ঘুমিয়ে আছে। আবার একদল নানা রকম দাবি-দাওয়া নিয়ে আসছে। অফিসের ভেতরে-বাইরে সব জায়গায় সমস্যা। কখনো হেড ক্লার্ককে লক্ষ করে চিৎকার করছি। সেও আবার সময়মত কাজ না করায়, অন্যান্য কেরানিদের প্রতি রাগারাগি করছে। বাইরে শোরগোল। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও কলকাতা থেকে আগত অতিথিবৃন্দের ভিড়।

স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, মুক্তিসংগ্রামের একটা সদর দপ্তর এতটা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। এ কর্মচঞ্চলতার আবর্তে আমি ছিলাম একজন সক্রিয় কর্মী। বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামভিত্তিক অনেক বইয়ে আমি দেখেছি যে, সদর দপ্তর সম্বন্ধে এত বিশদ আলোচনা হয়নি। বরং সদর দপ্তরের অবস্থান সম্বন্ধে সুচতুরভাবে গোপীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে । বোধহয়, দ্বিধা সংকোচকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই। জানি না কোনটা সত্যি। পরিষ্কারভাবে আমার মনে পড়ছে, সাইপ্রাসের জেনারেল 'গ্রিভাস' ও কিউবার 'ফিডেল ক্যাস্ট্রো' তাঁদের সদর দপ্তরগুলো লোকালয়ের বাইরে ভয়ানক গোপন স্থানে স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সদর দপ্তরগুলো- সত্যি বলতে কি, জনাকীর্ণ ও কর্মচঞ্চল।

আমি আমার দপ্তর সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, এটা একটা বড় রকমের মেলার মতো। লোকে-লোকারণ্য ও কর্মব্যস্ত। ভারতের বদান্যতার জন্য ও নিরাপদ স্থানে অবস্থিত বলেই আমার দপ্তরে এত লোকের সমাগম হতো। অথবা এই মুক্তিসংগ্রাম নতুন ধরনের বলে বাংলার দামাল ছেলেরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অকুতোভয় বীরের মতো জীবনকে বাজি রেখে এমনিভাবে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল।

যখন কাজ শুরু করি তখন আমার কোনো অফিস বা দপ্তর ছিল না। মে মাসে সুন্দরবনের ঘটনার পর, আমি যখন হাসনাবাদ ফিরে আসি, তখন

আমার অধীনে কোনো সৈন্য ছিল না। সুতরাং আমার অফিস থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সাথে কথাবার্তার পর বুঝতে পারলাম যে, ভবিষ্যৎ আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন।

তৎসত্ত্বেও লোকে জানত যে, আমি ৯ নং সেক্টরের অধিনায়ক। কারণ, যদিও ৬ মে সুন্দরবনের সেই দুর্দশায় আমি সর্বস্ব হারিয়েছিলাম। কিন্তু তা বলে আমার এ নগণ্য চেহারাটার তো কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। সংকল্প থেকে একটু বিচ্যুত হইনি। ওই দুর্ঘটনায় আমি অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু হারিয়েছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার দৃঢ়প্রত্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি। মে মাসে বাংলাদেশের ভেতর থেকে হাজার হাজার যুবক ভারতে চলে আসতে লাগল। আমার মতো সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং-এর অফিস কক্ষে বসে বসে দিন কাটাচ্ছি। ছেলেরা আমাকে খুঁজে বের করে চারদিকে জড়ো হতে লাগল। সেখানেই আমি আমার ক্ষুদ্র সত্তা নিয়ে হাজির হয়েছি, সেখানেই ৯ নং সেক্টর গড়ে উঠেছে। ইছামতীর তীরে জরাজীর্ণ চায়ের দোকানে, কখনোবা মোটর লঞ্চের কোনো কেবিনে আমার দপ্তরগুলো বসেছে।

মে মাসের শেষ নাগাদ এমনিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একত্র হয়েছি। এরই মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে অনেক লোক এসে হাজির হলো। তাদের কারুর কাছেই টাকা-পয়সা বা সহায়-সম্বল বলতে কিছুই ছিল না। এ সমস্যা মোকাবিলা করা আমার পক্ষে একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠল নতুন যারা এসেছে, তাদের কারুর কাছে একটি কানাকড়িও নেই। গণপরিষদ সদস্য মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জুকে এসব নতুন লোকদের থাকা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে ভয়ানক কষ্ট ও মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল। মি, মঞ্জু ও আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। লোকজন আমার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগল যে, আমি যেন একজন গণপ্রতিনিধি। তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে আমি আমার সৈনিক জীবনের নিয়মকানুন ভুলে গেলাম। নিপীড়িত মানবতার কথা মনে হতেই ওই সব বিদেশি নিয়মকানুনের বাধাকে মনে হলো কৃত্রিম ও নিতান্ত হাস্যকর। জনগণের সাথে তাদেরই একজন ভাই হিসেবে মিশে গেলাম।

তখন থেকেই ওদের সাথে মেজর হিসেবে ব্যবহার করতে ঘৃণাবোধ করতাম। আমি আজ ওদেরই একান্ত আপনজন। আর এজন্যই শত দুঃখের মাঝেও এ কথা ভেবে মনে শান্তি পেতাম। যতই আমি ওদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে লাগলাম, হাজার সমস্যা বিরাট আকারে আমার সামনে এসে হাজির হলো।

হাসনাবাদেই আমার দপ্তর স্থাপন করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন দপ্তর বলতে শুধু আমাকেই বোঝাত। আমার কোনো কেরানি বা অফিস চালাবার মতো লোকজন কিছুই ছিল না। সুতরাং ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অফিস স্থাপন করার জন্য একটা জায়গার খোঁজ করতে লাগলাম এবং হাসনাবাদ থানার অপরদিকে একটা অখ্যাত দালানের উপরতলার একটা কক্ষে কোনো রকমে জায়গা করে নিলাম। দালানটা রাস্তার একপাশে। চারদিকে জলাশয়। সামনে একটা সাইনবোর্ড লটকানো। তাতে লেখা আছে "অফিস অব দি কো-অপারেটিভ সোসাইটি।" উপরতলার আর চারটি কক্ষে বিভিন্ন ধরনের লোকজন বাস করত। বেশিরভাগই দিনমজুর। আমার কক্ষটার ঠিক বাঁ দিকের কক্ষে সি পি আই এম-এর অফিস। এখানে বাংলাদেশের কিছু অলস রাজনীতিবিদ মাঝে মাঝে এসে আড্ডা জমাতেন। এবং আমার কাজের প্রতি কটাক্ষপাত করতেন, কি প্রতিকূল অবস্থান ভেতর আমাকে এখানে আশ্রয় নিতে হয়েছে তা ওই বিলাসী রাজনিতিবিদরা বুঝতে চাইতেন না।

যা হোক, তাদের ওসব অলস কথাবার্তার কান দেয়ার অবসর ছিল না আমার। রাতেই শুধু কক্ষে আসার প্রয়োজন হতো, নতুবা জিপে করে সারাদিন এদিক-ওদিক সাহায্যের আশায় ঘুরে বেড়াতাম। অধিক রাতে ফিরে এসে দেখতাম, আমার কক্ষে ঢুকবার রাস্তায় শরণার্থীরা অসহায়ভাবে বসে এখানে ওখানে পড়ে আছে। বর্ষার রাতে একটা নিরাপদ জায়গায় মাথা গোঁজার জন্য ওরা অত্যন্ত ব্যাকুল। এসব করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত দেহটাকে একটা কাঠের চৌকির উপর ছুড়ে দিতাম। চৌকিটা উন্মুক্ত। বিছানার কোনো চাদরও নেই। তবু কি প্রশান্তি! আমার চারদিকে নিপীড়িত মানবাত্মার অবর্ণনীয় দুঃখের পশরা বুকে চেপে মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুঃখ দেখে ভুলে গেলাম আমার পুরানো আরাম-আয়েসের সেই স্বপ্নিল দিনগুলো। আমার বিশ্বস্ত আদালী আলি আহমেদ বিছানা থেকে

হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে হারিকেন জ্বালাত এবং যা কিছু পাকানো থাকত তাই আমাকে খেতে দিত। ইতোমধ্যে আমার সেক্টরের ডাক্তার মি. শাহজাহান এসে আমার কক্ষে আশ্রয় নিলেন। যেকোনো দিক দিয়ে বিচার করলে এ কক্ষটা কোনো অফিস বা দপ্তর নয়। সুতরাং এটাকে সাময়িক বিরতির জন্য একটা বিশ্রাম কক্ষ বলা চলে। যারা সর্বস্ব খুইয়ে এখানে এসেছে, তাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য এখান থেকেই নির্দেশ দিতাম। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে টাকিতে তুলনামূলকভাবে একটা ভালো জায়গা পেয়ে আমি সেখানে চলে গেলাম। কিন্তু কলকাতা থেকে একজন সম্মানিত অতিথি আসায় আমি এখানে এক সপ্তাহের বেশি থাকতে পারিনি। হতাশ হয়ে স্কুল-শিক্ষক মি. শাহজাহানকে আর একটা জায়গা ঠিক করার জন্য অনুরোধ করলাম। অনেক কষ্টে সে আর একটা জায়গা ঠিক করল। মাসিক ভাড়া একশত টাকা । খালি পকেটে আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার আলি আহমেদ ও মোস্তফা নামে কলেজের একজন ছাত্র এসে যোগ দিল। মোস্তফাকে আমার এডজুটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করলাম। সে এখন আমার দফতরে সবচেয়ে কর্মব্যস্ত লোক। শিগগিরই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেরানি হাবিলদার আজাহারও এসে যোগ দিল। সে এসে পড়ায় একটা টাইপ রাইটার মেশিনের খুবই প্রয়োজন অনুভব করলাম। তার চঞ্চল আঙুলগুলো কলম বা পেন্সিলের চাইতে টাইপ মেশিনেই ভালো কাজ করত। তার যোগ্যতা সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় ছিল না, কিন্তু একটা টাইপ মেশিন জোগাড় করতে পারব কিনা এ সম্বন্ধে আমার নিজের উপরই বেশ সন্দেহ ছিল। ক্যাপ্টেন হুদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, সে বরিশাল থেকে আসার সময় একটা টাইপ রাইটার নিয়ে এসেছিল।

একটি একটি করে বেশ কয়েকজন কেরানি আমার অফিসে এসে জড় হলো। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আদালীর কাজও নিল। কেউবা কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগল। এভাবে ধীরে ধীরে অফিস গড়ে উঠল কোনোদিন চেয়ার, কোনোদিন। টেবিল, কোনোদিন বা 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' থেকে একটা টাইপ রাইটার মেশিন এবং অফিসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র জোগাড় করলাম।

মজার ব্যাপার হলো, আমার অপারেশন ক্যাম্পের ম্যাপ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে একটা কাঠের খাট টাঙিয়ে তার ওপর ম্যাপ আঁকা হয়েছিল। শিগগিরই এটা সরিয়ে বেশ ভালো একটা ব্ল্যাকবোর্ড আনা হলো। ভারতের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও আইনজ্ঞ মি. জে পি মিত্র আমার দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং এর দৈন্য দেখে এই ব্ল্যাকবোর্ডটি দান করেছিলেন।

নির্জন ও শূন্য এই দপ্তরটি দিন দিন লোকের আগমনে জীবন্ত হয়ে উঠল এবং দপ্তরের অবস্থান ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লোকে জানতে পারল। এমনকি অনেক যুবক এই দপ্তরের অবস্থান সম্বন্ধে আপনা থেকেই জেনেছিল।

সময়-অসময়ে অনেক যুবক এম এন এ ও এম পি এদের সুপারিশপত্র- 'মেজর জলিল একশো লোক পাঠালাম- ওদের দেখাশোনা করবেন ইত্যাদি আরো অনেক রকম অনুরোধ নিয়ে হাজির হতে লাগল। টাকা-পয়সা বা কোনো সংগতি ছাড়াওদের কীভাবে দেখাশোনা করব এজন্য গণপ্রতিনিধিদের কোনো বিবেচনা ছিল না। বরং দিন দিন লোকজন পাঠাতেই লাগল।

অনেক সময় মোস্তফা বিষণ্ন মনে এসে বলত, 'স্যার, এইমাত্র কলকাতা থেকে একশো ছেলে এসেছে। তারা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমি কি করব। আমাদের কিছু করা উচিত।'

রাতের মতো কোথাও ওদের থাকার বন্দোবস্ত করে ভোর বেলা কোনো যুবকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হতো। আমার দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। আর গণপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ছিল, ওপার থেকে পালিয়ে আসা ছিন্নমূল যুবকদের দেখাশোনা করা। মোটের উপর যুবকেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনার ভারও ছিল গণপ্রতিনিধিদের উপর। তবু ছেলেরা আমার দপ্তরে এসে জড় হতে লাগল। এর কারণ, আমার দপ্তর খুঁজে বের করা ওদের পক্ষে খুব সহজ ছিল। আমাকে দেখে যেন এই ক্ষুধার্ত মুখগুলো আশা ও সান্ত্বনার ইঙ্গিত খুঁজে পেত। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের প্রত্যাখ্যান করার মতো মানসিক শক্তি ছিল না আমার। আমার

এই মানসিক দুর্বলতা, আমার জন্য অনেক ঝামেলা নিয়ে আসত। কিন্তু এই নির্দোষ, সরল মুখচ্ছবিগুলো আমার বড় ভালো লাগত।

অফিসের সামনের কক্ষটা বেশ প্রশস্ত। এখানে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক বসতেন। তিনি একজন গণপরিষদ সদস্য। মোস্তফার পরিবর্তে তিনি আমার এডজুটেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। মোস্তফাকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কক্ষের অলিন্দে বাইরে থেকে আসা অনেক লোকজন অপেক্ষা করছিল। নভেম্বর পর্যন্ত আমার ছোট্ট দপ্তরটির কাজকর্ম এখানেই সম্পন্ন হতো। এরপর, টাকিতে আর একটা ভালো জায়গায় আমি চলে গেলাম। আমি ভাগ্যবান যে, এখানে নায়েব সুবেদার এ. মজিদ, এ বাশার (শহিদ), হাবিলদার এ রউফ, মুক্তিযোদ্ধা বড়ুয়া, আকবর ফরিদ, টিপু এবং মানস, মলয় রায় চৌধুরী: আরো অনেকের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলাম। আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, তার জন্য এই নিঃস্বার্থপরায়ণ কর্মীরা দিন-রাত খেটেছে। ওদের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের কথা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

নায়েব সুবেদার এ. মজিদ যশোরের লোক। অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে নিরাপত্তা বাহিনীরও একজন কুশলী। সেসবসময় একজন গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে আমার সাথে কাজ করেছে। এমনকি আমার অফিসের দায়িত্বভারও তার ওপর ন্যস্ত ছিল। শেষের দিকে সে মেয়েদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করেছিল। সমস্ত সমালোচনার মুখেও টাকিতে এই কেন্দ্রটি চালু করা হয়। অপর সবাই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। মোস্তফার মানবিকতা, প্রখর বুদ্ধি ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছিল সবচাইতে বেশি। জুলাই মাসের শেষ দিকে চার্লি সেক্টর আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসায় আমরা কতকটা নিয়মকানুনের ভেতরে এসে গেলাম। চার্লি সেক্টর আমাদের স্টেশনারি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করে। গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় সবাইকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। কারণ, যেসব গেরিলা আক্রমণের বিশদ বিবরণ, টাকা-পয়সার হিসাব ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চার্লি সেক্টরে রিপোর্ট পাঠাতে হতো।

অসীম ধৈর্য সহকারে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক এই বিরাট ঝামেলার মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর কাজে সাহায্য করেছিল নিঃস্বার্থ কর্মী মোস্তফা ও অফিসের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। আমার অবর্তমানে মোস্তফা ধীরস্থির চিত্তে সব সমস্যার সমাধান করত। সে আমাকে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। তবু অনেক সমস্যার সমাধান তার ক্ষমতার বাইরে থেকে যেত এবং শেষপর্যন্ত আমার কাঁধে এসে পড়ত। আমার চারদিকের এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মিত্রবাহিনীর পাশাপাশি কাজ করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। কেননা, কঠিন সামরিক নিয়ম অনুযায়ী মিত্রবাহিনী আমাদের কাছ থেকে সময়মত সঠিক ও নির্ভুল রিপোর্ট চাইত। কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করেছি। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি সবকিছু নির্ভুল ও দৃঢ়চিত্তে সমাধান করার জন্য।

যা হোক, সময়ের সাথে সাথে সবকিছুর উন্নতি হতে লাগল এবং এর সাথে অসংখ্য সমস্যাও এসে দেখা দিল। সবাই আমার দপ্তরের চারদিকে ভিড় জমাতে লাগল। যেন এটা একটা পবিত্র তীর্থভূমি। এক পর্যায়ে অপ্রয়োজনীয় বিরক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং নিরাপত্তার খাতিরে, যাদের কাজ আছে অথবা কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির সুপারিশ নিয়ে আসত, তাদেরকেই শুধু সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমরা ক্রমেই জটিলতর সমস্যায় জড়িয়ে পড়লাম। যে সমস্ত সান্ত্রীদের এই কাজ তদারকের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা অনেক সময় উপযুক্ত সাক্ষাৎপ্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করতে পারত না। এমনকি দু- একবার তারা গণপরিষদ সদস্যদের চিনতে না পেরে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এর ফলে দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার এখানেই শেষ হলো। নিরাপত্তা বা অন্য কোনো কারণের জন্যই হোক না কেন, সান্ত্রীরা গণপরিষদ সদস্যদের কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ করুক-এটা তাঁরা পছন্দ করতে পারলেন না। তারা এসব ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামান না। এরপর থেকে আমি সান্ত্রীদের বলে দিলাম, দরজা সর্বস্তরের লোকের জন্য খোলা রাখ। কেননা, জনপ্রতিনিধিরা যদি নির্বিবাদে আসতে পারেন, তাহলে জনগণই বা কোনো আসতে পারবে না।

জুন মাসের দিক দপ্তরটির মোটামুটি উন্নত হলো। শুধু ছিল না ব্যান্ড ও ড্রাম বাদক। আমার মতে, ৯নং সেক্টর বাংলার মুক্তিসংগ্রামে আজও একটা জীবন্ত ইতিহাস, আত্মত্যাগের মহিমায় চির জ্যোতির্মান। এখান থেকে মুক্তিসেনাদের শুধু সুষ্ঠু নির্দেশই দেয়া হতো না, নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বহারা মানুষকে সর্বপ্রকার সাহায্যও করা হতো। ছিন্নমূল হাজার হাজার মানুষের জন্য এই দপ্তরের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। সময় সময় যেসব সম্মানিত অতিথি এখানে আসতেন, তাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে কার্পণ্য করতাম না। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল মি. রুস্তমজীর সাথে এখানে আমার দেখা হয়নি। তিনি আমার অবর্তমানে এই দপ্তর একবার পরিদর্শন করতে আসেন এবং দুশো টাকা দান করে যান। তার বদান্যতার জন্য আজও কৃতজ্ঞ। সব সমস্যা, কষ্ট ও বিরক্তি সত্ত্বেও আমার সেই ব্যস্ত সদর দপ্তর-সেই তীর্থভূমিকে হারাবার দীনতা আমি যেন আজও তীব্রভাবে অনুভব করছি। আমরা সবাই একই সংসারের লোক। কত রক্ত ও ঘামের পথ পেরিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এই দপ্তর একটি প্রিয় তীর্থভূমি। এই গৌরব কারও একার নয়। এ গৌরব সবার। এ গৌরব বাংলাদেশের সেই সব দুঃসাহসিক সন্তানদের, যারা মুক্তি সংগ্রামের দুস্তর পথে নিঃসংশয়ে জীবনকে বাজি রেখে শত্রু হননে মেতে উঠেছিল। কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখার আগে-আসুন, আমরা একবার ওদের স্মরণে শ্রদ্ধাবনত হই!

মহামিলনের জলসায়

মুক্তিসংগ্রামের সেই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোর স্মৃতিচারণ আজও উদ্দীপনায় ভরপুর। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ভেতর সারাদেশটা ভয়ানকভাবে আন্দোলিত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র, শ্রমিক, জনতা ও সমস্ত প্রশাসনিকযন্ত্র অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। বর্বরতার হিংস্র- স্রোতে ভেসে যাচ্ছে বাংলার জনপদ। হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি সীমান্ত পার হয়ে চলে আসছে ভারতে। একটা দেশের ধ্বংসস্তূপের ভেতর নতুনের সূচনা নিজের চোখে অবলোকন করছি।

আমি বলছি না যে, আমি ভাগ্যমান। কেননা, এর ভেতর সুখের কিছু ছিল না। শুধু ছিল স্বাধীন বাংলার মোহনীয় স্বপ্ন। রক্তের সাগরে ডুব দিয়ে নতুন সূর্যটা উঠে আসছে। দুঃখের সাগর পেরিয়ে যে সামান্য আশার আলো প্রতিভাত হলো, তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল ঝড়ে বিধ্বস্ত হাজার হাজার ছিন্নমূল পরিবার। বাঁচার উদগ্র কামনায় উদ্দীপ্ত হয়ে অসংখ্য ম্রিয়মাণ মানবাত্মা আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু বুকে চেপে ধরে ছুটতে লাগল একটু শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে। ওদের সাথে এলো হাজার হাজার যুবক। ভীতসন্ত্রস্ত। কিন্তু মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত এসব ছেলেদের চোখেমুখে প্রতিহিংসার জ্বলন্ত আগুন।

জানতাম, বিকলাঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান ভীষণ ঝড়ের কবলে নিপতিত। সেই ঝড়ের উন্মত্ততায় হিংস্র থাবা বিস্তার করে ঘুমিয়ে আছে একটা বিরাটকায় দৈত্য যা ক্রমে ক্রমে গিলে ফেলবে ওই অবাঞ্ছিত শিশুটিকে। আর বিজয়িনীর বেশে বেরিয়ে আসবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সত্যি, এ ঘুমন্ত দৈত্যটা বেরিয়ে এসে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল সাড়ে সাত কোটি মানুষকে।

হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ঘোর উন্মত্ততায় টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল জনতার কাফেলা, গড়িয়ে এসে আশ্রয় নিতে লাগল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে।

ভারতের সীমান্তবর্তী শহরগুলো লোকে-লোকারণ্য। যাদের আমি মুক্তিসংগ্রামের সময় দেখেছি, তাদের কথাই শুধু বলব।

আপনাদের হয়তো মনে আছে যে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে আমি টাকিপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছিলাম। কেননা, আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে তখন বড় একটা কেউ ওয়াকিফহাল ছিল না। মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু হাসনাবাদে অভ্যর্থনা শিবির খোলার সাথে সাথে হাজার হাজার লোক এসে ভিড় জমাতে লাগল। এবং ওদের খাওয়া-দাওয়া ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা খুব কষ্টকর হয়ে উঠল।

অন্যান্য সেক্টরের কথা আমি ঠিক বলতে পারব না। সেখানে তদানীন্তন নিয়মিত বাহিনীর কিছু বাঙালি সৈন্য এবং ই. পি. আর-এর কিছু লোকজন ছিল। কিন্তু মে থেকে জুলাই পর্যন্ত আমার সেক্টরে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না।

এই তিন মাসের ভেতরে টাকিপুর ক্যাম্পের শরণার্থীদের এমনভাবে ভিড় জমতে লাগল যে, তাদের সামলাবার জন্য আরো তিনটা ক্যাম্প খুলতে হলো। প্রত্যেকটা ক্যাম্পে এক হাজারের উপর লোক। জুলাইয়ের মাঝামাঝি কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এসে পড়ায়, শত্রুদের উপর আবার আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে গেল। এবং যুবকেন্দ্রের দায়িত্ব থেকে আমি কিছুটা অব্যাহতি পেলাম। তারপর মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জু ও মি. আবদুল গফুর শরণার্থীদের দায়িত্ব পালনের জন্য রয়ে গেলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, জুলাই মাসে এই সমস্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিচালনার ভার ভারতের সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তর গ্রহণ করল। এবং এর তত্ত্বাবধানের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনজন ক্যাপ্টেনকে টাকিপুর পাঠিয়ে দেয়া হলো। এরা হলেন, ক্যাপ্টেন সিপাহা, ক্যাপ্টেন সিরোহী ও ক্যাপ্টেন পানহার। শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু তাদের একটা নির্ধারিত কোটা ছিল যে, কী পরিমাণ ছেলে একটা ক্যাম্পে তাদের জায়গা দেয়া এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিত যেখানেই খুশি সেখানেই ক্যাম্প খোলা খুব সহজসাধ্য ছিল না। ক্যাম্প খুলতে জমির মালিকের সম্মতি লাগত ও সরকারি কর্মকর্তাদের অনুমোদন প্রয়োজন হতো। ক্যাম্প একবার স্থাপন করতে পারলে, বাংলাদেশ সরকার ক্যাম্প পরিচালনার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুরি ও ভাতা

অনুমোদন করতেন। সুতরাং সকল রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতারা এসব যুবকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য বেশ সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। যদিও কাজের বেলায় আওয়ামী লীগারদের এতদিন দেখা যায়নি। কাজেই একসময় হাসি- খুশিতে ভরপুর এই ক্যাম্পগুলো রাজনীতিবিদদের আখড়ায় পরিণত হলো। জন্ম নিল জেলাভিত্তিক সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার মনোভাব। আমার মতে, এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি একটা নতুন জাতির অভ্যুদয়ের ঊষালগ্নে শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, মৃত্যু ও রক্তের আখরে লেখা ইতিহাসের দুর্গম পথ বেয়ে যে জাতির জন্ম, তার পক্ষে অত্যন্ত অশুভজনক।

রাজনৈতিক নেতারা এতটা ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন যে, আমি কোনো ক্যাম্প পরিদর্শন করি, ছেলেদের সামনে কোনো কথা বলি, এটা আদৌ পছন্দ করতেন না। তাই এখানেই আমি বা প্রথম আঘাত পেলাম। গুজবের উপর ভিত্তি করে তারা তাদের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে উঠল। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, যারা ক্যাম্পের ধুলিমাটির সাথে একাত্ম হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে, এমন সামান্য সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া, বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ নেতাই ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাধা করেই কলকাতার দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

তখন ক্যাম্পগুলোর দেখাশোনার ভার একমাত্র বিধাতার মর্জির ওপর নির্ভর করত। এমনি একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। কোনো একটা ক্যাম্পের লোকজন জনৈক গণপরিষদ সদস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওদের অভিযোগ, উক্ত গণপরিষদ সদস্য ক্যাম্পের জন্য বরাদ্দকৃত প্রচুর টাকা নিজে আত্মসাৎ করে ওদের উপোস করতে বাধ্য করেছেন। আমাকে নিজে সেখানে গিয়ে ছেলেদের শান্ত করতে হয়েছে। এ রকম আরো অনেক ঘটনার কথা আমার কানে এসে পৌঁছল। এর ভেতর কতটা সত্যতা আছে তা হয়তো আমি জানতে না পারি, কিন্তু এটা অবশ্য জানি যে, গুজবের ভেতর আংশিক হলেও কিছুটা সত্য থাকে।

যাহোক, নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আমার সেক্টরের বিশ মাইলের মধ্যে মোট নয়টা ক্যাম্প গড়ে উঠল। এ ক্যাম্পগুলো বশিরহাট মহকুমার টাকিপুর, আমলনী, টাকি, রোজীপুর, হাসনাবাদ, পিপা, টেরা, ধলচিটা এবং নৈহাটীতে অবস্থিত। এর প্রত্যেকটি ক্যাম্পে এক হাজারের ওপর

লোক থাকত। আইনসম্মতভাবে টাকিপুর, পিপা এবং টেট্রা ক্যাম্প হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার কর্তৃক যৌথভাবে স্বীকৃত।

এসব ক্যাম্পেরই ছেলেদের শুধু মাস দু'বার প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো। অন্যান্য ক্যাম্পের ছেলেদের রিজার্ভ হিসেবে গণ্য করা হতো। এবং প্রশিক্ষণের জন্য যেসব ছেলেদের পাঠাতে হতো, তাদের জায়গা পূরণ করার জন্য রিজার্ভ থেকে ছেলেদের আনা হতো। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই শ্লথ গতিতে চলতে লাগল। এবং ছেঁড়া তাঁবুতে, সিক্ত-বিছানায় ছেলেরা উদ্দেশ্যহীনভাবে আলস্যে দিন কাটাতে লাগল।

আমি জানতাম, এ ব্যাপারটা ছেলেদের কারুরই মনঃপুত নয়। তবুও ওদের সহ্য করতে হয়েছে। কেননা, সীমান্ত অতিক্রম করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ওরা ট্রেনিং নিতে এসেছে। যদিও তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব আমার ওপর ছিল, তবুও ওদের মনের এই বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র ওদের আমি দিয়েছি। ছেলেরা খুব উল্লসিত হয়ে এসব সাদরে গ্রহণ করেছে এবং আমাকে প্রাণঢালা স্বাগত জানিয়েছে। কেউ ওদের ট্রেনিং দিতে এলে, ছেলেরা অবর্ণনীয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত

অদ্ভুত ওদের দেশপ্রেম। বিস্ময়কর ওদের আত্মপ্রত্যয়। এসব ক্যাম্পে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আধ-পেটা খেয়েও বাংলার এই মুক্তিপাগল ছেলেদের চোখেমুখে আনন্দের অফুরন্ত প্রাচুর্য। কী অপরিসীম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাংলার মরণজয়ী এসব সূর্য সন্তানেরা। একবার মি. জে পি মিত্র পিপার যুবকেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন। তিনি বিভাগপূর্ব কালের খুলনার একজন নামকরা জমিদার। ছেলেদের হাঁটু পরিমাণ কাদায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি উক্তি করেছিলেন, বাঙালি শিগগিরই এক মহৎ জাতির জন্ম দিতে যাচ্ছে। কলকাতা পৌঁছে তিনি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ'র কাছেও এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করে চিঠি লিখেছিলেন-"হাঁটু পরিমাণ কাদাপানির ভেতর দিয়ে মহৎ একটা জাতি জন্ম নিচ্ছে।

ছেলেদের নৈতিক মনোবল দেখে তিনি এতটা বিচলিত হয়েছিলেন যে, বাংলার মুক্তিসংগ্রামের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি নিজেই বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ মি. মনুভাই ভিমানী ও ড. ত্রিগুণা সেনও মুক্তিসংগ্রামের সহায়ক হয়েছিলেন। ড. ত্রিগুণা সেন পিপা ক্যাম্প

পরিদর্শন করে ছেলেরা যে দুঃখদৈন্যের ভেতর দেশকে শত্রুমুক্ত করার সংকল্পে অটুট রয়েছে, তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ভারত সরকারের অন্যতম পদস্থ ব্যক্তি, যাকে সীমান্তের ক্যাম্পগুলোর দেখাশোনার ভার দেয়া হয়েছিল।

পরিদর্শন বইতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত যে, ছেলেরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিন কাটাচ্ছে। আমার মনে হয়, তুলনামূলকভাবে পূর্বাঞ্চলে ক্যাম্পগুলো সুসংগঠিত। কেননা, এ ক্যাম্পগুলো আগে থেকেই পরিকল্পনামাফিক তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু নিজে গড়ে ওঠা পশ্চিম সেক্টরের ক্যাম্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই ঔদাসীন্য বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছাকৃত, না অন্য কিছু তা আজও বিচার্য। যা হোক, আমার ধারণা, যুব কেন্দ্রগুলো স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের পক্ষে একটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল। এতে করে এদিক- ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা যুবকদের অন্তত একটা নিয়মের অধীনে এনে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত রাখা সম্ভব হতো। একটা বিষয়ে সংশয় দানা বেঁধে উঠল। সেটা হলো যে, শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থক, না, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকদেরও মুক্তিযুদ্ধে নিয়োগ করা হবে!

কিছুসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা সংকীর্ণতায় ভুগছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অনেকাংশে সঠিক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হলেন এবং মুজাফফর ও ভাসানীপন্থি ন্যাপ এবং কমরেড মনি সিং-এর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যৌথ পরিকল্পনা নিলেন। এতে শুধু দ্বিধা-সংকোচের মেঘই দূরীভূত হলো না, স্বাধীনতার সূর্য ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হলো। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, আওয়ামী লীগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে যদি একটা সমঝোতায় না আসত, তাহলে বাংলার সার্বিক মুক্তিসংগ্রামের প্রতি করা হতো চরম অবিচার। এবং আওয়াম লীগ একাকী কোনো পদক্ষেপের দুঃসাহসিকতার আশ্রয় নিলে তাদের জন্য নেমে আসত শোচনীয় বিপর্যয়। যুবকেন্দ্রে মুজিব বাহিনী গঠন করার আর একটা সংশয় দেখা দিল। মুজিব বাহিনী গঠনের জন্য উদ্যোক্তারা এবং ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সংস্থা ও ক্যাম্প থেকে ছেলেদের সংগ্রহ করত। ছেলেরা গোপনে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে যেত। প্রশিক্ষণের পর, উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে

মুজিব বাহিনীর ছেলেদের সেক্টর কমান্ডারদের অজান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হতো। একবার এমনও হলো যে, মুক্তিবাহিনীর হাতে মুজিব বাহিনীর লোকেরা ধরা পড়ল। কেননা, মুজিব বাহিনী সম্বন্ধে মুক্তিবাহিনীর কোনো ধারণাই ছিল না। এ দুঃখজনক ঘটনা আমাকে খুব আঘাত দিল। কারণ, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতাই চরম লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করতে পারে। ব্যক্তিগত কৌশল বা শক্তি গৌণ বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া পাশাপাশি আর একটা গোপন বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এতে ঈর্ষাকাতর হয়ে পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার আশঙ্কাই বেশি। তার ফলে ভালোবাসার বন্ধনে কখনো একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেরকম আমি আশঙ্কা করেছিলাম, শেষপর্যন্ত তাই ঘটল। ঘটতে বাধ্য। কেননা, মুক্তিবাহিনীর লোকদের বাইরে থেকে আমদানি করা হয়নি বা ভাড়া করা সৈন্যও নয়। মুজিব বাহিনীর লোকেরা যেভাবে দেশসেবা করার মতো পোষণ করত, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাও সেরকম একই অনুভূতি ও দেশপ্রেমের অংশীদার। কেউ কেউ বলতো, মুজিব বাহিনী একটি রাজনৈতিক শক্তি, যা জনগণকে শেখ মুজিবের আদর্শে দীক্ষিত করার ব্রত নিয়েছে। অপরপক্ষে, অন্য আর এক দল এই মতবাদ পোষণ করত যে, মুজিব বাহিনী হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী কিংবা অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের লোকেরা কথা বললে, এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটি তাদেরকে শায়েস্তা করবে। আমি বুঝতে পারি, তুমিই বা কে আর 'আমিই বা কে। সবাই আমরা বাঙালি। সবাই আমরা একই দুর্গম পথের যাত্রী। ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করার জন্য কেউ অস্ত্র তুলে নেয়নি। জাতির নেতা শেখ মুজিবের উদাত্ত আহ্বানে সবাই একসঙ্গে বাংলার জনগণের স্বপক্ষে অস্ত্র ধরেছে। তাহলে, এই মুজিব বাহিনী বা এত সব মতবিরোধ কেন? যারা মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, নেতাকে কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য জঙ্গি মিছিলে শরিক হয়েছে, তারা সবাই আমার কাছে এক ও অভিন্ন।

এছাড়া আমার কাছে মুক্তিসংগ্রামের আর কোনো অর্থ নেই। নেই কোনো বিশেষ স্বার্থ বা বিশেষ কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র-এছাড়া মুক্তিসংগ্রামে আমার অংশগ্রহণের আর

কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। আমি শুধু এটাই বলব, মুজিব বাহিনী গঠনের পিছনে যারা কাজ করেছেন, তারা আদৌ সৃজনশীল মনের পরিচয় দেননি। তারা সত্যিকারের প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন কিনা, তা ভবিষ্যতে বিচার্য। কেননা, যখন আমাদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, তখন আমাদের পরস্পর উল্টো পথে চলা উচিত হয়নি। যখন হাজার হাজার নিরীহ, নিরপরাধ অশ্রুসজন মুখের কথা আমার মনে পড়ে, তখন তাদের চরম আত্মত্যাগের তুলনায়, মুক্তিসংগ্রামে আমার যা কিছু দান, খুবই অকিঞ্চিতকর মনে হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বেশিরভাগই ছাত্র ও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে ওরা ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। একই দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ মহামিলনের এই দুর্জয় সন্তানরা আজ বাংলার চারদিকে ছড়িয়ে আছে। পরিতাপের বিষয়, আজ তারা অবহেলিত অপাংক্তেয় সরকারের কাছে উপেক্ষিত। এই গতিশীল শক্তিটাকে যদি ঠিকমত পরিচালনা করা যেত, তাহলে দেশের গঠনমূলক কাজ অসম্ভব রকমে ত্বরান্বিত হতো। এসব মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলা পুনর্গঠনে কার্যকরী সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে সব ব্যাপারেই তাদের উপেক্ষা করা হয়েছে। দেশ মুক্ত হওয়ার পর পরই জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করার উপকারিতা সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। শুধু করেনি এই নতুন দেশের অদৃশ্য শত্রুরা। এই মিলিশিয়া ক্যাম্প গঠনের পশ্চাতে যে উৎসাহ ও ঐক্যবোধ কাজ করেছিল, তা জাতিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে সার্বিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমাদের শত্রুরা এই ব্যবস্থার জাদুকরী প্রভাব সহজেই আঁচ করতে পারল এবং অচিরেই এই ব্যবস্থা ভেঙে দিল। কেন এই ব্যবস্থার সমাধি হলো? দেশের শত্রুরা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে, জাতীয় মিলিশিয়া ক্যাম্প দ্বিতীয় রক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে একদিন কাজ করবে। এবং আগে বা পরে এই ব্যবস্থার ফলে সমগ্র জাতি একদিন সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। শত্রুরা এটাকে তাদের লোভ ও স্বার্থের পরিপন্থি বলে মনে করল। পরিতাপের বিষয়, যদি আমরা একবার এই বিরাট যুব শক্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতাম, তাহলেই এ বিপর্যস্ত ভাগ্যের পরিবর্তন আনা সম্ভব হতো-সফল হতো বাঙালির ঐসব হাজার হাজার

দামাল ও আত্মত্যাগী যুবকদের আত্মাহুতি- যারা সেদিন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পূতঃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মিলিত হয়েছিল মহামিলনের জলসায়।

আতিথ্যের আড়ালে

মুক্তিসংগ্রাম আজ শেষ। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জীবনে যখন নেমে এলো দুঃখ-দুর্দশার ভয়াবহ অমানিশা-তখন যদি ভারত সরকার, তার সশস্ত্রবাহিনী ও তার জনগণ সহযোগিতার হাত না বাড়াতেন, তাহলে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মুক্তিসংগ্রামের গতিধারা হয়তো অন্যরকম হতো। আজকের এই স্বাধীনতার পরিবর্তে ভারতে আশ্রিত লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত ও ছিন্নমূল বাঙালির জীবনে হয়তো নেমে আসত হতাশার গভীর বেদনা।

আপাদমস্তক ভয়ে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, যখন মনে পড়ে বাংলার পবিত্র মাটিতে নারকীয় যজ্ঞের কুৎসিত বীভৎসতার কথা পৃথিবীর একটি শান্তিকামী দেশ আমাদের এ সোনার বাংলা। ভারত যদি আমাদের দুর্দিনে এগিয়ে না এসে, নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে শুধু ধ্বংসলীলা অবলোকন করত, তাহলে বাংলার ইতিহাস আজ হয়তো লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আর্তনাদে পর্যবসিত হতো। ভারত আমাদের সাহায্য করতে বাধ্য ছিল না। কারণ, যতটা জানি, আমাদের ওপর সামরিক হামলা হওয়ার আগে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের সাথে সে রকম কোনো চুক্তি করেনি। ভারতের সাথে এই মর্মে কোনো আলাপ-আলোচনা করার পরিকল্পনা ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মনে ছিল না। ঘটনা যে এতদূর গড়াবে- এটা কি নেতৃবৃন্দ পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারেননি? বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য কি তারা প্রস্তুত ছিলেন না? যখন আওয়ামী লীগের ৬ দফার মধ্যে স্বাধীনতার নাম-গন্ধও ছিল না, তখন এই স্বাধীনতার স্বপ্ন কে দেখেছিল? স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম কি কোনো আকস্মিক ঘটনা, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল? কোনটা সত্যি?

অপরপক্ষে আওয়ামী লীগ সরকার যদি স্বাধীনতার কথা পূর্বাহ্নে চিন্তা করে থাকে, তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কেনই বা যৌথ পরিকল্পনা নিল না? এতসব চিন্তার ভিড়ে জনগণের একথা ভাববার সংগত কারণ রয়েছে যে,

আওয়ামী নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট দূরদৃষ্টির অভাব ছিল এবং পুরাপুরি না হলেও অনেকাংশে বাংলাদেশের এ মর্মান্তিক গণহত্যার জন্য তারাই দায়ী।

বিভাগকালীন সময় থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরীভাব বিরাজ করছিল। তৎসত্ত্বেও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর যোগ্য ও মহান নেতৃত্বে ভারতের জনগণ মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসহায় বাঙালিদের সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্বের অভিশাপে ভুগলেও, শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েই ভারত এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দিয়েছিল। নিজেদের ক্ষতের জ্বালা ভুলে গিয়ে অপরের ক্ষত সারাতে এগিয়ে এসেছিল। মানবতা বিপর্যয়কারী ঝড়ের দাপটে উৎপাটিত লক্ষ লক্ষ ক্ষুব্ধ ব্যথিত, সর্বহারা বাঙালি যখন একটু ভরসা, একটু আশ্রয়ের আশায় ভারতের দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করছিল, তখন সমস্যাসংকুল দিনগুলোতে ভারতের জনগণ কখনো আত্ম-অহংকারে মত্ত অতিথি সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করেনি বা দান করার আনন্দে মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়নি।

ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের দুঃখ-দৈন্যে তাঁরাও সমান অংশীদার হয়েছিলেন। ভারতের অতিথিপরায়ণতার এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত কতটা নিঃস্বার্থ-ভারত ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণই তা নির্ধারণ করবে। তবে, বর্তমান মুহূর্তে এই সত্যটাই প্রকট যে, ভারত সাড়ে সাত কোটি লোকের একটা প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অসভ্য স্বৈরাচারী জালিমশাহীর ঘৃণ্য মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করেছিল। মানবতার জঘন্য শত্রু এই অসভ্য জালিমশাহী তার হিংস্র ও অমানুষিক ব্যবহারে নিজেদের শুধু কলঙ্কিতই করেনি, মহান ইসলামের শান্তি ও মৈত্রীর শাশ্বত বাণীকে করেছে অমর্যাদা, করেছে পদদলিত। আরব জাহানের মুসলমানরা, যাদের ইসলামের ধ্বজাধারী বলে মনে করা হয়, বাঙালির এই নিধনযজ্ঞে শুধু চোখ বুজেই ছিলেন না, এতটুকু সহানুভূতি প্রকাশেও ছিলেন নিষ্ক্রিয়। এমনকি, বাংলাদেশ যখন বাস্তব সত্য, তখন ইন্দোনেশিয়া ও ইরাক ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশই-বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে ইতস্তত করেছে। তা হলে সেই আমরা বলব যে, যে ইসলাম সম্বন্ধে জোর গলায় প্রচার করা হয়, ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মই ঐক্যের একমাত্র সেতুবন্ধন নয়।

যখন মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো অশিক্ষার কালো যবনিকার অন্তরালে বন্দি, শিক্ষার আলো বিবর্জিত সংকীর্ণ মনোভাব দ্বারা মানুষ যখন পরিচালিত, তখন থেকেই মানবগোষ্ঠীকে সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ইসলাম একটি ধর্মীয় মতবাদ। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আজকের মানবসমাজ কোনো কুসংস্কারকে সহজভাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। পক্ষান্তরে, মানুষ আজ সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে ধর্মের পুরানো কুসংস্কারের অক্টোপাস থেকে মানবসভ্যতাকে মুক্ত করার জন্য। একই সঙ্গে একটি বর্ধিষ্ণু বিবেকবান মানবগোষ্ঠী এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে মহৎ ও সুন্দর জীবনের অন্বেষায়। সে অন্বেষার উৎসমূল যেকোনো ধর্মই হোক না কেন, ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে কিন্তু ধর্মের সাথে বরাবর একটা অহি-নকুল সম্পর্ক। তবু আমার মতে, দুস্থ বাঙালিদের সাহায্য করে ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম মানবতার এই বিশ্বজনীন আবেদনকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সাত-মাস ভারতে থাকাকালীন আমি যা নিজে দেখেছি ও অনুভব করেছি, আপনাদের কাছে এখন তাই বলব।

২২ এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌছতেই ৭২ নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাপ্টেন পাণ্ডের ভদ্র ব্যবহার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমার বন্ধুত্বের পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি অন্তত প্রথম সাক্ষাতেই ভদ্রতা দেখিয়ে কিছুক্ষণ বিরত থাকতে পারতেন, কিন্তু না। অতি সহজেই তিনি আমাকে আপন করে নিলেন যেন এই আন্তরিকতা দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তার উপর একটা বোঝা হয়ে চেপেছিল- যেন এটা আমার অনেক দিনের পাওনা। এই ব্যাটেলিয়নের অন্যান্য সবার কাছে থেকেও একই আন্তরিকতা ও ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আগেই উল্লেখ করেছি যে, ৭২ নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক মি. মুখার্জী ৯ সেক্টরের প্রধান পরামর্শদাতা। মুখ্যত তাঁর প্রচেষ্টায়ই ইছামতী নদীর পূর্ব তীরে প্রথমে হাসনাবাদ ও পরে টাকিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। তাঁর সহ-অধিনায়ক, মেজর ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জিলার একজন শরণার্থী। আমার মতো একজন শরণার্থীর জন্য তার সহানুভূতির কোনো অভাব ছিল না। অস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানি ও অন্যান্য জিনিসপত্রের চাহিদা নিয়ে সময়ে-অসময়ে তাকে বিরক্ত করতাম। তার উপর যেন একটা দুঃস্বপ্ন

চাপিয়ে দিয়েছিলাম। তবুও সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী মেজর ছোবড়া আমার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করতেন।

ক্যাপ্টেন সরকারের চারিত্রিক মাধুর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অ্যাডজুটেন্ট আমি যেন তার সংসারের একজন আপনজন ও অকৃত্রিম বন্ধু। নিজের সমস্যায় অসংখ্যবার তাকে উত্ত্যক্ত করেছি। আমাকে সাহায্য করার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। আর একজন স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন উইলয়মস। তার অমায়িক ব্যবহার দ্বারা বর্ষণমুখর ঋতুতে আমাকে উত্তপ্ত রেখেছিলেন। মৌন স্বভাবের লোক হলেও মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মনে পড়ছে, সহকারী কমান্ডার; ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিংকে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করেছি। কেননা, তিনিই আমার সহজ নাগালের মধ্যে ছিলেন। অন্যান্য সহকারী কমান্ডার ক্যাপ্টেন নেগা, ক্যাপ্টেন সিধু ও ক্যাপ্টেন কে. বি সিং- সবাই আমার সাথে অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার করেছেন। যদিও আমার সাথে তাদের সংশ্রব কমই ছিল। সবচেয়ে চকমপ্রদ ব্যাপার হলো, এই সমস্ত অফিসারের পরিবারের লোকজন আমার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও স্নেহপ্রবণ ছিল। যেন আমি কত দিনের পরিচিত ব্যক্তি। যখনই আমি ব্যারাকপুরে যেতাম, তখনই আমাকে জোর করে খাবার টেবিলে বসাত এবং রণাঙ্গনের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করত।

অকস্মাৎ এই মধুর সম্পর্কের কথা স্মরণ করেই আমার মন চলে যেত সুদূর অতীতে, যখন আমি হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতার কথা শুনতাম, যখন কোনো মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে কোনো ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করা ছিল নিষেধ। তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু আজ সময়ের ঘূর্ণাবর্তে মানুষ অনেক শিক্ষা পেয়েছে। কবর দিয়েছে ঘুণে ধরা পুরানো ধর্মের গোঁড়ামি। জন্মগত অন্ধবিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানবগোষ্ঠী শিক্ষা পেয়েছে মানবতার মূল্যায়ন করতে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে আল্লাহ ও ধর্ম সম্বন্ধে আজ জিজ্ঞাসা আমাদের সামনে।

আমার মতে, এই জিজ্ঞাসাই একদিন সমস্ত ধর্মের বাধানিষেধের গণ্ডি ধুয়েমুছে জন্ম দেবে এক মহান মানবতার। এই আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রলয় কাণ্ডে আল্লাহ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন কি করবেন না এটা আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে আজ কোনো সন্দেহ নেই যে, মহান মানবতার বাণী আজ সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে প্রভাবিত

করছে। এবং এমন একদিন আসবে, যখন এই মহান মানবতাই ধর্মের চাইতে বেশি মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আসুন, এর মাঝখানে ভারতে যে ক'জন মানবতাবাদীর সংস্পর্শে এসেছি, তাদের বুঝতে চেষ্টা করি।

৭২নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর বদান্যতার পর আমাকে ব্রিগেডিয়ার কে কে তেওয়ারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি মিত্রবাহিনীর ৯নং পদাতিক ডিভিশনের ৩২নং ব্রিগেডের অধিনায়ক। পশ্চিমবঙ্গের মাছলান্দপুর নামক একটা জায়গায় তার সাথে জুলাই মাসে আমি প্রথম সাক্ষাৎ করি আমার সাহায্যকারী বাহিনী অধিনায়ক হিসেবে সব ব্যাপারে আমার সাথে তার ব্যবহার ছিল শান্ত ও সহযোগিতামূলক। বস্তুতপক্ষে ব্যবহারই মানুষের বড় পরিচয়। পূর্ব পাকিস্তানের (তদানীন্তন) এই সমস্ত পদের জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারের দুর্ব্যবহারে আমরা অতিষ্ঠ। পক্ষান্তরে, ভারতের একই পদের অফিসাররা তাদের অমায়িক ব্যবহারের জন্য আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। এরপর যার কথা বলব, তিনি হলেন ব্রিগেডিয়ার তেওয়ারীর প্রধান স্টাফ অফিসার মেজর বেদী। তিনি আমার সাহায্যের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। অনেক সময় তার সহৃদয় ব্যবহার ও ভদ্রতা দেখে নিজেকে বড় সংকুচিত মনে হতো। কেননা, আমি শুধু 'দানই'গ্রহণ করতাম। পরিবর্তে কিছুই দিতে পারতাম না।

চার্লি সেক্টরেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। এ সম্বন্ধে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমার মন আন্তরিক শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে যখন আমি ভারতের বেসামরিক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকাই। সবসময় তারা গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে, "মানুষের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে। জাতি এই দুর্যোগময় মুহূর্তে ভারত সরকার পর্যায়ে সুশৃঙ্খলভাবে কোনো সাহায্য পাঠাবার আগেই-এই সমস্ত বেসামরিক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য এগিয়ে এসেছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভারতের জনগণই সরকারি আদেশে অপেক্ষায় না থেকে সর্বপ্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামের এই 'সদ্যজাত শিশুটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সাহায্যই বাঁচিয়ে রেখেছিল। যদি তারা ক্ষিপ্রতার সাথে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করত, তাহলে

আমার ভাবতে ভয় হয় যে, এই সদ্যজাত শিশুটির দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকত না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও সহনশীলতা ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলার এই সংকট মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। আসলে বিষয়বস্তু থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি তখন ভারত সরকার ও মুক্তিসংগ্রাম, উভয়ের জন্যই অচিন্তনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও অসুবিধা সৃষ্টি করত। বস্তুতপক্ষে দুষ্কৃতকারীরা যে সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে, এই ভয়ে অনেক মহান ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রস্ত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক থাকায় জাতি ও বর্ণবৈষম্যের কুৎসিত কীটগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। নিজেদের সাধ্যমত যেভাবেই পারুক, ভারতের জনগণ শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়েছে। মে, জুন ও জুলাই মাসে যে কেউ এখানে এলে দেখতে পেত যে, সমস্ত বাড়িঘরের বারান্দা, স্কুলগৃহ ও কলেজ শরণার্থীদের ভিড়ে জনাকীর্ণ। এত ভিড় যে, বাড়ির মালিকের নিজস্ব প্রবেশ পথটাও প্রায় বন্ধ থাকত। কিন্তু শরণার্থীদের জন্য জনগণের সহানুভূতির অন্ত ছিল না। হাজার হাজার ছেলের গগনবিদারী চিৎকার হৈ চৈ ও ময়লার দুর্গন্ধে যুবকেন্দ্রগুলোর আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। কিন্তু ক্যাম্পের চারদিকে বসবাসকারী লোকজন কখনো কোনো অভিযোগ নিয়ে আসত না। 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা যে সৌজন্য দেখিয়েছিল–সত্যি তা স্মরণীয়।

মি. মনুভাই ভিমানী মুক্তিসংগ্রামে যে সাহায্য করেছেন, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে একটা বড় বই হয়ে যাবে। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত। দেখতে মি. উইনস্টন চার্চিলের মতো। বেসামরিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভেতর তাকেই ব্যস্ত-সমস্ত দেখেছি। আশ্চর্যজনক কর্মশক্তির অধিকারী ৩৩ পাউন্ড ওজনের এই ব্যক্তিটি ঢিলা পাজামা-শার্ট পরে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ রণাঙ্গনে উল্কার মতো ছুটে গিয়েছেন। তিনি শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করে ব্যক্তিগতভাবে তাদের সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতেন। এমনকি এত সব ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময়মত অফিসে যেতেন ও রীতিমত সংবাদপত্র পাঠ করতেন। কোনো ক্লান্তি অনুভব করতেন না। নিরামিষভোজী মি. মনুভাই ভিমানী বোম্বের একজন বড় ব্যবসায়ী। বলতে গেলে, বোম্বের একজন সর্বময় কর্তা। দীর্ঘদিন যাবত তিনি কলকাতায়

বসবাস করছেন। প্রাঞ্জল বাংলা বলতে পারেন। মুখমণ্ডলে এমন একটা মাধুর্য আছে যে, তার কথা শুনে অতি সহজেই শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায়। প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের নানান চাহিদার তালিকা দিয়ে আমি তাঁকে বিরক্ত করেছি এবং প্রত্যেকবারই তিনি আমাকে আমার বাণী শুনিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "ঠিক আছে পাঠিয়ে দেব।' বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি শিশুর মতো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছিলেন। মুক্তিসংগ্রামের কোনো সংবাদ শুনলে, উত্তেজনা ও আনন্দে তিনি ফেটে পড়তেন এবং বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনলে, অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন। তাঁর গভীর মানবতাবোধ ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আজও আমার মনে ভাস্বর হয়ে আছে। আর একজন ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করে আজ আমি গর্ববোধ করছি। তিনি ভারতের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার জে পি মিত্র। তিনি 'বিট্রেয়াল অব টিবেট' পুস্তকের লেখক। আগের অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে, সব ব্যাপারেই তার স্নেহধন্য আশীর্বাদ পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এছাড়াও নেতাজী ভবনের মি. বিজয় নাগ সময় সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দান করতেন। মি. স্যামুয়েল সরকার ও মি. পি কে রায়, আমার দু'জন 'প্রিয়তম বন্ধু। তাঁদের মহানুভবতা, ভদ্রতা ও আন্তরিক স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। যখনই আমি কোনো কিছুর জন্য দাবি করেছি, তখনি আমার দাবি তাঁরা অম্লান বদনে পূরণ করেছেন। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড় থেকে আরম্ভ করে খাবার দিয়ে পর্যন্ত তারা সাহায্য করেছেন। শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে কখনো কখনো মি. স্যামুয়েল সরকার কেঁদে ফেলতেন। এই সময় তিনি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুরিয়া শরণার্থী ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

মি. পি কে রায় বরিশাল জেলার অধিবাসী। দেশ ভাগ হওয়ার আগেই তিনি কলকাতা চলে যান। তিনি একজন বিপ্লবী। বর্তমানে একজন খাঁটি কংগ্রেসী এবং হাবড়া পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান। আমার সমস্যা নিয়ে তিনি সবসময় চিন্তান্বিত থাকতেন। তাঁর মহান বদান্যতা আমার মনে চিরদিন জাগরুক থাকবে। তাদের অকপট বন্ধুত্ব, উদার সাহায্য মানবতার অপার মহিমায় উজ্জ্বল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, পুনর্মিলনের আনন্দে প্রদীপ্ত তাঁদের ব্যবহার। তাঁদের অমায়িক ব্যবহার দেখে মনে হয়তো, বহুদিন পরে হারিয়ে যাওয়া ভাইকে আবার তারা বুকের কাছে ফিরে পেয়েছেন। তাদের

সাহায্য যদি শুধু টাকা-পয়সার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে মনের দিক দিয়ে আমরা এতটা পরস্পরের কাছে আসতে পারতাম না। কেননা, নৈতিক সাহায্য আর্থিক সাহায্যের চাইতে শতগুণ সুষমামণ্ডিত। বস্তুতপক্ষে, ভারতে এসে প্রথমবারের মতো আমি লক্ষ করলাম যে, পূর্বের আকাশ থেকে স্বাধীনতার এই লাল সূর্যটার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবদমান দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের শত্রুটার ওই জগদ্দল পাথরটা আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে বঙ্গোপসাগর, ভাত মহাসাগর ও আরব সাগরের মহামিলন তীর্থে মিলিত হবার দুর্বার আশায় ছুটে চলেছে। দেখতে পেলাম, বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করার জন্য পূর্ব দিগন্তে স্বাধীন রূপসী বাংলা প্রতীক্ষারতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, তার সরকার ও জনগণ অতিথিপরায়ণতার যে মহান আদর্শ স্থাপন করেছিল, তা ছেলেবেলায় বই পড়া আরবের অতিথিপরায়ণতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারত বন্ধুত্ব 3 অতিথিপরায়ণতার যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, সেই ভারতই দেশ মুক্ত হবার পর পরই রাতারাতি কি করে ভোল পাল্টে ফেলতে পারল। কেন ভারত কুমতলব নিয়ে আজ এমন নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

উপসংহারে বিনীতভাবে একথা বললে কি অন্যায় হবে যে, ভারত মুক্তিসংগ্রামের সময় যা কিছু করেছে; যা কিছু সাহায্য দিয়েছে, তা শুধু তার দীর্ঘদিনের লালিত গোপন ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য? যদিও পাকিস্তানের বর্বরতার কথা মনে হলে ঘৃণায় সারা অঙ্গ কুঁচকে ওঠে, তবু একথা আমি আজ না বলে পারছি না। কেননা, মুক্ত বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভারতের নগ্ন চেহারা দেখে আজ এ কথাই চিন্তা করছে। আজও আমরা সর্বান্তঃকরণে বন্ধুত্ব চাই, শত্রুতা চাই না।

সার্বভৌমত্ব আমাদের গর্ব। কিন্তু দাসত্ব নয়। কলঙ্কজনক নয়, সমমর্যাদার ভিত্তিতে সে বন্ধুত্ব হবে সম্মানজনক। মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে, ভারতের আতিথ্যের কথা স্মরণ করে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের পরে ভারতের কার্যকলাপের কথা মনে হলে, উগ্র উপনিবেশিকতার বিশ্রি গন্ধে আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান আজকের মুক্ত বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক শোষণ

থেকে আজও আমরা মুক্তি পাইনি। আতিথ্যের আড়ালে ভারতের পুঁজিবাদী সম্প্রসারণবাদ আরো উকটভাবে আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত। কিন্তু এ অবস্থা ন্যক্কারজনক। তাই আজ জনতা ধিক্কারে, ঘৃণায় সোচ্চার।

প্রিয় সাথিরা,

আমি কি এখানে কোনো বৈপরীত্য দোষে দোষী? যদি হয়ে থাকি, তাহলে মনে রাখবেন আমার তা করার অধিকার আছে। কেননা, একজন মিশ্র অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আপনাদের কাছে এ কাহিনি বর্ণনা করছি। ভারতের মাটিতে আমি একজন শরণার্থী, একজন মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলার একজন বন্দি হিসেবে আমার বক্তব্য রাখছি। যা আমি অনুভব করেছি এবং এখনো যা অনুভব করি, তাই আপনাদের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির সামনে তুলে ধরছি।

৮নং থিয়েটার রোড

সর্বাধিনায়কের আস্তানা ৮নং থিয়েটার রোড! বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কৌতুকপ্রদ ও অসংগতিপূর্ণ ব্যাপার টেনে আনতে হচ্ছে। তবে আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, এর মধ্যে ততটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তেমন কিছু নেই। ৮নং থিয়েটার রোডে আমাদের সর্বাধিনায়কের আস্তানা এখান থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়। থিয়েটারের কোনো পরিচালক সম্বন্ধে কোনো চমকপ্রদ ঘটনার বর্ণনা করব-এটা শোনার আশা নিয়ে যদি আপনারা বসে থাকেন তাহলে মারাত্মকভাবে নিরাশ হবেন। কেননা, এরকম কোনো কৌতূহলী পরিচালক বা মিলনাত্মক নাটকের অভিনেতা এখানে ছিল না। দয়া করে ধৈর্য ধরুন। এটা একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা! মুক্তিসংগ্রামের সদর দপ্তর ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মিলন কেন্দ্র। যদি এখন আপনারা প্রশ্ন করেন, এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থিয়েটার রোডে কেন? তাহলে আপনাদের কানে কানে চুপিসারে বলতে পারি, শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরে (!) কোনো গুণী লোক ক্ষণিকের জন্য যেন ভাবতে না পারেন যে, থিয়েটার রোডে ওই রকম একটা জনাকীর্ণ জায়গায় বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সদর দপ্তর কি করে থাকতে পারে।

ভেবে দেখুন, এই জায়গা নির্বাচনে কি যৌক্তিকতা আছে? এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ওই সমস্ত আত্মসর্বস্ব সঙ, যারা নিজেদের ভয়ানক তৎপর বলে মনে করত, তাদের মতলব গোপন রেখে জনগণের চোখে ধুলো দেয়া।

কলকাতার মাঝখানে থিয়েটার রোড। চৌরঙ্গীর প্রধান সড়ক থেকে একটা ছোট রাস্তা চলে গিয়েছে। নিউমার্কেট থেকে এগুলেই সামনে পড়বে। এর নামই থিয়েটার রোড। চৌরঙ্গী থেকে বাঁদিকে ঘুরে প্রায় তিনশো গজ হেঁটে গেলে ডান দিকে দেখা যাবে থিয়েটার রোডের ৮নং বাড়িটা। বাইরের দিকে দেয়ালে বেশ বড় করে লেখা; ৮ নম্বর। সামান্য উঁচু সবুজ রঙের একটা গেটও আছে। গেটে যারা পাহারায় থাকত তারা সবাই ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর লোক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকের যে ভিড় হতো- বলতে গেলে তাদের উপর পাহারাদারদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বস্তুতপক্ষে 'জয় বাংলা' থেকে যারা আসত, তাদের সবার জন্যই দরজা ছিল উন্মুক্ত। পাহারাদাররা জয় বাংলা ধ্বনি শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মোহবিষ্ট হয়ে যেত। যেখানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তর, সেটা হলো, বেশ প্রশস্ত দোতলা একটা দালান। পুরানো কায়দার। এখানে প্রবাসী সরকারের সব মন্ত্রীদের বসার সংকুলান অনায়াসেই করে নেয়া হয়েছে। নিচের তলার ডানদিকে সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম এ জি ওসমানী সাহেবের অফিস কক্ষ। তিনি একজন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিও বটে। বেশ রুচিসম্মতভাবে তিনি তিনটি কক্ষ পছন্দ করেছিলেন। এই তিনটির মধ্যে সামনেরটায় থাকত তাঁর এ ডি সি লেফটেন্যান্ট নূর। মাঝখানেরটা সর্বাধিনায়কের অফিস এবং শেষেরটা তার থাকার ঘর। বেশ পরিষ্কার, ছিমছাম! বাইরে আঙিনা এবং তার ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যারাক। এখানে সদর দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সাময়িকভাবে এই ব্যারাকের একটি কক্ষে অফিসার্স মেস চালু করা হয়। সদর দপ্তরে ছিলেন সর্বাধিনায়ক স্বয়ং এ ডি সি পরিকল্পনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার, প্রশাসনিক কাজ দেখাশোনার জন্য মেজর চৌধুরী ও মেডিক্যাল ইউনিটের দায়িত্বে ডা. টি হোসেন। লে. কর্নেল এ রব (বর্তমানে অনারারি মেজর জেনারেল), পূর্ব সেক্টরে আগরতলায় ব্যস্ত থাকতেন। পরে সেপ্টেম্বর মাসে ৮ নং সেক্টরের

অধিনায়ক মেজর উসমান চৌধুরীকে কোয়ার্টার মাস্টারের কাজটাও দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে সহকারী চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করা হয়। তাঁর অধীনে মুষ্টিমেয় এই ক'জন অফিসার। সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করার জন্য খুব অপ্রতুল। এমনকি আকাঙ্ক্ষিত সংখ্যার চাইতেও কম। বাংলাদেশের ভেতরে এবং সারা সীমান্ত জুড়ে মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা ও সুষ্ঠু নির্দেশ দেয়া বেশ দুরূহ হয়ে উঠল আমি অবশ্যই বলব, আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়ে এটা সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তর হলেও, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একে প্রকৃত হেড কোয়ার্টার বলা যেতে পারে না। কেননা, অক্টোবর মাসের আগ পর্যন্ত এখান থেকে বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের কাছে সংবাদ সরবরাহ করার কোনো সহজ উপায় ছিল না। অক্টোবর মাসেই কিছু ওয়্যারলেস সেট সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল এবং তার কার্যকারিতার উপর মোটেই নির্ভর করা যেত না। যদিও সর্বাধিনায়ক সাহেব খুব সহজেই অফিসার সংখ্যা বাড়াতে পারতেন, কিন্তু অগ্রবর্তী এলাকা থেকে তাদের সরিয়ে আনাটা তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন যে, সবাই যুদ্ধ করুক। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, সদর দপ্তরের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। সদর দপ্তরই সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র । আমাদের সর্বাধিনায়ক, যিনি ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে ডেপুটি ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি একটা সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কী কী জিনিসের দরকার তা যে জানতেন না, তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপার তিনি দুটো প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। একটা হলো- কুশলী সামরিক অফিসারের অত্যন্ত অভাব। যাও না দু-একজন ছিল, তারা রণাঙ্গনে ব্যস্ত। দ্বিতীয়ত, তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে একাধারে একজন পূর্ণাঙ্গ কর্নেল, অপরদিকে মিলিটারি অপারেশনের ডিপুটি ডাইরেক্টর। কিন্তু এখানে তিনি মুক্তিসংগ্রামের অধিনায়ক, আবার অপরদিকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য। এই দ্বিমুখী দায়িত্বের বোঝা তার মতো একজন পুরানো কেতাদুরস্ত সৈনিকের পক্ষে বহন করা চাট্টিখানি কথা নয়।

তাছাড়া মাত্র জুলাই মাসে তিনি সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। এর আগে বসা বা পরিকল্পনা করার মতো কোনো জায়গাও ছিল না। একজন অফিসার, যার কোনো সৈন্যবাহিনী নেই-নেই থাকা-খাওয়ার মতো সংস্থান, তার সুবিধা- অসুবিধার কথা একজন সাধারণ সৈনিকের চাইতে একজন সর্বাধিনায়কই ভালো করে অনুধাবন করতে পারেন। এই দুরূহ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কর্নেল এম এ জি ওসমানী সাহেব কখনো প্রস্তুত ছিলেন না। এই দায়িত্বের বোঝাটা ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ প্রবাসী মন্ত্রিসভা জোর করে তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল। কেননা, যদিও অবসরপ্রাপ্ত, তবু তিনি তো ছিলেন বাঙালির ভেতর সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার।

জনশ্রুতি এরূপ যে, পাকিস্তান সামরিক জান্তা নিরীহ বাঙালিদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালালে, কী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে-এ ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু নির্দেশনার জন্য তৎকালীন পাক-সামরিক বাহিনীতে কর্মরত কয়েকজন তরুণ বাঙালি অফিসার বেশ কয়েকবার কর্নেল ওসমানী সাহেবের শরণাপন্ন হয়। কেননা মার্চের প্রথম সপ্তাহে যখন পাক-সামরিক চক্র বাঙালি অফিসারদের এলোপাতাড়িভাবে এদিক-ওদিক বদলি করা শুরু করল, তখনই এসব তরুণ অফিসাররা পশ্চিমাদের গভীর দুরভিসন্ধির বিষয় আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কর্নেল ওসমানী সাহেব এই তরুণ অফিসারদের কথায় কোনো কর্ণপাত তো করলেনই না, উল্টো তাদের এই বলে ঠান্ডা করে দিলেন, তোমরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড় না। এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদরাই চিন্তা করবেন। সংকটময় মুহূর্তে এ রকম একটা উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ অফিসারদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিল।

তারা চেয়েছিল, সমস্ত বাঙালি সৈন্যকে সংগঠিত করে শত্রুর অতর্কিত হামলার মোকাবিলা করবে। এটা কি এজন্য যে, কর্নেল ওসমানী সাহেব ঘটনার গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করতে না পেরে, সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কাকে এভাবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাক-সামরিক বাহিনীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কর্নেলের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হলো? যদি ধরে নেয়া যায় যে, আগেভাগেই কর্নেল সাহেব বিপদের আশঙ্কা করতে পেরেছিলেন এবং তদনুযায়ী শেখ মুজিবের তে পরিকল্পনাও পেশ

করেছিলেন। তাহলে প্রশ্ন জাগে-কেন শেখ সাহেব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মতি দিলেন না । আপাতত এ প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে।

প্রথমতঃ শেখ সাহেব হয়তো সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতি ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ একজন চতুর রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ সাহেব হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙালি সামরিক বাহিনী, পাক-সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করলে, রাজনৈতিক অঙ্গনে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। অথবা, বাঙালি সামরিক অফিসাররা পাক সরকারের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে, সংগ্রামোত্তর বাংলাদেশ দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের ভাগ্য কী হবে-একজন ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে পূর্বাহ্নেই হয়তো তিনি তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই শেখ সাহেব তাঁর দলীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি নেননি। কিন্তু আমার মনে হয়, তার দেশপ্রেম সমস্ত দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে। ঢাকা রেসকোর্সে ৭ মার্চের তার ঐতিহাসিক ভাষণ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তর জয় করেছিল।

যা হোক, তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, পাক-সামরিক জান্তার মোকাবিলা করার জন্য কর্নেল ওসমানী সাহেবের আদৌ কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এই প্রসঙ্গে নিঃসংশয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, একমাত্র মেজর জিয়াই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনী গঠন এবং শেখ সাহেবের নির্দেশমত বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জাতির কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যা হোক, পাক-সামরিক চক্র নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ওসমানী সাহেব তার কয়েকজন সহকর্মীকে সাথে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আগরতলা চলে যান। লোকে বলে, তিনি নাকি তাঁর সহকর্মীদের অনুরোধ করেছিলেন যে, তারা যেন তাঁকে ভারতীয় কোনো সামরিক বা বেসামরিক অফিসারের কাছে কর্নেল ওসমানী হিসেবে পরিচয় না দেয়। কেননা, তিনি একজন নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য হিসেবেই পরিচিত হতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু একজন পার্লামেন্টারিয়ানের মতো হাব-ভাব দেখিয়ে তিনি তাঁর আসল চেহারা বেশিদিন ঢেকে রাখতে পারলেন না। কেননা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার অল্প দিনের ভেতরই তাকে মি. ওসমানী নয়, কর্নেল ওসমানী হিসেবে ধরে

ফেললেন। বিভাগ-পূর্বকালে এসব ব্রিগেডিয়ার ভারতের দেরাদুন মিলিটারি একাডেমিতে তাঁর সাথে একত্রে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। কতকটা বাধ্য ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে তাকে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ইন-চীফ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। অপ্রস্তুতভাবে এ দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে তিনি খুবই বেসামাল হয়ে পড়লেন। যখন তার নিজের উপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তখন মুক্তি-সংগ্রামীরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এসব প্রতিকূল অবস্থায় যে কেউই কমান্ডার-ইন-চীফের মতো দায়িত্ব গ্রহণ করত তাকেই কর্নেল উসমানী সাহেবের মতো অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো। তবুও কর্নেল ওসমানী সাহেবের অবস্থা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো ছিল। কেননা, তিনি অন্তত বেশকিছুসংখ্যক তরুণ বাঙালি অফিসারের শ্রদ্ধার পাত্র দিলেন। তরুণ অফিসারদের এ ভালোবাসাই অনেক সমস্যা সমাধানে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের সাথে সাক্ষাৎ করে ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন এবং কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে সদর দপ্তর স্থাপন করতে সমর্থ হলেন। যখন কমান্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমুদয় কার্যকলাপ সীমান্তের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ, তখন ৮নং থিয়েটার রোডে সদর দপ্তর স্থাপন করা কি ঠিক হয়েছিল? পাঠকদের কাছে এর উত্তরের ভার রইল। তাছাড়া মন্ত্রিসভার কর্মদপ্তরের সঙ্গে এবং কলকাতার মাঝখানে সশস্ত্রবাহিনীর এ দপ্তর থাকায় কর্নেল ওসমানী সাহেবের কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাহাজানি, নারী নির্যাতন ও নানা রকমের অভিযোগসংবলিত দরখাস্ত পেশ করে বেসামরিক লোকজন বিচার প্রার্থনা করত।

তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। যেখানে এই দুঃখজনক ব্যাপার ঘটত, সেখানকার সেক্টর কমান্ডারদের ডেকে এনে তিনি বলতেন, "দেখুন, এটা বড় মর্মান্তিক ব্যাপার। আমি এটা আদৌ পছন্দ করি না।

তদন্ত করে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দিন। অথবা ওদেরকে ডেকে সামরিক আদালতে বিচার করুন।'

জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে যখন সারাদেশ বিপর্যয়ের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত, হতাশায় মুহ্যমান-তখন কোনো রকম আনুষ্ঠানিক তদন্ত কার্য পরিচালনা করা বা দেশের অভ্যন্তর থেকে সেক্টর কমান্ডারদের ডেকে আনা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, অসম্ভবও বটে। কেননা সেক্টর কমান্ডাররা নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর লোক নয় এবং বাহকের মারফত কোনো নির্দেশ পাঠালে তারা তা মানতে বাধ্য নয়। এসব হাজার সমস্যার ভিড়ে সর্বাধিনায়ক সাহেব বেশিরভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকতেন এবং সেক্টর কমান্ডাররা যেসব সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসত, সেদিকে নজর দেয়ার খুব কমই সময় পেতেন। সুতরাং আমাদের সমস্যাবলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে অমীমাংসিতই থেকে যেত।

আমার মনে হয়, এসব সমস্যা অতি সহজেই এড়ানো সম্ভব হতো যদি সরকারি কার্যকলাপ থেকে দূরে সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি কোথাও সদর দপ্তর স্থাপন করা হতো। কিন্তু সম্ভবত তিনি তা পারেননি।

মনে হয় তিনি নিজের ইচ্ছেমত কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারত। কেননা প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মি. তাজউদ্দীন আহমদের ওপর দেশরক্ষা দপ্তরের ভার ছিল এবং সর্বাধিনায়ক সাহেব তার প্রত্যেকটি কাজের এনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়ী ছিলেন। পরে, জুলাই মাসে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার লে. কর্নেল দাসের সহযোগিতা পেয়ে কর্নেল ওসমানী সাহেব অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এর ফলে, তিনি সেই গতানুগতিক পুরানো পাকিস্তানি কায়দায় যুদ্ধ পরিকল্পনার খসড়া তৈরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেন। তিনি অবশ্য খসড়া পরিকল্পনায় অনেক ইংরেজি শব্দ সংযোজন করলেন।

কিন্তু বর্ষা ঋতুতে একটি গণযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য তার সেই শব্দবহুল কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, আমি ঠিক বলতে পারব না। প্রধান সমস্যা হলো যে, সব ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতেন এবং সংকট নিরসনে জন্য কোনো আপস-মীমাংসার পথে এগুতে পারতেন না। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্যই তিনি বেশি সময় অতিবাহিত করতেন। মোটকথা, একজন যোগ্য

পরিচালকের চাইতে উভয়ের মধ্যে একজন সমন্বয়কারী ব্যক্তি হিসেবেই তিনি বেশি কাজ করেছেন।

নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ও সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তিনি বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে অস্বাভাবিকভাবে খেই হারিয়ে ফেলতেন এবং অনেক সময় আমার কাছে তাঁর সামর্থ্যের কথা জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। কিন্তু সর্বাধিনায়কের আস্তানার বাইরে যেসব লোকজন সর্বদা বিচরণ করত, তারা কারও পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা করত না। আজ হয়তো ঢাকার কোনো সুসজ্জিত অট্টালিকা বসে কর্নেল ওসমানী সাহেব আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে তার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গোঁফে তা দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম-যা তাকে জেনারেল পদে উন্নীত হবার সৌভাগ এনে দিয়েছিল তার উদ্দেশ্য হয়তো কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে অনেক কথা প্রকাশ করা এখানে সম্ভব হলো না। সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্যের মণিহার পরে সর্বাধিনায়ক সাহেব আজ আওয়ামী লীগ সরকারের সম্মানিত মন্ত্রী। কিন্তু দেশের দিকে দৃষ্টি বুলালে আমরা কি দেখতে পাই। দেখতে পাই, হাজার হাজার অন্ধ পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা এতটুকু সাহায্য ও যত্নের অভাবে দেশের আনাচে-কানাচে অবহেলিত অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আমিও তাদেরই মধ্যে একজন হতভাগ্য যে, আজ যশোর ক্যান্টনমেন্টের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বসে নতুন বছরের আগমণী শুনছি।

স্বাধীন বাংলার মাটিতে নতুন বছরের ১ বৈশাখে সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। ১লা বৈশাখ! কী উদ্দীপনাময়ী তুমি! এ ১লা বৈশাখে আমাদের বিকলাঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনধারা আবার বাঙময় হয়ে উঠুক শান্তি ও সমৃদ্ধির ললিত রসে। ভরে উঠুক সবার অন্তর আশা-উদ্দীপনার নতুন আনন্দে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ফলগুধারায় অবগাহন করে আমরা যেন কলুষমুক্ত হতে পারি বছরের এই নতুন দিনটির সূর্যালোকে।

আসুন, আমরা আবার ৮নং থিয়েটার রোডে চলে যাই। এখানে কাজ করত মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সেক্রেটারি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের মোসাহেবরা। বস্তুতপক্ষে, ১০ এপ্রিল, কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের নিকট

ভবের পাড়া আম্রকাননে, বিপ্লবী সরকার গঠন হবার পর থেকে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মুজিবনগরে থেকেই কার্য পরিচালনার কথা। কিন্তু কতকগুলো অনিবার্য কারণবশত এটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এজন্য তারা মুজিবনগরকে পিছনে ফেলে রেখে আসেনি। যেখানেই তারা গেছে, সেখানে মুজিবনগরের ভাবমূর্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বস্তুতপক্ষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ভবের পাড়া আম্রকাননেই শুধু প্রথমবারের মতো মুজিবনগরের প্রতিষ্ঠা হয়নি। ২৫ মার্চের কালো রাতেই বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রতিটি অন্তরে মুজিবনগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অন্যথায়, বাংলার ওপর দিয়ে নির্যাতনের যে ঝড় বয়ে গেছে, সেই ঝড়ের দাপটেই ভবের পাড়ার আম্রকাননের মুজিবনগর হারিয়ে যেত। সোজা কথায় বলতে পারা যায় যে, শেখ মুজিবের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা মুজিবনগরের প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রী হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছিল মাত্র। সমস্ত লোক, এমনকি ভারতীয়দের কাছেও এই দুটো নাম মুজিবনগর ও জয় বাংলা এত জনপ্রিয় ছিল যে, গোটা ভারতবর্ষই আমার কাছে মুজিবনগর বলে মনে হতো।

কলকাতা ও দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সব সরকারি চিঠিপত্রে মুজিবনগর লেখা থাকত। বিদেশি পর্যটকরা অনেক সময় সংকটে পড়ে যেতেন। ৮নং থিয়েটার রোডকে ৮নং থিয়েটার রোড হিসেবে জেনেও তাদেরকে এটা মুজিবনগর বলেই গ্রহণ করতে হতো। কোনো উপায় ছিল না। বিকল্প কোনো পন্থাও নেই। কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, সাময়িকভাবে ৮ নং থিয়েটার রোডই মুজিবনগর। ওসব সম্বন্ধে আজ আর কোনো বিতর্ক নয়।

৮নং থিয়েটার রোডের ভেতরের ঘটনাবলি অত্যন্ত দুঃখজনক ও হাস্যকর। এসব ব্যাপার একটা বিপ্লবী সরকারের অন্তঃসারশূন্যতার দিকে ইঙ্গিত করে জাঁকজমক সরকারের বিভিন্ন অফিসগুলো শোভাবর্ধন করতে লাগল। শুরু হলো বিভিন্ন রং-বেরংয়ের ফাইলপত্রের আনাগোনা। অফিসের সময় নির্ধারিত হলো এবং আরো অনেক রকম আনুষ্ঠানিকতা দেখে মনে হলো, আমাদের বিপ্লবী সরকার যেন স্থায়ীভাবে এখানে আসন পেতেছে। ওদিকে

বাইরে জনতা ভিড় করে বসে। আছে চাকরির আশায়। অত্যন্ত হাসির ব্যাপার যে, এ ব্যাপারে একটা এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জও তৎপর ছিল। ৮নং থিয়েটার রোডে কেউ চাকরি সংস্থান করতে না পারলে, দৌড়ে যেত পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশের হাই কমিশনার মি. হোসেন আলীর কাছে। আজ যাঁরা সাহসী মুক্তিযোদ্ধা বলে গর্ব করে থাকেন, তাদের অনেককেই তখন দেখেছি থিয়েটার রোড ও পার্ক সার্কাস রোডে আরাম-আয়াসে বিশ্রাম নিতে। তাদের দেশে কোনো কোনো সময় আবার মনে হতো, মুক্তিসংগ্রাম ছেড়ে আমিও এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একটি ভারী গোছের চাকরি নিয়ে নেব নাকি! কিন্তু সংখ্যক সি এস পি অফিসারের জন্য আমার খুবই দুঃখ হতো! অফিসের ভেতর কেরানিদের সাথে বেচারা সি এস পি সাহেবরা একতে কাজ করতে বসে নিজেদেরকে খুবই সংকুচিত করে রাখতেন। এই বিদঘুটে মুক্তি সংগ্রামটার জন্যই না যতসব ঝামেলা তাদের সইতে হচ্ছে!

কিন্তু উপায় নেই। আমার মনে হয়, বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মি. তাজউদ্দীন আহমেদ কিছুটা শক্ত বাস্তববাদী ছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সবাই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেয়নি। সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অনেক গণ্যমান্য বেসামরিক লোকের সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ছিন্নমূল হাজার হাজার লোককে অহেতুক ঝুলিয়ে রাখতেন আশা-নিরাশার সংশয়-দোলায়।

যখন মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ কাজের চাপে ভয়ানক রকম ব্যস্ত থাকতেন, তখন নির্বাচিত অন্যান্য গণপরিষদ সদস্যরা কলকাতার বিলাসবহুল হোটেলে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে অলসভাবে সময় কাটাতেন। অবশ্য কিছুসংখ্যক পরিষদ সদস্য বিভিন্ন ক্যাম্পের শরণার্থীদের সমস্যাদি নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তাদে জন্য আমার শ্রদ্ধা আছে।

জনাকীর্ণ শিয়ালদাহ রোডে অবস্থিত শান্তি নিকেতন ও শ্রী নিকেতন হোটেলদ্বয়ে মালিকদের সহৃদয়তা ও ভদ্রতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তারা উদার হৃদয়ে আমাদের অনেক নির্বাচিত সদস্যকে সাহায্য ও স্থায়ীভাবে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

মুক্তিসংগ্রামের সময় হোটেল শান্তি নিকেতন রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ভয়ান কর্মব্যস্ত ছিল। কেননা, যেসব জনদরদি (!) পরিষদ সদস্য ছিন্নমূল

পরিবারে। লোকজনদের সুখে-দুঃখে একাত্ম হয়ে বর্ষার জলে সীমান্ত এলাকায় অবর্ণনীয় কষ্টের ভাগিদার হয়েছিলেন বলে দাবি করতেন, বস্তুতপক্ষে সেসব মহোদয়দের সর্বক্ষণই কাটত এই হোটেলদ্বয়ের নিরাপদ কক্ষে বসে অলস গল্প গুজবে। আমি কোনো কোনো পরিষদ সদস্যকে ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করতে শুনেছি, আমরা কী করতে পারি? যখন আমরা নিজেরাই কপর্দকহীন তখন কীভাবে শরণার্থীদের সাহায্য করতে পারি? হ্যাঁ, তাদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হতো-কিন্তু বিবেকের খোচা ও এই অপ্রিয় সত্যটাকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না যে, তাহলে পরিষদ সদস্যরা কীভাবে কলকাতার বিলাসবহুল হোটেলে থাকার মতো মানসিকতা অর্জন করতে পারল? মুক্তিসংগ্রামের সময় এই হোটেলগুলো পরিষদ সদস্যদের জন্য ছিল আত্মগোপনের সুদৃঢ় বাংকার এবং ক্ষমতা দখলের কুৎসিত আড্ডা।

আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রাম বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কেননা, এখানে যুদ্ধপূর্বকালেই জনগণ নির্বাচিত সদস্যদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এবং এই দুর্যোগময় মুহূর্তে নির্বাচিত সদস্যরা জনগণের কাছে এসে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। অর্থই সাহায্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। হৃদয়ের উষ্ণতা ও অন্তরের সহানুভূতিকেই একজন দুঃখী মানুষ মূল্যবান বলে মনে করে। একজন দুঃখী মানুষ টাকার অভাবে ততটা হতোদ্যম হয় না, যতটা ভীত হয় মানসিক বৈকল্যে।

আমার মনে হয়, শরণার্থী শিবির ও যুবকেন্দ্রগুলোই রাজনৈতিক নেতাদের কাজের জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। এখানেই তারা সহায়-সম্বলহীন দুঃখী মানুষের সঙ্গে এক সাথে থেকে, তাদের দুঃখ-দৈন্যের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারতেন। হোটেলে থেকে এটা সম্ভব নয়। মাটির মানুষ বুঝতে হলে মাটির সাথে আত্মার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। হোটেলে থেকে পরিষদ সদস্যরা পরস্পরকে দোষারোপ, যারা কাজ করত তাদের অহেতুক সমালোচনা ও বিশ্রী কোন্দলে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলতেন। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার একটা বলিষ্ঠ প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যার প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত, তারা ছাড়া বাকি সব পরিষদ সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য বিভিন্ন যুবকেন্দ্রে ও শরণার্থী শিবিরে চলে যেতে হবে। কিন্তু সরকারেরই এই পদক্ষেপ খুব

কার্যকরী হতে পারল না। কেননা, পরিষদ সদস্যরা তখন হোটেল-কক্ষে তাদের অবস্থানটা বেশ সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। অকৃতজ্ঞ বর্ষা হোটেল কক্ষের সেই অবস্থানটা কিছুতেই নাড়াতে পারল না।

সবচেয়ে যেটা মর্মান্তিক সেটা হলো, পরিষদ সদস্যদের মুখে চিন্তাভাবনার কোনো চিহ্ন ছিল না। সদস্যরা মনে করত যে, দেশে কোনো যুদ্ধ নেই। এবং বসে বসে শুধু দিন গুনত, কবে তক্ ভারতীয়রা যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আর এই যুদ্ধই হচ্ছে সদস্যদের কাছে প্রকৃত যুদ্ধ। কোনো মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু তাদের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। এসব মৃত্যু, তাদের কাছে যেন গল্পের মতো লাগত। প্রবাসী সরকারের কাছে এ রকম একটা প্রতিকূল অবস্থায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া প্রশংসার দাবি রাখে। পূর্বাহ্নে এ রকম পর্বত প্রমাণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এজন্য বাংলাদেশ সরকার মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। শূন্য হাতে বিদেশের মাটিতে যেকোনো যোগ্য সরকারই এ রকম অবস্থায় বেসামাল হয়ে পড়ত ঠিকই কিন্তু আমাদের সরকারের মতো এতটা অকর্মণ্য হতো না। পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। অতি দ্রুত সময়ের পরিবর্তন হতে লাগল। মুক্তিসংগ্রাম সাফল্যের পথে। ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। ৮নং থিয়েটার রোডে যবনিকা নেমে আসার লগ অত্যাসন্ন। বিজয় গর্বে এগিয়ে চলার আগে আমরা-যারা মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করেছি, তারা যদি মি. তাজউদ্দীন আহমেদ তার প্রভুদের খুশি করার জন্য? গোপন চুক্তি করেছে, তার বিষয়বস্তু উদ্ঘাটন করতে পারতাম, তাহলে এই বিজয় অভিযান আবার আমাদের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের কঠিন সংগ্রামের নতুন সূচনা বলে অভিহিত হতো।

বিজয় অভিযান

বিজয় অভিযানের আনন্দোল্লাসে কতক লোককে আত্মহারা হতে দেখেছি। কিন্তু আমার নিকট এ আনন্দ প্রশান্তির গভীরতায় স্নিগ্ধ। আনন্দ, দুঃখ ও শূন্যতার সংমিশ্রণে আমি আজ কিছুটা যেন বিভ্রান্ত। এই আনন্দ ফুটবল খেলার বিজয় আনন্দ নয়। এটা এমন একটা মুহূর্ত যা, একটা জাতির জীবনে বহু যুগ, বহু শতাব্দী পরে আসে। মুক্তিসংগ্রাম একটা মাটির পুতুল

নয় যে, তাকে ইচ্ছেমত রূপ দেয়া যায়। মুক্তি সংগ্রামের বীজ বপন করতে বহু ত্যাগ, বহু সময়ের প্রয়োজন।

এ বীজ অংকুরিত হয়ে শক্ত, সতেজ মহিরুহে পরিণত হতে আরো দীর্ঘ সময়ের দরকার। উপযুক্ত ও কঠিন হাতে এই বৃক্ষের সোনালি ফসল কর্তন করতে পারলে, ঝড়ের তাণ্ডবে এই ফলন্ত বৃক্ষটা সহসা ভূলুণ্ঠিত হয়ে সমস্ত আশা, সমস্ত প্রচেষ্টা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। ঠিক ঘটলও তাই। শেখ মুজিব বিপ্লবী চিন্তাধারায় বর্ধিত ছিলেন না বলে সহসা, অভূতপূর্ব এক প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় তিনি নিজেই যে কোথায় ভেসে গেলেন। ফসল কাটার জন্য কেউই রইল না। তবু তার সযত্নে পালিত ফসল, বিপর্যয়ের টানাপোড়েনে কোনো রকমে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখল। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে নিয়ে বর্ণিত ছয়টি প্রধান স্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল।

প্রথম স্তর

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত থেকে আরম্ভ করে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বাত্যাতাড়িত খড়-কুটোর মতো প্রতিটি নারী-পুরুষ, শিশু বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিল। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ! হতাশায় মুহ্যমান। তবু বেঁচে থাকার কি করুণ আকুতি! হাজার হাজার শরণার্থী ভেসে চলেছিল সীমান্তের ওপারে।

দ্বিতীয় স্তর

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তার প্রচণ্ড জ্বালা। হাজার হাজর আত্মীয়-স্বজনহারা মানুষের জনস্রোত। কাফেলার পর কাফেলা। এই সময় শরণার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, বিভিন্ন খণ্ড যুদ্ধে হানাদারদের মোকাবিলা করে শেষপর্যন্ত শত্রুর উন্নত শ্রেণির অস্ত্রশস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে ই পি আর-এর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানরা যে ওপারে আশ্রয় নিতে লাগল। পাক-হানাদাররা তাদের আধিপত্য সুদৃঢ় করে নৃশংস অত্যাচারের মাত্রা অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দিল-হিন্দু, মুসলমান সবার উপর। প্রবাসী সরকার এবং মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে কোনো রকম সংযোগ বা সময় ছিলনা। ফলে সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে নেমে এলো স্তব্ধতা।

তৃতীয় স্তর

জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি। কর্নেল ওসমানী সা বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে কলকাতার এক সম্মেলনে মিলিত হবার পর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মুক্তি সংগ্রামীদের ভেতর পারস্পরিক সমন্বয়ের সূচনা হয়। এই সম্মেলনের সময়ই আমাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা জন্মে। এবং দেশের মুক্তির জন্য শত্রুকে চরম আঘাত হানার আক্রমণ পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস আরম্ভ হয়।

চতুর্থ স্তর

জুলাই মাসেই মুক্তিসংগ্রামীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আমাদের মুক্তিসংগ্রামে এই প্রশিক্ষণপর্ব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির জোয়ারে মুক্তিসংগ্রাম দিনকে দিন প্রচণ্ড বেগধারণ করে সামনের দিকে এগুতে থাকে। হতাশায় ঝিমিয়ে পড়া মনগুলো আবার যেন আশার আলো দেখতে পায়।

পঞ্চম স্তর

এই সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে পাক শত্রুদের উপর আঘাত হানার জন্য গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বস্তুতপক্ষে এই গেরিলা কৌশলই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সম্বন্ধে আগেই সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ স্তর

বৃত্তাকার যুদ্ধ। এই সময়ে পুনর্গঠিত আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত পদাতিক বাহিনী মিত্রবাহিনীর সহায়তায় সীমান্ত অঞ্চলে বৃত্তাকার খণ্ড যুদ্ধে পাক-হানাদারদের ওপর চরম আঘাত হানে। এই বৃত্তাকার যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করা আমাদের জন্য অনেকটা কষ্টকর ছিল। কেননা উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুদৃঢ় ট্রেঞ্চ ও বাংকারে বসে আত্মরক্ষামূলক, যুদ্ধে লিপ্ত একটা উন্নত শ্রেণির সৈন্যবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বাধবিপত্তি, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নানারকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত দুরূহ সমস্যার জগদ্দল পাথরগুলো আস্তে আস্তে সরে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

সম্ভবত এই আকস্মিক সাফল্যের জন্যই বিজয় অভিযানকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের একটা স্তর বলে সংযোজন করতে পারিনি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের দিনটি একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সাফল্যের জন্যই যে বিজয়াভিযানকে মুক্তিসংগ্রামের একটি স্তর বলে গণ্য করতে পারিনি শুধু তাই নয় অন্য কারণও আছে। সহজ কথায়, সেটা হলো মিত্রবাহিনী এই সাফল্যের চরম লগ্নে যতটা তৎপরতা দেখিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা ততটা তৎপরতা দেখাবার সুযোগ যায়নি। তাই বিজয়াভিযানের এই দুর্লভ মুহূর্তে মুক্তিসংগ্রামীদের এতদিনের আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর কর্মকাণ্ডের সামনে গৌণ হয়ে দেখা দেয়। এটা তর্কাতীত যে, যে মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি দৈত্যরা বাঙালি 'লিলিপুট' বলে উপহাস করত সেই ছোট ছোট মানুষগুলো একরাশ প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ শত্রুর মোকাবিলা করে ওদের চরমভাবে কোণঠাসা করে ফেলে। এই অসহায় অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য হানাদার বাহিনী নানাভাবে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা সেই রূপকথার 'গ্যালিভারের শক্তি আর সঞ্চয় করতে পারল না।

দাম্ভিক ইয়াহিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যখন এভাবে দিশেহারা, পর্যুদস্ত, তখন মিত্রবাহিনীকে এই ছোট ছোট বাঙালি গেরিলারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে শেষবারের মতো শত্রুর উপর চরম আঘাত হানতে।

মেজর জেনারেল পালিত লিখিত 'দি লাইটনিং অপারেশন' পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে, ভারত, পাকিস্তানের সাথে এই যুদ্ধে বিশেষ করে পূর্ব রণাঙ্গনে অল্প কয়েক দিনের ভেতর অপ্রত্যাশিতভাবে যে বিজয় গৌরব অর্জন করেছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কিছুটা ভাবাবেগের আতিশয্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান শত্রু মুক্ত করে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছিল, তা শুধু চৌদ্দ দিনের যুদ্ধের ফলাফল নয়। জেনারেল পালিত অবশ্য এই ধারণাই পোষণ করতেন। কিন্তু এই গৌরব ভারতীয় বাহিনীর ১৯৭১ সালের জুন মাস থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রম ও প্রস্তুতির ফলাফল। এই কথা বলে বিজয়ী মিত্রবাহিনীর গৌরবকে

ক্ষুণ্ণ করার আমি কোনো চেষ্টা করছি না। নির্ভরযোগ্য বাহকের মারফত সংবাদ সংগ্রহ, সৈন্যদের একত্র করে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের নিয়োগ এবং দ্রব্যসামগ্রীর বিভিন্ন অবস্থানে সরবরাহ যদি যুদ্ধ জয়ের প্রধান বিষয়বস্তু না হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে আমি মেজর জেনারেল পালিতের সঙ্গে একমত। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদার্পণ ছাড়াও শুধু দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনীই দেশকে আর আগামী ছয় মাসের মধ্যেই কৃতিত্বের সাথে মুক্ত করতে সক্ষম হবে; মিত্রবাহিনী নিঃসন্দেহে তাদের সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই দেশকে হানাদার মুক্ত করে আমাদের জন্য স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। এত তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হওয়ায় আমারই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনের কোথায় যেন ব্যর্থতার গ্লানি অনুভব করলাম। আমি যেন খুশির এ বন্যায় পুরাপুরিভাবে শরির হতে পারলাম না। আমার মনে হয়, ঘটনার আকস্মিকতাই এজন্য দায়ী। যাহোক শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘপুঞ্জ বিদীর্ণ করে রক্তস্নাত স্বাধীনতার সূর্যটা পূর্ব আকাশে ঝলমলিয়ে উঠল।

বিজয় অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা শুধুমাত্র নীরব দর্শকই ছিল না- তাদের একটা নির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এই তৎপরতা নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর, টাকি থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে চার্লি সেক্টরে একটা কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য আমাকে ডাকা হয়। চার্লি সেক্টর এই সময় ব্যারাকপুর থেকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত হয়। ব্রিগেডিয়ার এন এ সালিকও ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে কীভাবে আমাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন। মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনার কথা গোপন রেখে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রোডে এবং তারও দক্ষিণে আমার লোকজন নিয়ে যেকোনো সময় সামনে অগ্রসর হবার জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত ও সতর্ক থাকতে বললেন। পরিকল্পনার কথা আমাকে না জানালেও আমি অনুমান করলাম যে, সাতক্ষীরার বাঁ দিক থেকে একটা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর বরাবর শত্রু ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য যশোরের উত্তর দিক থেকে প্রধান আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া,

আমার মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর গোলা বর্ষণের মাঝখানে পড়ে যাতে বিপর্যস্ত না হয়, সেই জন্য মিত্রবাহিনীর আগে আমার সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বারণ করা হলো! আমাকে জানানো হলো যে, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য হবে এরূপ:

প্রথমত, সময়মত মিত্রবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন দেয়া।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর, মিত্রবাহিনী কোনো প্রশাসনিক অসুবিধার সম্মুখীন হলে তা দূর করার জন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তৃতীয়ত, ঘনিষ্ঠভাবে মিত্র বাহিনীকে অনুসরণ করা এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা।

আমাকে বলা হলো যে, যেহেতু 'বাংলা অঞ্চল' (বেঙ্গল-ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঘাঁটি) আমার নিকটবর্তী, সেজন্য আমার সেক্টরকে এখন থেকে বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক আওতাধীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবন এলাকার সম্পূর্ণ জলপথ 'বাংলা অঞ্চলের অধীনে এনে এর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় মেজর জেনারেল পি কে রায় চৌধুরীর উপর।

সেক্টরে ফিরে এসে আমি আমার নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করলাম। আমার দুই হাজার গেরিলা সৈন্য ছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খুবই অপ্রতুল। তবু আমি মনে করলাম যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের উপস্থিতিই অনেকটা প্রভাব বিস্তার করবে। কেননা, বিজয় অভিযানের সময় সম্ভাব্য রাহাজানি, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সেদিকে আমার লোকজন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবে। কাজেই, পর পর দু রাতে আঠারাশো গেরিলা সৈন্যকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বাদ বাকি গেরিলাদের বিজয় অভিযানের সময় অগ্রসর হওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে প্রস্তুত রাখা হলো।

সদর দপ্তরে ও আমার সেক্টরের অন্যান্য জায়গায় আমার নিয়ন্ত্রণাধীন যেসব সৈন্য মোতায়েন ছিল, তাদের সদাসতর্ক থাকতে বলে দিলাম। আমার সেক্টরের সদর দপ্তরের বিস্তৃতি অনেকদূর পর্যন্ত। অল্প সময়ের নোটিশে এটা গুটিয়ে আনা সম্ভব নয়। আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল

হককে বুঝিয়ে বললাম যে, যে সমস্ত আর্মিরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হাজির হতে পারবে না, তারা যেন দেশ মুক্ত হওয়ার পরেই খুলনায় আমার সাথে মিলিত হয়। হিসাবপত্র ঠিক রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যত্ন নেয়ার জন্যও সার্জেন্ট ফজলুলকে নির্দেশ দিলাম। কেননা, আমরা চলে গেলে যেসব মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য যুবক এখানে এসে হাজির হবে, তারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়বে।

সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বারের মতো লে. জিয়া এসে গেল। সুন্দরবন এলাকা সে পাকিস্তানি গানবোটের সামনে শত্রুপক্ষের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তার অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছে! হানাদাররা নদী বরাবর তাদের ঘাঁটিগুলো ছেড়ে দিয়ে খুলনার দিকে হেঁটে গিয়ে জড়ো হয়েছে। আমি স্থির করলাম, যেসব গেরিলারা খুলনার সীমান্ত বরাবর শত্রু হননে লিপ্ত, তাদের খুলনা শহরের চারদিকে সমাবেশ করে হানাদারদের শহরের পিছু হটার রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেব। মিত্রবাহিনীর সার্বিক পরিকল্পনা মনে রেখে, নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে সাব-এরিয়া কমান্ডারদের নিয়ে আমার দপ্তরে একটা সম্মেলনে মিলিত হয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। খুলনা শহরের নিকট রূপসা নদীর পশ্চিম তীরে আক্রমণ ব্যূহ তৈরি করার জন্য লে. জিয়াকে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিলাম। বাগেরহাটে সুবেদার তাজুল ইসলামের অধীনে যে সমস্ত সৈন্য ছিল তাদেরও লে. জিয়ার নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলাম। শত্রু পক্ষ যাতে নৌপথ ব্যবহার করতে না পারে, সে ন্য জনৈক মি. নোমান উল্লাহকে তেরখাদা ও মোল্লারহাটে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তাদের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে খুলনার উত্তর- পূর্বদিক থেকে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সতর্ক থাকতে বললাম। আরো বললাম যে, তারা যেন পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে। খুলনার দক্ষিণে পাইকগাছা, তালা ও আশাশুনী অঞ্চলে সেকেন্ড লে. আরেফিন গেরিলাদের অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিল। তাকে বললাম, সে যেন গেরিলাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে খুলনা শহরের কাছাকাছি কোথাও প্রস্তুত হয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন হুদার অধীনে দুই ব্যাটেলিয়ানের বেশি মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাকেও সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলাম। বসন্তপুরে

শত্রুপক্ষের অবস্থান খুবই সুদৃঢ়। বসন্তপুর আমাদের খুবই নিকটে। এখান থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করে। গুরুত্বপূর্ণ সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়ক শত্রুমুক্ত করে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে দায়িত্ব দিলাম । খুলনা শহরের চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জড়ো করে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দখলদার আমলে বিহারিরা বাঙালি মুসলমানদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তারই প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ব্যাপক হারে বিহারী নিষন আরম্ভ হবে এবং সারা দেশ জুড়ে নেমে আসবে চরম বিশৃঙ্খলা। এই আশঙ্কা করেই উপরোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সংগ্রামের পূত্রমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা অপ্রীতিকর প্রতিহিংসার কুৎসিত দৃশ্য থেকে দূরে থাকুক আমি এটাই কামনা করেছিলাম।

উল্লিখিত পরিকল্পনা ছাড়াও আমি দুটো দলকে প্রস্তুত করে বেগের নেতৃত্বাধীনে বরিশালের দিকে নৌকায় পাঠিয়ে দিলাম। প্রথম দলটি ক্যাপ্টেন ওমরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে বরিশালের উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। আর দ্বিতীয় দলটিকে সেকেন্ড লে. মুয়িনের নেতৃত্বে পটুয়াখালী পাঠানো হলো। কথা প্রসঙ্গে বলতে হয়, সেকেন্ড লে. মুয়ন মিত্রবাহিনীর অধীনে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত, 'মূর্তিতে' বাংলাদেশ ক্রাস ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করে আরো চারজন তরুণ অফিসারসহ প্রথম দল অক্টোবর মাসে আমার কাছে আসে। তারা তিন মাসের ক্রাস ট্রেনিং পোগ্রাম অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। এই তিনজন অফিসার হলো- সেকেন্ড লে. মোহাম্মদ আলী, আহসান উল্লাহ এবং শচীন্দ্র। তাদের সবাইকে ক্যাপ্টেন হুদা। বাহিনীতে কাজ করার জন্য দেয়া হলো। বয়সে সবাই নবীন, কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু। যাহোক, নির্দেশ মোতাবেক লে. জিয়া, নোমান ও আরেফিন স্ব-স্ব গন্তব্যস্থলে দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। বসন্তপুরের উপর যেকোনো সময় আঘাত হানার জন ক্যাপ্টেন হুদা প্রস্তুত হয়ে রইল। এই সময়ে লে. জিয়াকে একটা বেতার যন্ত্র জোগাড় করে দিলাম। ওদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে মনের গভীরে একটা প্রশ্ন উঁকি দিলে নিজেই বিস্মিত হলাম-'এবার কি-সত্যিই আমরা খুলনা যাচ্ছি?'

ওদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছিলাম, তা আমার কানে অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। স্বপ্ন বিষ্টের মতো মনে হলো, ওগুলো যেন

আমাকেই উল্টো পরিহাস করছে। কেননা, দালাল ও হানাদার পরিবেষ্টিত খুলনার মতো বিপজ্জনক শহরে এ শিগগির প্রবেশ করতে পারব-একটা কল্পনাও করতে পারিনি। যদিও স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও কমপক্ষে পাঁচ হাজার গেরিলা খুলনা শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল, তবু হানাদারদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে আমরা ছিলাম সন্দিহান। সমস্ত শঙ্কা, সমস্ত ভয় উবে গেল। চরম লগ্নটি সমাগত। পবিত্র ঈদের দিন সকাল বেলা, ১৯৭১ সালে ২০ নভেম্বর ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনে কয়েকবার শব্দ হতেই রিসিভারটা কানের কাছে নিলাম : 'অত্যন্ত সুখবর। প্রশংসনীয় তৎপরতা। অবস্থান মজবুত করে টিকিয়ে রাখো। কুত্তাগুলোকে পিছু পিছু ধাওয়া করো।'

আনন্দ উত্তেজনায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম। ক্যাপ্টেন হুদা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বসন্তপুর, কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জে শত্রুর অবস্থানের উপর চরম আঘাত হেনে এ ঘাঁটিগুলো আমাদের কবজায় এনেছে। কি ভয়ংকর উত্তেজনা! ক্যাপ্টেন হুদা কথা বলতে পারছিল না। তার বাকরুদ্ধ হয়ে এলো। উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের অফুরন্ত আনন্দে আমরা সবাই বিস্ময়াভিভূত, হতবাক। হুদা ও তার সাথের মুক্তিসেনাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালাম। বললাম যে, শত্রুর উপর আঘাতের ক্ষিপ্রতা ও তার গতিবেগ যেন পুরাপুরি রক্ষা করা হয়। আনন্দ ও উত্তেজনায় এতটা আত্মহারা যে, কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ পবিত্র দিনটিতে বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অভিযান শুরু হলো। স্কুল শিক্ষক মি. শাহাজাহানকে পারুলিয়া রোডের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম। কেননা বসন্তপুর ও কালিগঞ্জ ঘাঁটি থেকে শত্রু বাহিনীকে এ পথ দিয়েই পালাতে হবে এবং এটাই একমাত্র পাকা রাস্তা। একই সঙ্গে মি, চৌধুরীর নেতৃত্বাধীনে ষাটজন মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকে পারুলিয়া ব্রিজটা অক্ষত অবস্থায় অধিকার করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। মি. চৌধুরী পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন অভিজ্ঞ নাবিক। বেশ হাসিখুশি। কঠোর প্রকৃতির এই মানুষটি আমার পরিকল্পনায় খুশি হয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিল।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার পর, আমি মোস্তফাকে নিয়ে স্থানটা স্বচক্ষে দেখার জন্য বসন্তপুরের দিকে রওয়ানা হলাম। দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ

ইছামতীর ওপার থেকে বসন্তপুর আমাদের কতবার ইশারায় আহ্বান জানিয়েছে। এক ঘণ্টা পরে হিঙ্গলগঞ্জে পৌঁছে আমরা দু'জন স্পীড বোটে নদী পার হয়ে তীরে নামলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আজ কোনো মেশিনগান গর্জে উঠল না। আগে অবশ্যই কোনো অতিথির পদার্পণ মাত্র মেশিনগানগুলো মুহূর্তে এক ঝলক আগুন ছুড়ে গর্জে উঠত।

রক্তলাল সূর্যটাকে বুকে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা যখন পত্ পত্ করে উড্ডীন দেখলাম, তখন কি যে উত্তেজনা! ওই সূর্যটাকে স্বাগত জানাতে তা রক্ত ঢালতে হয়েছে এই ইছামতীর তীরে। সমুন্নত পতাকার নিচে দু' থেকে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা নীরবে দণ্ডায়মান। শত্রুর কোনো চিহ্ন নেই। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রেশন এবং চারদিকে কুৎসিত ধ্বংসাবশেষ রেখে হানাদাররা পালিয়েছে।

একদিন কোনো লোকের আগমন মাত্র যে সমস্ত বাংকার ট্রেঞ্চ থেকে মুহূর্তে মেশিনগান গর্জে উঠত-এমনকি গত রাতেও যেখানে মেশিনগানের গর্জন শোনা গিয়েছিল, তা আজ ভীষণ শ্মশানপুরীর মতো শূন্য মনে হলো।

পরিত্যক্ত জামাকাপড়, জুতা, মগ, ছেঁড়া কম্বল, বেল্ট, বুট পালিশসহ আরো অনেক জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। মনে হলো, যেন পরিত্যক্ত ওই সব জিনিসপত্রের বুকের উপর কঠিন মৃত্যু চেপে বসেছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দখলদার বাহিনী প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়েছে। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম, নীরব নিথর। বসন্তপুরের চেহারা দেখে বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পরিত্যক্ত ঘরবাড়িগুলো-ভয়ানক নীরব। কতক আগুনে পোড়া-পৈশাচিকতার কুৎসিত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা-জানালাগুলো বিধ্বস্ত শীতল বাতাসের স্পর্শে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। হঠাৎ একটা গর্তের কাছে মানুষের কিছু হাড়ি ও মাথার খুলি চোখে পড়ল। স্বাধীনতাপ্রিয় হতভাগ্য বাঙালির কী করুণ পরিণতি! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! কাকগুলো শান্ত। ওদের ভঙ্গিতে নেই কোনো স্বভাবজাত অস্থিরতা। নরকঙ্কালগুলোর পাশে কয়েকটা ছাগল, ক্ষুধার্ত কুকুর ভারাক্রান্ত মনে পায়চারী করছে।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াবার জন্য আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল অনেক মুক্তিপাগল তরুণকে। ওদের মহান আত্মত্যাগের জন্যই আজ স্বাধীন বাংলার পতাকা সমুন্নত শিরে উড্ডীন রয়েছে। পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র দেখে আজ আর আমি উত্তেজিত হই না। আগে মাত্র একটা রাইফেল দেখে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। এখন এটা আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগল।

বসন্তপুর অধিকার করে আনন্দ ও উত্তেজনার পরিবর্তে মন আমার বেদনা-ভারাক্রা হয়ে উঠল। নভেম্বরের শীতল বাতাসে উঁচু বাঁধটার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের এই বীভৎস কঙ্কালগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কি মর্মান্তিক! ওরা রক্ত দিয়েছে, আমরাও রক্ত দিয়েছি। সাক্ষী রয়েছে ওদের কঙ্কালগুলো। স্বাধীনতা পাগল আমার মুক্তিযোদ্ধাদের কঙ্কালও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে ওখানে।

যুদ্ধের শেষ। মুক্তিসংগ্রাম শুরু। স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি মানুষের রক্ত ও কঙ্কালের বিনিময়ে। কিন্তু মন আমার ভারাক্রান্ত। মুক্তির সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম। করতে দ্বিধা সংকোচে জড়িয়ে পড়লাম। এই মিশ্র অনুভূতি সম্বল করে কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ পরিদর্শন করলাম। এ জায়গাগুলো কিছু ভালো বলে মনে হলো। কিছুটা প্রাণের স্পন্দন এখনো যেন বেঁচে আছে। এখানে কিছু লোকজন দেখলাম। অনেক বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আবার অনেকগুলো নারকীয় অগ্নুৎসবের বিকলাঙ্গ চেহারা নিয়ে বীভৎস্য তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত দুঃখের মাঝেও যে ক'জন লোক আমরা এখানে পেয়েছিলাম, তারা আমাদের স্বাগত জানাতে কার্পণ্য করল না। মানবতার কী মহান প্রতিচ্ছবি। কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জের মাঝখানে যমুনা প্রবাহিত। আজ সে বড্ড একা, নিঃসঙ্গ। ছোট ছোট ঢেউগুলোকে বুকে নিয়ে ধীর, শান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। গোলার শব্দ বা দৈত্যের মতো গানবোটগুলোর পদভারে তার প্রশান্ত বুকটা আজ আর কেঁপে ওঠে না। দরাজ গলায় ভাটিয়ালির মনমাতানো সুরের ঝংকার দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে মাঝিরা আবার আনন্দে পাল তুলে ছুটে চলবে যমুনার বুকে। ছন্দায়িত সুরের মূর্ছনায় যমুনার বিধ্বস্ত বুকটা আবার মোহময় হয়ে উঠবে।

স্থানীয় লোকজন বলল, গতরাত থেকেই হানাদাররা পালাতে শুরু করেছিল। পলায়নপর হানাদারদের স্থানীয় লোকজন জিজ্ঞেস করেছে- আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

তখন ওরা কম্পিত স্বরে জবাব দিয়েছিল, মুক্তিরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, ওপর ওয়ালাদের হুকুম মতো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি।' ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হানাদাররা যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্থানীয় লোকজন হাসিতে ফেটে পড়ল। অনেক দামি ও লোভনীয় জিনিস রেখে যাওয়া ছাড়াও হানাদাররা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নদীতে ফেলে দেয়।

ক্যাপ্টেন হুদা গতরাতে বসন্তপুরের ওপর আক্রমণ চালায়। জবাবে, সারা রাত ধরে হানাদাররাও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। আর এই গোলাবর্ষণের আড়ালে রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে শত্রুরা পালিয়ে যায়। ভোরে অবস্থা অত্যন্ত শান্ত ভাব ধারণ করায় হুদা মুক্তিযোদ্ধার একটি ছোট দলকে গ্রামের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে যারা আমাদের গোপনে সংবাদ সরবরাহ করত, তাদের কাছ থেকে প্রথমে জানতে পারল যে, হানাদাররা পালিয়ে গেছে।

সংবাদ পেয়ে হুদা এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে কালিগঞ্জ-সাতক্ষীরা রাস্তা ধরে প্রায় এক রকম দৌড়ে বসন্তপুরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। একটা ভাঙা জিপ ছাড়া তার সাথে আর কোনো যানবাহন ছিল না। জিপটা কিছুদিন আগে হানাদারদের কাছ থেকে অধিকার করা হয়। হানাদাররা তখনো পালাচ্ছিল। প্রশংসনীয় উদ্যম ও মনোবল নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা দীর্ঘ বারো মাইল পথ হেঁটে তার বা তার বাহিনীসহ মি. শাহাজাহানের লোকজনের কাছে পৌঁছে, হানাদারদের সম্মুখ থেকে আঘাত হানল, তখন ওরা দিশেহারা হয়ে পারুলিয়ার দিকে পালাতে শুরু করে। ওদিকেশাজাহানের হানাদার বাহিনীর একটি দলকে মাঝপথে অবরোধ করে ফেলল। এদিকে হুদা জানতে পারল যে, হানাদাররা পারুলিয়া সেতু উড়িয়ে দিয়ে ওপারে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। সেতুর চার মাইল দূরে অবস্থান নিয়ে ক্যাপ্টেন হুগ দ্রুত মি. চৌধুরী ও শাহজাহানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীকে তার লোক একত্র করে পুনঃবিন্যাস করল। সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আটটি কোম্পানিতে বিভক্ত করে লে. মোহাম্মদ আলী, লে. আহসান উল্লাহ, লে. শচীন্দ্র ও চৌধুরীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে

রাতের অন্ধ ব্রিজের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। হানাদাররা পালাবার আগেই ব্রিজের ওপারে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছিল। তাছাড়াও ব্রিজের চার মাইল পিছনে আলিপুর নামক একটা জায়গায় তাদের একটি শক্তিশালী আর্টিলারি রেজিমেন্ট ছিল।

ওই রাতেই আমি অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শন করলাম। তখন পাকহানাদার আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হচ্ছিল। আমাদের বাঁ দিকে মি. মাহবুবের নেতৃত্বাধীনে ৮ নং সেক্টরের সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল। মি. মাহবুব একজন পি এস পি অফিসার। কর্মদক্ষতার জন্য তাকে মেজর পদে উন্নীত করা হয়। তিনি সাহসী ও বুদ্ধিমান। আঘাতের পর আঘাত হেনে শত্রুপক্ষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে আমরা কোনো সাহায্যকারী সৈন্য পাইনি।

৭২ নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের অধিকৃত জায়গাগুলো, যেমন-বসন্তপুর, কালিগঞ্জের উপরে তদারকি করত। আর তাদের সাহায্য করতে পিছনে অবস্থানরত আমাদের মুক্তিবাহিনী। সুবেদার মেজর এ জলিল ও লস্করের অধীনে মুক্তিবাহিনী এখানে কাজ করেছে। আমাদের সাথে মর্টার সজ্জিত মুক্তি বাহিনীর একটি দল ছিল। তারা শুধু হানাদারদের গোলাবর্ষণের জবাবে পাল্টা গুলি ছুড়ত। সুবেদার গফুর নামে একজন অভিজ্ঞ মর্টার শিক্ষক পাক-হানাদারদে। গুলির জবাবে দক্ষতার সাথে পাল্টা গোলাবর্ষণ করে প্রত্যেকবারই শত্রুদের প্রভু ক্ষতিসাধন করত। ভয়ানকভাবে কোণঠাসা হয়ে হানাদারদের মেশিনগানগুলো সবসময় গর্জন করতে লাগল। যেহেতু আমাদের অবস্থানের চতুর্দিক হানাদারদের দৃষ্টির আওতায়, সেজন্য রাতে বা দিনে পাহারায় বেরুনো খুবই কষ্টকর ছিল। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ দানবটা দম নিয়ে পুনর্বার আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিত।

২৩ নভেম্বর, পারুলিয়া থেকে চার মাইল দূরে আর একটা ব্রিজের পিছনে হানাদাররা সরে গেল। সরে যাবার আগে ওরাই এবার নৃশংসতার স্বাক্ষর রেখে গেল। এদিকে আমাদের সৈন্যরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল যে, হানাদাররা প্রথমে সাতক্ষীরার ও পরে খুলনার দিকে পালাবার জন্য যুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করছে। এই ব্রিজের কাছে এসে, উভয়পক্ষই মাঝে মধ্যে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করে গুলি

বিনিময় করত। এখানে মূর্তজা নামে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হারাতে হয়। সে অত্যন্ত সাহসী এবং অনেক যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। মাথায় বুলেটের আঘাত লাগার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কেননা, বুলেটের আঘাতে ওর মগজ বের হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, আমরা সবসময় আত্মরক্ষামূলক অবস্থান থেকে শত্রুর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

হানাদাররা যে সমস্ত জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তার খবরটা কলকাতার জনগণের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে গেল। মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করার জন্য সাংবাদিক, টিভি ক্যামেরাম্যান এবং আরো অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আসতে লাগলেন। ইছামতীর পশ্চিম তীর লোকে-লোকারণ্য, মনে হলো কোনো জনাকীর্ণ মেলা।

খেয়া পার হয়ে এপারে 'জয় বাংলা' এলাকায় আসার জন্য অসম্ভব ভিড়। মুক্তাঞ্চলের মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ। ইছামতীর তীর বরাবর সারিবদ্ধ গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তারা মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করতে লাগলেন। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন ও মুক্তিযোদ্ধারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্ব-স্ব কর্তব্য ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিদর্শনকারী দু'একটি দলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা এখানে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?"

উত্তর এলো, 'মুক্তির আনন্দ, মেজর সাহেব মুক্তির আনন্দ।'

মুক্তির আনন্দই যেন বৈধ পাসপোর্ট। শিগগীরই মুক্ত অঞ্চল লোকের আগমনে সরগরম হয়ে উঠল। কলকাতা থেকে শরণার্থীরা দলে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ঘিরে আসতে লাগল। আবার নতুন করে ঘর বাঁধার প্রবল ইচ্ছা।

আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সময় বুঝে তাদের গোপন আস্তানা থেকে মুখ বের করলেন এবং কথার তুবড়ি ছুটিয়ে অনেক গীতিনাট্যের অবতারণা করে মরচে ধরা জিহ্বাগুলো আবার-পরিষ্কার করতে নেমে গেলেন। রাজনৈতিক নেতাদের শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয় (!)। নিরীহ গ্রামবাসীদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, কি করে লোককে কাঁদাতে হয় তার কৌশল ওদের ভালো করেই জানা আছে। এভাবেই নেতারা সরল গরিব লোকদের অন্তর জয় করে। তাদের চরিত্রের

এই দ্বৈত ভূমিকা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। সর্বহারা মানুষের দীনতাকে সম্বল করে কী সুচতুর কৌশলে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা ধাপে ধাপে ওপর তলায় উঠে গিয়ে সেই দুস্থ মানুষগুলোকে বেমালুম ভুলে যায়।

এবার সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব মুক্তাঞ্চল সফর করতে এলেন। আমি রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় নিয়ে গেলাম। কতকগুলো অসুবিধার জন্য সাতক্ষীরা থেকে আট মাইল দূরে আমাদের থামতে হয়েছিল। কী করে এই সুবিধাগুলো দূর করা যায়, তাকে বুঝিয়ে বললাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, সাতক্ষীরার পিছনে দু'দিক থেকে সৈন্য পাঠিয়ে হানাদারদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয় তারা যাতে নতুন সৈন্য আমদানি করে শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। দুটো প্রধান রাস্তা দিয়ে সাতক্ষীরার সাথে চলাচল ব্যবস্থার সংযোগ সাধন করা হতো। একটা হলো, যশোর থেকে কদমতলা হয়ে, অপরটা হলো, কালিগঞ্জ থেকে যে পথ ধরে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম- সেই পথ। এ রাস্তা সাতক্ষীরার ভেতর দিয়ে দৌলতপুর-খুলনা পর্যন্ত পৌঁছেছে। স্থির করল! প্রত্যেকটি রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করব।

২৯ নভেম্বর, হাবিলদার আফজালের নেতৃত্বে দুশো মুক্তিযোদ্ধার একটি দল সাতক্ষীরার পথে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু যেভাবে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই মতো কাজ করতে ব্যর্থ হলো। তারপর লে, আহসান উল্লাহর নেতৃত্বে দুশো মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকে ওই একই পথে পাঠানো হলো। আহসান উল্লাহ অত্যও সাহসী যুবক। তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এগিয়ে যাবার প্রচণ্ড শক্তি তার মধ্যে। ডান দিক থেকে একশো সাতক্ষীরা মুক্তিযোদ্ধার আর একটি দলকে মি. শাহজাহানের নেতৃত্বে দৌলতপুর রাস্তায় ওঁৎপেতে শত্রুকে আঘাত করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন হুদাকে বললাম যে, রাতের বেলায় আক্রমণাত্মক পাহারা দিয়ে শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাতক্ষীরা অধিকার এবং তার সৈন্যদের দ্রুত পুনর্গঠন করে পলায়নপর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে হবে।

ইতোমধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৃহদংশ নদীর ওপার থেকে দেবহাটা স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখানে ভূতপূর্ব সি এস পি অফিসার মি.

আতাউর রহমানের তত্ত্বাবধানে পাঁচশো তরুণ যুবক নিয়ে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে দিলাম। মি. আতাউর রহমান যুবক, কর্তব্যপরায়ণ। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সর্বান্তঃকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং এ যুদ্ধে তার দান অপরিসীম। শিগগীরই ক্যাম্পের কার্যকলাপ সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সব মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্যাম্প পরিদর্শনে আসতে লাগলেন। অনেক গণ্যমান্য লোকজন সাথে নিয়ে ত্রাণ। পুনর্বাসন মন্ত্রী মি. কামারুজ্জামান এই ক্যাম্প পরিদর্শন করে অত্যন্ত খুশি হলে। ছেলেরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে মন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত জানালে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এ সৌজন্যমূলক পরিদর্শনে আমি খুশি হতে পারিনি। কেননা সামনে এখনো অনেক দুস্তর পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত লে. আহসান উল্লাহর কাছ থেকে কোনো ফলপ্রসূ খবর পাইনি। রাস্তার ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন পেতে শত্রুদের একটি মাত্র জীপ সে উড়িয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধার দিয়ে একটানা সুদৃঢ় বাংকার তৈরি করে শত্রুপক্ষ অবস্থান নেয়ায় আহসান উল্লাহ ওদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। শত্রুদের অবস্থান থেকে দু'দিকে প্রায় দুশো গজ পর্যন্ত উন্মুক্ত ধানক্ষেত ও জলাশয়। সবকিছুই ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হতো না। ডান দিকে মি. শাহাজাহানের বেলায়ও ঠিক একই অসুবিধা। তাছাড়াও রাজাকারদের কাছ থেকে তাকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। শত্রুদের পরিকল্পনা ছিল, রাজাকার দ্বারা প্রতিরোধ তৈরি করে রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে সরে পড়া। সাতক্ষীরা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় শতকরা পঁচাশি জন লোক সামরিক চক্রের দালাল হিসেবে হানাদারদের সক্রিয় মদদ জুগিয়েছে। তার ফলে সবকিছুই মন্থর গতিতে চলতে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও চিরন্তন গতিকে কে রুখতে পাবে? পূর্ব রণাঙ্গনেই শুধু পাকিস্তানি জেনারেলরা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হলো না, পশ্চিম রণাঙ্গনেও রীতিমত হিমশিম খেয়ে উঠল। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল যে রকম 'ব্লিটজক্রীগ' কায়দায় আরবদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক একই কায়দায় পাক-সামরিক জান্তা তাদের বিমান বাহিনীর 'মিরেজ ও মিগ নিয়ে ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ রাতে ভারতের ওপর হামলা চালায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীও খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি ওই রাতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে পাক হামলার সমীচীন জবাব দিলেন। শুরায় বিভোর জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল- রাজনীতি সচেতন বাঙালিকে চিরদিনের জন্য দাবিয়ে রাখতে পারবে এবং এই হীন উদ্দেশ্যেই সে ভারত আক্রমণ করে সমস্যাটার ওপর আন্তর্জাতিক রঙ চাপিয়ে ভারতের সাথে একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে চেয়েছিল।

কিন্তু সে চরমভাবে ব্যর্থ হলো। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত অদম্য সাহসিকতার সাথে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। দীর্ঘ আট মাস ধরে মিসেস গান্ধী অসীম ধৈর্যের সাথে অবস্থার গতিধারা লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু পাক সামরিক চক্র যখন ভারতের ওপর আঘাত হানার চরম ধৃষ্টতা দেখাল, তখন শ্রীমতি গান্ধীও আমেরিকা ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গের নছিহত উপেক্ষা করে চারিত্রিক দৃঢ়তার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শত্রুপক্ষকে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে কার্পণ্য করলেন না। ভারত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সময়োচিত পদক্ষেপ নেয়ায়, রাশিয়া শ্রীমতি গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে সমর্থন করল। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় আমাদের সৈন্যদের সামনেও সম্ভাব্য বিজয়ের আশা উজ্জ্বলতর হলো। একটা জিনিস এখনো মনের ভেতর খুৎ খুৎ করে-কেন শ্রীমতি গান্ধী তখনো বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেননি।

৬ ডিসেম্বর। বেলা ১১টার সময় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' মারফত ঘোষণা করা হলো যে, ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস যাবত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অধীর আগ্রহে দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। সংবাদটা শুনে মন থেকে চিন্তা ও উত্তেজনা দূরীভূত হলো। হঠাৎ স্বীকৃতির এ ঘোষণা শুনে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এই বিধ্বস্ত অন্তর গর্বে ফুলে উঠল এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বাংলাদেশে শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই এই সংবাদে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এই স্বীকৃতির সাথে সাথে বাংলা শুধু নতুন ইতিহাসই সৃষ্টি করল না, পৃথিবীর মাত্রচিত্রে আপন স্বকীয়তার নিজস্ব স্থান করে নিল। মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় প্রার্থনা হলো, জ্বলে উঠল মানবতার নতুন আশার আলো। যুগপৎ

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতের প্রধান শ্রীমতি গান্ধী সারা পৃথিবীর লোককে অবাক করে দিলেন। স্বীকৃতি শুধু ফাইলের ভেতরই সীমাবদ্ধ রইল না বা বাতাসে মিলিয়ে গেল না। মিত্রবাহিনী, মুক্তিবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রথম তিন দিনেই যশোর ক্যান্টেনমেন্ট অধিকার করে নিল। সুদৃঢ় অবস্থান ছেড়ে দিয়ে পাক-হানাদাররা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করল। প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, পাকবাহিনী যশোরে আমাদের প্রচণ্ড বাধা দেবে। কেননা, যশোর ক্যান্টনমেন্টকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে মনে করা হতো। কিন্তু হানাদাররা তেমন কোনো বাধা দিতে না পারায়, মিত্রবাহিনী ও আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। অথচ মিত্রবাহিনীর কমান্ডাররা প্রথমে মনে করেছিল যে, পাকিস্তানিদের উৎখাত করতে কমপক্ষে ১৫ দিন সময় লাগবে। কেননা, সামরিক জান্তা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য যুদ্ধ করে যাবে বলে সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, তাদের সেই সংকল্প থেকে সরে যেতে হয়। কেননা, ওরা পাকিস্তানের ভূমির জন্য যুদ্ধ করবার সংকল্প করেছিল-বাংলাদেশের ভূমির জন্য নয়। অবশ্য, পরে এটা ওরা বুঝতে পেরেছিল।

অপরদিকে আমাদের মুক্তিবাহিনী ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে সাতক্ষীরা অধিকার করে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রোড ধরে অগ্রসর হতে লাগল। সাতক্ষীরা অধিকার করে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানি তেল, রেশন ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র আমাদের হাতে এসেছিল, তা দিয়ে পুরো এক বছর যুদ্ধ করা যেত। কিন্তু এই সময় অধিকৃত জিনিসপত্রের প্রতি আমাদের কোনো মোহ ছিল না। আমাদের একমাত্র মোহ, একমাত্র উত্তেজনা শুধু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। পিছনে মুক্তিবাহিনীর উপর ওই সব পরিত্যক্ত জিনিসের হেফাযতের ভার দিকে ক্যাপ্টেন হুদা তার বাহিনীর লোকজন নিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগল। হানাদাররা পালাবার সময় প্রধান প্রধান সেতুগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল। এর ফলে আমরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। দু'একটা জিপ ছাড়া, আমাদের কাছে কোনো যানবাহন ছিল না। এ জিপগুলো নানা উপায়ে পার করা হতো। মি. ফজলুল হক ও সুলতান উদ্দীন আহমেদ

যথাক্রমে সদর দপ্তর ও গেরিলা ক্যাম্পের সামরিক দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। তাদের শেষ নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি ফিরে গেলাম।

চার্লি সেক্টর থেকে সর্বশেষ যে নির্দেশ পেলাম, তা হলো-অস্ত্রপাতি ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায় নিতে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বিভিন্ন যুবকেন্দ্রের ম্যানেজাররা-এম সি এ-রা স্বাধীনতার উল্লাসে আত্মহারা হয়ে ছেলেদের ফেলে রেখে যে যার মতো আগেই চলে যায়। আর ছেলেরা পড়ে মহাসংকটে। বাংলাদেশে ফিরে যাবার মতো কোনো সম্বলই ছিল না তাদের। তারা আমার হেড কোয়ার্টারের চারদিকে এসে ভিড় করল এবং অনুরোধ জানাল যে, তাদের জন্য যেন কোনো বন্দোবস্ত করে দিই। আমার এ বন্ধুর সাথে যোগযোগ করে ছেলেদের যাবার বন্দোবস্ত করার জন্য সুলতান ও হককে বলে দিলাম। দিনটা ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। সবকিছুই এলোমেলো। কারুর দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। কাজকর্ম ফেলে রেখে সবাই বাংলাদেশের ভেতরে চলে যেতে চায়। আমি তাদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু পিছনের কাজকর্ম গুছিয়ে নেয়ার জন্য কাউকে অন্তত এখানে থাকতে হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক বেগকে তার দলবলসহ গণপরিষদ সদস্য মি. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সাথে 'বিউটি অব খুলনায়' করে বরিশালে পাঠিয়ে দিলাম।

টাকি ও হাসনাবাদের দিকে চেয়ে মনটা কেঁদে উঠল। মনে হলো, ওরা আজ বড্ড শূন্য, নিঃসঙ্গ।

দীর্ঘ নয়মাস যাবত অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীর ভিড়ে কর্মচঞ্চল হাসনাবাদ ও টাকি আজ নীরব। যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি ভয়ানক অন্তর্ভুলা অনুভব করলাম। শেষবারের মতো ইছামতী ও আমার হেডকোয়ার্টারের দিকে অশ্রুসজল চোখ দুটো বুলিয়ে মোস্তফাকে আমার জিপে উঠতে বললাম। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সুলতান, হক ও অন্যান্য সাথিদের দিকে। পরে খুলনায় এসে আমার সাথে যোগ দেয়ার জন্য ওদের নির্দেশ দিলাম এবং আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমি এগিয়ে চললাম। পিছনে পড়ে রইল স্মৃতি বিজড়িত হাসনাবাদ, টাকি-চেনা-অচেনা অনেক মুখ ও হাসিকান্নার অনেক গল্প। গোজাডাঙ্গা থেকে একটা সরু রাস্তা সাতক্ষীরা পর্যন্ত চলে গেছে। দু'ধারে উন্মুক্ত জলাশয় আর ঝোপ-জঙ্গল। রাস্তার পাশে প্রতি পঞ্চাশ গজ অন্তর

শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চ, বাংকার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মিত্রবাহিনীর যানবাহন, বেসামরিক গাড়ি ও শরণার্থীর অসম্ভব ভিড়ে রাস্তাটা গিজ গিজ করছে। যে সমস্ত জায়গায় ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সেসব জায়গায় মিত্রবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিজগুলোকে চলাচলযোগ্য করে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। রাস্তার পাশে সুরক্ষিত বাংকার ও বাড়ির ছাদের ওপর সুদৃঢ় অবস্থান দেখে আমার বড় দুঃখ হলো। পাক-হানাদাররা প্রকৃত সৈন্যের মতো যুদ্ধ না করে, এই অবস্থানগুলো ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? ওদের দৃঢ় সংকল্পের বাহাদুরী আজ কোথায়? হানাদাররা যদি তাদের অবস্থানে টিকে থাকতে পারত, তাহলে এ রূপকথার বীরত্ব হয়তো এত তাড়াতাড়ি ধূলিসাৎ হতো না।

যা হোক, বীরত্ব কোনো জাতির একচেটিয়া আশীর্বাদ নয়। এর উত্থান হয়তো কষ্টকর হতে পারে, কিন্তু পতন আসে অকস্মাৎ। যেমন- আমরা জার্মানদের বেলায় দেখি।

বিজয়ের আনন্দে আমার গাড়ির চাকাগুলো অসম্ভব দ্রুত বেগে ঘুরতে লাগল। আমি দৌলতপুর থেকে ১০ মাইল দূরে একটি স্কুলের কাছে আমার লোকজনদের সঙ্গে মিলিত হলাম। এই জায়গাটার নাম শাহপুর। এখান থেকে একটি রাস্তা না হয়ে যশোর-খুলনার বড় রাস্তার সাথে ফুলতলার কাছে এসে মিশেছে।

ডিসেম্বরের ৯ তারিখের রাত। স্কুল থেকে অগ্রবর্তী এলাকার মিত্রবাহিনী-মুক্তিবাহিনী মাত্র এক মাইল দূরে। শত্রুপক্ষের অবস্থানের হাজার গজের মধ্যে মিলে এক কোম্পানি সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। ৯ তারিখ রাতেই আমি ওদের কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু ওদের কাছে পৌঁছানো দুঃসাধ্য ছিল। কেননা, ওরা তখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং স্থির করলাম, ১০ তারিখ ভোরে ওদের সাথে মিলিত হব। রাতটা ভয়ানক রকমের অশান্ত। সারা রাত ধরে দু'পক্ষের কামানগুলো অবিশ্রান্তভাবে গর্জন করছিল। স্কুলের ছাদে উঠে আমি, মোস্তফা, ডা. শাহাজাহান ও হুদা দেখতে পেলাম, সারা আকাশটা লালে লাল। কামানের গর্জনে স্কুলের ছাদটা থর থর করে কাঁপছে। খুবই উত্তেজক সন্দেহ নেই। কিন্তু ৬ করুণ, বড় নির্মম। কেননা, শত্রুমিত্র অনেক মানুষের জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে হিংস্র কামানের গোলায়। সমস্ত রাত ধরে শুধু কামানের গর্জন আর গর্জন।

১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টা অতিবাহিত হলো অহেতু উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও এক রকম বিশ্রামের মধ্য দিয়ে। মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্ব দুঃখ ও আনন্দে আবহাওয়া ভারাক্রান্ত। স্থানীয় লোকজন বিজয়ের আড্ড আত্মহারা। নানাভাবে আতিথ্য দেখিয়ে জনগণ আমাদের মুগ্ধ করল। যেন আমরা সবাই একই সংসারের লোক, একই সুখ-দুঃখের ভাগী। রাস্তার পাশে সেই স্কুলটি যে সপ্তাহটা কাটিয়েছিলাম, তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমার রণাঙ্গনের ডাইরিটার কিয়দংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল

গত রাতে ঘুমাতে পারিনি। কামানগুলো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। গুহায় আহত সিংহের মতো কামানগুলো তবু মাঝে মাঝে গোঙাতে লাগল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে এক মগ চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যুদ্ধরত সৈন্যদের কাছে গেলাম। এটা আমাদের দ্বিতীয় অবস্থান। সাতক্ষীরা- দৌলতপুর রাস্তার প্রায় এক হাজার গজ সামনে মেজর ঠাকুরের নেতৃত্বে ১৩ নং 'ডোগ্র' পদাতিক বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল। অগ্রবর্তী দলের মর্টার সজ্জিত সৈন্য দলটিও এখানে অবস্থান নেয়।

রাস্তার দু'দিকে খোলা জলাশয়-সবকিছুই চোখে পড়ে। রাস্তায় কোনো রকম চলাচল করলেই শত্রুপক্ষের মেশিনগানগুলো গর্জে ওঠে। রাস্তাটা খুব উঁচু।

খুলনার ওয়্যারলেস স্টেশনের টাওয়ার ও দৌলতপুরের পানির ট্যাংক ভালোভাবে দেখা যায়। এত কাছে তবু সোজাসুজি যেতে পারছি না।

খুলনাকে দেখে আমি খুবই তৃষ্ণার্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যেহেতু পিছন দিক থেকে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়, সেজন্য আমাদের সৈন্যরা দু'দিক থেকে অগ্রসর হতে লাগল। তাছাড়া মিত্রবাহিনীর আগে আমাদের যাবার কথা নয়। কাজেই আমাদের পিছনে থেকে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বললাম। ওদের অধিকাংশই খুলনার লোক। দেখলাম, ওদের মনোবল খুবই উঁচু। ওদের ঘর-দোরের করুণ দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফিরে এসে, আমাদের যা কিছুই আছে সব

একত্র করার জন্য হুদাকে বললাম সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ট্রেঞ্চ খনন করে, তার ভেতর আমরা আশ্রয় নিলাম। কেননা, এ জায়গাটা শত্রুপক্ষের কামানের আওতায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সতর্ক হয়ে প্রস্তুত রইলাম। আকাঙ্ক্ষিত চরম লক্ষ্যবস্তুর কত কাছে আমরা তবু কত দূরে।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল

যে দৃশ্য দেখেছি, তা জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। দেখলাম, সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রোড লোকে-লোকারণ্য। বিভিন্ন যুবকেন্দ্র থেকে ওরা দলে দলে ফিরে আসছে। যতদূর চোখ যায়, শুধু লোক আর লোক। কাঁধে ছোট ছোট বোঝা। রিক্ত, নিঃস্ব-সম্বলহীন। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে মানুষের কাফেলা। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, আমরা ওই রাস্তার উপরই ছিলাম, নইলে ওই রিক্ত মানুষগুলো হিংস্র শত্রুদের খপ্পরে পড়ে যেত। সামনে অগ্রসর হতে বারণ করে ওদের থামিয়ে দিলাম।

একটা দোতলা দালান থাকার জন্য ঠিক করা হলো। ওদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওরা প্রত্যেকেই এসে অভিযোগের সুরে বলল, "স্যার, আমাদের সাথে কোনো টাকা-পয়সা নেই। এম এন এ এম পি এ'রা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।' মুখগুলো শুষ্ক, কুঞ্চিত। কেননা, পঞ্চাশ মাইল পথ ওদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। মনটা আমার উঠল। ওদের সান্ত্বনা দিয়ে একটা বড় লঙ্গরখানা খোলার জন্য চৌধুরীকে বললাম। খুলনা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে থাকতে নির্দেশ দিলাম। চৌধুরীকে লঙ্গরখানা দেখাশোনার ভার দিয়ে আমি হেড কোয়ার্টাকে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং ফুলতলা পৌছে ৯নং পদাতিক ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলাম। মেজর জেনারেল দলবীর সিং এ ডিভিশনের কমান্ডার।

ফুলতলা থেকে কিছু সামনে খুলনার দিকে যে রাস্তাটা গেছে তার ডান পাশে একটি কৃষি কলেজের মধ্যে হেড কোয়ার্টারের অফিসাদি। মেজর জেনারেল দলবীর সিং এর দেখা না পেয়ে, তাঁর স্টাফ অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম। এই ডিভিশনের একটি ব্রিগেড, হেড কোয়ার্টার থেকে তিন মাইল সামনে অবস্থান নিয়েছিল।

পাক হানাদাররা এখানে তীব্র প্রতিরোধ দিয়ে খুলনা-যশোর রাস্তার ওপর মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ করে দিল। অবিরাম গোলাবর্ষণ চলতে লাগল। মনে হলো, খুলনা শত্রুপক্ষ-সুদৃঢ় ঘাঁটি গেড়েছে। সীমান্ত ও যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা জড়ো হয়েছে খুলনায়। কেননা, মুক্তিবাহিনী চতুর্দিক থেকে ওদের ঘিরে রেখেছে। হানাদাররা মিত্রবাহিনীর চাইতে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশি ভয় করত।

একই রাস্তা ধরে আবার ফিরে এসে দেখলাম, আরো পনেরশোর বেশি ফেলে আসা মুক্তিযোদ্ধা এসে শাহপুর স্কুল ভরে ফেলেছে। ওদের ভিড় দেখে মি. চৌধুরীকে এ-ই প্রথম বারের মতো বিষণ্ন মনে হলো। মেশিনগানের গোলার বিকট আওয়াজ শুনে রাতটা কোনোরকম কেটে গেল।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল

আমাদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের সামনে শত্রু ঘাঁটির ওপর বিমান হামলা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমি, ৯ নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার মেজর ভট্টাচার্য, ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট দত্ত আমাদের দ্বিতীয় অবস্থানে, সারা দিন অপেক্ষা করলাম। মি. দত্তের নির্দেশে এই বিমান হামলা পরিচালিত হচ্ছিল। বায়ুস্তর ভেদ করে বিমানগুলো উড়ে আসতেই, মি. দত্ত বেতারযন্ত্র মারফত পাইলটদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং সঠিক লক্ষ্যস্থলের বর্ণনা দিয়ে আগত হানার নির্দেশ দিলেন। পাইলটরা ঠিকমত নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তু চিনে, বারবার বিমান নিয়ে 'ড্রাইভ' দিতে লাগল। হানাদারদের কোনো বিমান বা বিমান বিধ্বংসী কামান না থাকায়, তারা এই বিমান আক্রমণের কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। অসহায়ের মতো শুধু মার খেতে লাগল।

দৃশ্যটা বড়ই করুণ। লক্ষ্যবস্তু থেকে ধূসর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। আর বিমানগুলো সানন্দে ঘুরেফিরে ডিগবাজি খেয়ে শত্রু অবস্থানের উপর অবিরাম রকেট বর্ষণ করতে লাগল। হামলা চালিয়ে বিমানগুলো আবার নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে গেল। আর আমরা জ্বলন্ত লক্ষ্যবস্তুটার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো কর্তব্য ছিল না।

রাতে বড় একটা মাছ দিয়ে ভোজন পর্ব সমাধা করা হলো। স্থানীয় লোকজন পুকুর থেকে মাছটা ধরে দিয়েছে। শুনতে পেলাম, এ পুকুরটার মালিক না- কি খুলনার 'কুখ্যাত' খান আবদুস সবুর।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল

মেজর জেনারেল দলবীর সিং-এর সাথে তাঁর হেড কোয়ার্টারে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম, গাড়ির ভেতর তিনি একটা ম্যাপ দেখছেন এবং খুবই ব্যস্ত। তাঁকে ভয়ানক বিরক্ত ও রাগান্বিত মনে হলো। কেননা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করার পরও তিনি এগুতে পারছিলেন না। তার অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল। ভারতের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ' অল ইন্ডিয়া রেডিও মারফত ঘোষণা করলেন যে, আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তৎসত্ত্বেও শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জেনারেল দলবীর সিং তাঁর একটি বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমার কাছে কয়েকজন দক্ষ লোক চাইলেন। উদ্দেশ্য, শত্রুদের বাঁ দিক থেকে আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। তাড়াতাড়ি হেড কোয়ার্টারের ফিরে গিয়ে খুলনার পথঘাট যাদের ভালো জানা আছে, এ রকম পাঁচজন লোক আমি নির্বাচিত করলাম।

আমি যখন মিত্রবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন রাত। ভয়ানক অন্ধকার। হঠাৎ করে কানে তালা লাগিয়ে শত্রুর গোলা ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে। যদিও প্রতি মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছিলাম, তবু এই অভিযান অত্যন্ত দুঃসাহিক মনে হলো। যদি একটা গোলা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের উপর এসে পড়ত? পথপ্রদর্শকদের মনোবল অসীম। একটা ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধা করার জন্য মিত্রবাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ওদের কুশল কামনা করে বিদায় দিলাম।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল

গত রাতে মুষলধারে বৃষ্টি থাকায় মিত্রবাহিনী সামনে এগুতে পারল না। আজকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। এদিকে লে. দত্তের তত্ত্বাবধানে দৌলতপুর ও খুলনার কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিমান হামলা চালানো হলো। বারবার বিমান হামলায় খুলনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে মনে ব্যথা অনুভব করলাম এবং পাক হানাদাররা এখনো আত্মসমর্পণ না করায় মনে

মনে ওদের অভিশাপ দিতে লাগলাম। হানাদারদের আত্মসমর্পণের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। মনে হলো, ওরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। জানতাম, আজ হোক কাল হোক ওদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে। আপাতত অসহিষ্ণুতা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু ভেতরটা সবসময় মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। আজকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। আমার একজন মুক্তিযোদ্ধা বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারায়! ক্যাম্পের আর একজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেলের ম্যাগজিন খালি ভেবে ট্রিগারে টিপ দেয়, যার ফলে এই মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মুক্তিযোদ্ধাটি এখন এস এস সি পরীক্ষা। মুকড়া স্কুল প্রাঙ্গণে ওকে সমাহিত করা হয়েছিল। স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, তারা যেন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার নামে স্কুলটির নামকরণ করে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল

দিনটা মেঘাচ্ছন্ন। কিছুটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণবোধ করতে লাগলাম। গত। রাতের পরিকল্পনামফিক মিত্রবাহিনীর এক 'স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্ক" খুলনার দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফলাফলের কোনো খবর পেলাম না।

সকাল দশটা। শাহপুর স্কুলে কতকগুলো ছেলের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ক্যাপ্টেন হুদার জিপ এসে থামতেই সে একটি দুষ্টু ছেলের মতো লাফিয়ে পড়ে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এ রকম করতে আগে তাকে কখনো দেখিনি। তার এ ব্যবহার দেখে খুবই বিস্মিত হলাম। সে এক রকম কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'অত্যন্ত সুখবর স্যার, পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল জ্যাকভ ইতোমধ্যে ঢাকায় অবতরণ করেছেন।'

সংবাদটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। কেননা, কল্পনাও করতে পারিনি যে, ওই হিংস্র পশুগুলো এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করবে। তবু এ সংবাদটা শুনে আমার সারা দেহে তপ্ত রক্তস্রোত বইতে লাগল। চিৎকার করে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললাম, "আমরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি।'

আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। ছেলেরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হতো। চিৎকার করতে লাগল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ডিগবাজি খেয়ে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি করতে লাগল। সবাই এক সঙ্গে

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল!..'তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব।

মনে হয়, ওরা সবাই যেন পাগল হয়ে গেছে। এ মূহূর্তে সবাই খুলনার দিকে ছুটে যেতে চাইল। এ অবস্থায় ওদের আটকে রাখা খুবই অসম্ভব হয়ে উঠল। পাগল। ঘোড়ার মতো সবাই ক্ষিপ্ত। অনেক কষ্টে এই বলে ওদের শান্ত করলাম, মিত্রবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে সঠিক সংবাদ জেনে ওদের সবাইকে ছেড়ে দেব।

আমি এবং হুদা মিত্রবাহিনীর ৯ নং ডিভিশনের সদর দপ্তর গিয়ে মেজর জেনারেল দলবীর সিংকে তার বাহিনীর অপর দু'জন অধিনায়কসহ খোশ মেজাজে বসা দেখলাম। আমাদের দেখেই তারা খুব উল্লসিত হলেন এবং আমাদের স্বাগত জানালেন।

সময় বেলা ১২টা। কামানগুলো নীরব। আমরা একটা ট্রানজিস্টারের কাছে বসে ঢাকার খবরাখবর শুনতে লাগলাম। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী, তার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে সকাল সাতটায় মিত্র বাহিনীর লে. জেনারেল অরোরা'র নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। একদিকে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের আনন্দ, অপরদিকে ওদের অপমানজনক পরাজয়ের তীব্র গ্লানি।

যাহোক, এদিকে খুলনাকে নিয়ে বড় দুর্ভাবনায় পড়লাম। তখন পর্যন্ত এখানকার শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ করার কোনোই লক্ষণ দেখা গেল না। উত্তেজনায় জেনারেল দলবীর সিং টেবিল থাপড়ে বললেন, যদি ওই শয়তানগুলো এখন আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে আমার নিকট যে গোলন্দাজ বাহিনী আছে, তা পাঠিয়ে দিয়ে ওদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।'

সময়ের চাকাটা ঠিকমতই চলতে লাগল। কিন্তু আমাদের সামনে যে শত্রু রয়েছে, তারা যেন স্থবির। সবাই আমরা বসে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি, এইবার বুঝি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করবে। সূর্য ডুবে গেল, কিন্তু আত্মসমর্পণের কোনো আভাস পাওয়া গেল না। আজ ঢাকায় শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু খুলনায় আত্মসমর্পণ করতে ওরা অস্বীকৃতি জানাল। মনে হলো, খুলনার শত্রু পক্ষের কমান্ডার অত্যন্ত শক্ত লোক। আমি আমার হেড কোয়ার্টারে ফিরে গেলাম।

রাতটা ভয়ানক অস্বস্তিতে কাটল। আমরা কেউ ঘুমাতে পারলাম না। মিত্র বাহিনীর কামানগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে প্রত্যুত্তরে শত্রুপক্ষের কাছ থেকেও জবাব আসছিল। ওদের গোলাবারুদ হয়তো শেষ হয়ে আসছে। আমি আশাবাদী ছিলাম যে, আগামীকালই আমরা বিজয়ীর বেশে খুলনায় প্রবেশ করতে পারব। বিগত নয় মাসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল

গতরাতে ক্যাপ্টেন হুদার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশ লোককে লে. মোহাম্মদ আলীর তত্ত্বাবধানে দৌলতপুর রোড দিয়ে খুলনায় পাঠিয়ে দিতে হবে। ওদের ভেতর ষাটজন মুক্তিযোদ্ধাকে গাড়িতে চাপিয়ে প্রস্তুত করে রাখলাম, যেন ওরা নির্দেশ পাওয়া মাত্র আমাদের সাথে খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারে।

সকাল বেলা সবাই প্রস্তুত। চরম বিজয় অভিযানের উত্তেজনায় সবাই প্রস্তুত। চরম বিজয় অভিযানের উত্তেজনায় সবাই কাঁপছে। ক্যাপ্টেন হুদা, ডা. শাহজাহান ও মোস্তফাকে সাথে নিয়ে সকাল সাতটায় মিত্রবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছলাম। গাড়িতে যেসব মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল তারা আমার পিছে পিছে রওয়ানা হলো। রাস্তায় শত শত গাড়ির ভিড়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কখন মিত্রবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে গাড়ি ছাড়ার সংকেত-সবুজ বাতি জ্বলে উঠবে এবং তারা খুলনার দিকে অগ্রসর হবে। মিলিটারি পুলিশ স্ট্যান্ডের নিকট সবার আগে আমাদের গাড়ি দাঁড় করালাম। ৯নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনী অধিনায়ক হিসেবে আমাকে স্বীকৃতি দেয়ায় মিত্রবাহিনী আমাকে গাড়ি পার্ক করার অনুমতি দিল। অন্যথায় কোনো বেসামরিক লোককে মিলিটারি পোস্টের এক গজের মধ্যে গাড়ি পার্ক করার অনুমতি দেয়া হতো না। পিছন দিকে দেখলাম, অসংখ্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার গাড়ির চারদিকে ভিড় করে আছে। আমি হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। কারুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সবাই ব্যস্ত সমস্ত। বিজয়ের লগ্নটা আজ কত না প্রাণবন্ত। প্রতিটি মুহূর্ত উত্তেজনাময় ঐতিহাসিক। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বিজয়ের আনন্দে মুখর শক্ত প্রতীক্ষিত স্বপ্নের ফল। সবাইকে খুশি মনে হলো। কিন্তু

অন্তর খুলে কেউ হাসতে পারল না। মনের অস্থিরতায় সবাই আড়ষ্ট হয়ে এলো।

জেনারেল দলবীর সিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কেননা, প্রধান স্টাফ অফিসার আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি কমান্ডারদের নিয়ে ইতোমধ্যেই রওয়ানা হয়েছিল। এখনো এসে পৌঁছাননি। সময় অতি মন্থর গতিতে চলতে লাগল। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি ঘণ্টা। মিত্রবাহিনীর ৯নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার কর্নেল দেশপান্ডে জেনারেল দলবীর সিংকে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তার সাথের সাতজন লে. কর্নেল এসে পৌঁছে গেছেন।

উত্তেজনার চরম মুহূর্ত। জেনারেল দলবীর সিং গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন, ওদের এখানে নিয়ে আসুন। আমরা হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং-এর উপর তলায় বসা ছিলাম। নিচের দিকে চাইতেই দেখলাম, সাংঘাতিক অবস্থা। সামরিক বাহিনীর ফটোগ্রাফাররা আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি কমান্ডারদের ফটো নেয়ার জন্য, ওরা গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। এত ভিড় যে, নিয়ন্ত্রণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উৎসাহী সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা এতদিন ধরে পাগলের মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল । যাহোক, পাকিস্তানি কমান্ডারদের নিয়ে আসা হলো। আমি চারদিকে তাকাচ্ছিলাম ওদের ভেতর আমার চেনা কেউ আছে কিনা। হ্যাঁ, ওদের ভেতর আমার চেনা দু'জন ছিল। একজনের নাম, লে. কর্নেল ইমতিয়াজ ভয়ায়েচ। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যখন আমি ক্যাডেট ছিলাম তখন ওখানে তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। অপরজন লে. কর্নেল শামস। তার সাথে আমার জানাশোনা ছিল। ব্রিগেডিয়ার হায়াতকেও একবার কি দু'বার পশ্চিম পাকিস্তানে দেখেছি। তখন তাদের মনে হতো খুব ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু বাংলাদেশে তারাই অভদ্র, অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। বসতে তাঁদের চেয়ার দেয়া হলো। জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন ওদের সাথে। বিজয়ী ও বিজিতের কোনো পার্থক্য রাখলেন না। তিনি ওদের চা পানে আপ্যায়িত করলেন। জেনারেল দলবীর সিং-এর মার্জিত রুচিবোধ ও ব্যবহার দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি ব্রিগেডিয়ার হায়াতের কাছে আমার

পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে ইনি হচ্ছেন মুক্তি- কমান্ডার । আগে আপনাদেরই একজন ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার হায়াত আমার দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকালেন। মনে হলো, ও দৃষ্টি যেন তার নয়। সবদিক দিয়েই লগ্নটা ঐতিহাসিক। তবু আমি অস্বস্তিবোধ করলাম। সুখী হতে পারলাম না। অস্বস্তিকর পরিবেশে আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত। লে. কর্নেল ইমতিয়াজের কাছে গেলাম। আমাকে চিনতে পেরে ম্লানভাবে মুচকি হেসে বললেন, হ্যালো জলিল। জবাব দিলাম, হ্যালো স্যার।' অল্পক্ষণের পরিচয়ে আমাদের বাক রাধে হয়ে আসল। পুরানো পরিচয় শেষ হয়ে গেল। তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বেদনায় ভেঙে পড়লেন। পিঠে বন্ধুত্বের হাত বুলিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। কী বিচিত্র! এই লোকের বিরুদ্ধেই এতক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। একদিন আগেও যদি তিনি টের পেতেন যে, আমি দৌলতপুর রাস্তায় আছি, তাহলে তিনি আমাকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু এখন? এখন একে অপরের শত্রু বলে মনে হলো না। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে একসাথে থাকার অতীত দিনগুলো স্মৃতিপটে ভেসে উঠল।

যাহোক, সময়ের অপচয় করা উচিত হবে না। আত্মসমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয় সমাপ্ত হলো। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার ব্রিগেড মেজরকে ডেকে বললেন, 'মেজর ফিরোজ, তুমি এখনই চলে যাও এবং সৈন্যদের হুকুম শুনিয়ে দাও, যে যেখানে আছে, সেখানেই অস্ত্রসংবরণ করতে। ওদের বলে দিও আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।'

শেষের কথাগুলো যখন তিনি উচ্চারণ করলেন, তখন তার সারা মুখমণ্ডলে বেদনা ও গ্লানির উৎকট রেখাগুলো প্রকট হয়ে উঠল। বেলা এগারটার সময় মেজর ফিরোজ তার সাথে অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে জিপে করে খুলনার দিকে রওয়ানা হলেন। ঠিক তার পিছনেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান। তার পিছনে ৯নং ডিভিশনের একটি জিপে আমি ও লে. কর্নেল দত্ত পাশাপাশি বসা। মি. দত্তকে বেসামরিক গণসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের জিপে পিছনে ক্যাপ্টেন হুদা, মোস্তফা ও ডা. শাহাজাহান।

শেষপর্যন্ত বিজয় অভিযান শুরু হলো। মনটা ভয়ানক উত্তেজিত। অধীর হয়ে ডানে-বায়ে চোখ বুলাতে লাগলাম। চারদিকের পোড়া ঘরদোর,

গাছপালা চোখে পড়তেই মুহূর্তে আমার মনের উত্তেজনা কোথায় যেন তলিয়ে গেল। জ্বলন্ত ট্যাঙ্কগুলো রাস্তার দু'ধারে কচ্ছপের মতো চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। এদিক ওদিকে মানুষ ও গবাদি পশুর মৃতদেহ। দীর্ঘ সংগ্রামের ভয়াবহতার এক করুণ নিদর্শন। এমনকি গত রাতেও কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গা থেকে তখনো ধুম কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠছিল। এটা বিজয় অভিযান! আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এবং মহৎ কিছু খুঁজেও ফেলাম না। শুধু দেখলাম, মানবতার বিপর্যস্ত রূপ, ধর্ষিতা বাংলার সারা অঙ্গে কালো ছাই।।

আত্মসমর্পণকারী পাক সৈন্যরা রাস্তার দু'ধারে অবস্থান গেড়ে বসেছিল। ওই রক্তপিপাসু নরখাদকরা আজ বন্দি। অবনত মস্তকে মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছে। ইতিহাসের কি অমোঘ বিচার। ক্ষমতার দোর্দণ্ড প্রতাপে মশগুল বিরাট দেহধারী এই মানুষরূপী রক্তলোলুপ হিংস্র পশুর দল নিরীহ নিরপরাধ বাঙালিদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে বর্বরতম উপায়ে নিধন করেছে- জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের ঘরদোর, তাদের সর্বস্ব। আজ আমরা রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বহারা। আর ওরা? ওরা ইতিহাসের জঘত্যতম কীট-কি সূক্ষ্ম বিচার! ইতিহাসের গতি কত সাবলীল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আত্মসমর্পণকারী ইতালির সৈন্যের মতো হানাদাররা দীর্ঘ লাইন দিয়ে চলতে লাগল। ধীরে ধীরে আমরা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের ভেতর ঢুকলাম। এখানে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানের হেড কোয়ার্টার চারদিক শান্ত, নীরব। মিত্রবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ারের তত্ত্বাবধানে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদল মার্চ করে এগিয়ে এলো। চেয়ারে বসে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, পূর্ব পাকিস্তানে বসে শেষবারের মতো এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করা ছাড়া দেবার মতো আমার আর কিছুই নেই।'

পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ বলবেন কি? আমি একথা বলতেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত অসহায়ের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলেন। উপায়ন্তর না দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি তার ভুল সংশোধন করে নিলেন। চা খেয়ে আমরা সবাই সার্কিট হাউজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এ যাত্রাটা খুবই আনন্দকর। আমরা খুলনা শহরের কাছাকাছি আসতেই রাস্তার দু'পাশের লোকজন গগনবিদারী চিৎকারে আমাদের স্বাগত জানাল।

জয় বাংলা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। আজ মনে হলো, জয় বাংলা বাস্তব সত্য। প্রত্যেক বাড়ির চূড়ায়, দোকানে, বাংলাদেশের পতাকা। প্রতিটি মানুষ নারী- পুরুষ ও শিশু সবার হাতেই বাংলাদেশের পতাকা। হাত নেড়ে উল্লসিত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিলাম। সবার মুখেই হাসি। শিগগিরই আমরা সার্কিট হাউজে পৌঁছলাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে এদিকে আসতে লাগল। সার্কিট হাউজের উপরে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। সমুন্নত পতাকার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। হাজার হাজার উৎসুক মানুষ সার্কিট হাউজ ঘিরে রয়েছে। এবং সবাই সামনে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

যে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা নিরীহ বাঙালিদের উপর এতদিন অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের এক নজর দেখার জন্য জনতা বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ছুটে আসতে চাইলো। জনতার অসম্ভব ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু জনতার চাপ এত বেশি যে, মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই ওদের সামলাতে পারছে না। সার্কিট হাউজের দরজায় নামতেই এত ভিড়ের মধ্যে পিষ্ট হতে হতে জনতা আমাদের দেখার কেউ গলা জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কেউ আনন্দে হাততালি দেয়, ফাটিয়ে চিৎকার করে, কেউবা পাগলের মতো ছুটে এসে চুমা খায়। কি অপূর্ব দৃশ্য! মানবতার কী মহান বহিঃপ্রকাশ। সব হারাবার দুর্বিষহ জ্বালা ভুলে গিয়ে নতুন দিনের নতুন সূর্যকে কত আপন করে কাছে নিতে চায়। মহামানবের তীর্থ সলিলে অবগাহন করে অবহেলিত জনতা আজ যেন নতুন ওরা আজ স্বাধীন প্রাণের সন্ধান পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠছে। ওরা আজ মুক্ত, প্রতিটি জিনিস আজ ওদের নিজস্ব। ইতোমধ্যেই একটা হেলিকপ্টার উন্নত জেনারেল দলবীর সিংকে নিয়ে সার্কিট হাউজে অবতরণ করল। লম্বা, চেহারার অধিকারী জেনারেল দলবীর সিং সার্কিট হাউস পর্যন্ত হেঁটে আসলেন এবং আত্মসমর্পণ পর্বের খুঁটিনাটি বিষয় ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। সবুজ ঘাসের ওপর লাল কার্পেট বিছানো। তার ওপর একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সমাগত। সুশিক্ষিত আট হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের কমান্ডারদের আত্মসমর্পণ। যে দাম্ভিক পাকিস্তানি সৈন্যরা হিংস্র কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করত। তারা আজ নিরীহ মেষশাবকের মতো আত্মসমর্পণ করল।

জেনারেল দলবীর সিং চেয়ারে উপবিষ্ট। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার সাথের আটজন কর্নেল নিয়ে মার্চ করে তার সামনে এসে থামলেন। পাকিস্তানি কমান্ডাররা যখন সার্কিট হাউজ থেকে বেরিয়ে মার্চ করে আসছিল, তখন বাইরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার লোক আনন্দে ফেটে পড়ল। কেউ হাততালি দেয়। কেউবা শিস দেয়। কী গ্লানিকর পরাজয়! কত বড় শান্তিমূলক অনুষ্ঠান। জেনারেল দলবীর সিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পাকিস্তানি অপরাধীগুলো এটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিধে।

জেনারেল দলবীর সিং আত্মসমর্পণের দলিল পাঠ করলেন এবং পাকবাহিনীর পরাজিত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান মাথা নুইয়ে কম্পিত হতে দালাল স্বাক্ষর দিলেন। সোজা হয়ে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তার সাথে অন্যান্য অফিসার কোমরের বেল্ট খুলে মিত্রবাহিনীর কাছে অর্পণ করলেন। এই সময় সমস্ত ফটোগ্রাফার ফটো নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। দেখে মনে হলো: একটি বিয়ের পর্ব। ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পক্ষে এ রকম গ্লানিকর আত্মসমর্পণ আমি আর কখনো দেখিনি। অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয়। উৎফুল্লিত জনতার স্রোতে আমি হারিয়ে গেলাম এবং জনতার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে বাংলাকে প্রাণভরে দেখে নিলাম।

আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে আমি হতভাগ্য, না ভাগ্যবান? মনে প্রশ্ন জাগল বিজয় অভিযানের এটাই কি সব?

যুদ্ধের সমাপ্তি। সামরিক জান্তা পরাজিত। দেশ মুক্ত। তবু চারদিক লোকে লোকারণ্য। যেন আরো কিছু বাকি আছে। জনতা চিৎকার করে উঠল, ওরা আমাকে দেখবে। কিন্তু কেন? যারা পিছনে পড়ে রয়েছে তাদের কেন খোঁজ করছে। জনতার অনুরোধে আমাকে বাইরে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়াতে হলো। ওরা আনন্দে আত্মহারা। আমাকে বার বার আলিঙ্গন করতে লাগল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। এত আনন্দ, এত সমারোহের মাঝখানে মন ছুটে গেল ইছামতীর তীরে।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠল, দীর্ঘ নয় মাসের হাসি-কান্নায় মিশ্রিত ঘটনাপুঞ্জি। বুকের রক্ত ঢেলে কত জানা-অজানা তাজা টকটকে

ফুল ইছামতীর তীরে শ্যামল ঘাসের বুকে শুয়ে আছে। সব হারিয়ে কেউবা হয়তো নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমিয়েছে। কোনো দিন আর ফিরে আসবে কি না কেউ জানে না। তবু ইছামতী তেমনি সাবলীল গতিছন্দে ছুটে চলবে মহাকালের সাক্ষী হয়ে।

সীমা কোথায়?

আমার মনে হয়, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মুক্তিসংগ্রাম। যদিও মাত্র নয়মাসের মধ্যে এরকম একটা মহৎ বিজয় অর্জিত হয়েছে, তবু এর স্বাদ অত্যন্ত তেতো মনে হয়।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বিপুল, ভয়াবহ। দেশের জন্য এত বড় বিরাট আত্মত্যাগ, এত লোকক্ষয় ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। দেশ মুক্ত হলো। কিন্তু সমাজ দেহের সারা অঙ্গে গভীর, রক্তাক্ত ক্ষতগুলো অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। এই ঘা শুকাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পাকিস্তানি সামরিক চক্র প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যারা গিয়েছে, তারা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু আরো তিন লক্ষ মা-বোন যারা উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা অংশ হিংস্র হায়েনাদের উন্মুক্ত লালসার শিকার হয়ে নিগৃহীত জীবন অতিবাহিত করছে। এই কলঙ্কিত জীবন নিয়ে এই অসহায় মা-বোনেরা সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে কি। উপায়ে?

ধর্ষিতা এই জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে আমরা কি এই কলঙ্ক মুছতে পারব? অথবা নিগৃহীত জীবনের বিষময় ফল অবৈধ সন্তানদের স্বাদরে বরণ করে নেব? কোন পথ আমরা বেছে নেব? আগেরটা না পরেরটা? কোনো পথই আমাদের কাম্য নয়। আগেরটা নৃশংস, অপরাধজনক। পরেরটা পরাজয়ের গ্লানিতে কলঙ্কিত।

পরাজয় ও নৃশংসতার মাঝখানে এমন কোনো জায়গা আছে, সেখানে জাতি ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে বিশ্বমানবতার দরবারে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারে? এর একমাত্র উত্তর-প্রতিহিংসা অথবা সুবিচার। পৃথিবীর যেকোনো তরফ থেকেই অনুরোধ আসুক না কেন, জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে মিটমাট করার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। প্রতিহিংসা নয়, সুবিচারের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। কেননা, বিচার সভ্য সমাজের মাপকাঠি; মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর প্রতিহিংসা, প্রাগৈতিহাসিক। বর্বর

জীবনধারার পরিচায়ক। ইয়াহিয়ার পোষা কুকুরগুলো পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে হাজার হাজার বসতবাড়ি। শিল্প নগর, বন্দর, প্রধান প্রধান সেতুগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে রেখে গেছে হিংস্রতার কঠিন স্বাক্ষর। লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিল। চরমে পৌঁছল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দুস্থ মানবতার আর্তনাদে ভারত ও রাশিয়া ছাড়া বিশ্ব বিবেক সাড়া দিল না। অবশ্য, আমেরিকার জনগণ ও সাংবাদিক পাক সামরিক জান্তার বর্বরতার খবর পেয়ে ধিক্কারে সোচ্চার হয়েছিল। সুতরাং পাগল ইয়াহিয়া সবুজের দেশ রূপসী বাংলার শান্তি ও কবিতাপ্রিয় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির উপর তার পোষা কুকুরগুলো লেলিয়ে দেয়। এশিয়ার বিজ্ঞ শয়তান জুলফিকার আলী ভুট্টো হয়তো মনে করেছিলেন যে, শক্তির দম্ভে, অস্ত্রের জোরে বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের এই সংগ্রামী মশাল চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিয়ে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ঔপনিবেশিক নিগড়ে শৃঙ্খলিত করে রাখবে। তাই পরিকল্পিত উপায়ে বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ছাত্র-শিক্ষক নিধনযজ্ঞে দস্যু ইয়াহিয়া তার হিংস্র পশুগুলোকে নমিয়ে দিল। আত্মসমর্পণ করার এক সপ্তাহ আগে জল্লাদ ইয়াহিয়ার নরখাদকগুলো বাংলাদেশে তেরো শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। বিভিন্ন শহরে শত শত বধ্যভূমি খুঁড়ে হাজার হাজার মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। এর থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমা শোষক দল, তাদের শোষণ ও অত্যাচার অব্যাহত রাখার জন্য অতি সুপরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় বাঙালিদের হত্যা করেছে। কিন্তু সামরিক জাতি নয় বলে অপবাদ দেয়া বাঙালি, প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে পুড়ে হিংস্র হয়ে উঠল। ভাত খেকো আমার বাঙালি সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্বরতার সমীচীন জবাব দিতে লাগল। আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হানাদাররা আঘাতের প্রচণ্ডতায় হয়ে পড়ল বেসামাল। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালিদের সামনে শত্রুপক্ষের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হলো ওদের সামরিক কৌশল। পুতুল বাহিনী লজ্জায় মাথা হেঁট করল। খাটো খাটো বাঙালির দুর্বার ইচ্ছাশক্তির জোয়ারে ভেসে গেল পাগল ইয়াহিয়ার নব্বই হাজার সৈন্যের প্রবল পশুশক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রবল শক্তির উন্মাদ ইয়াহিয়া কেন মাথা নুইয়ে আগামী দিনের ইতিহাসে কঙ্কাল হয়ে বেঁচে রইল? তাহলে আমরা কি বলব যে, চীন ধোঁকা দিয়ে

তার চোখের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল? এবং সপ্তম নৌবহর মাথাভারী ইয়াহিয়াকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বোকা বানিয়েছিল?

হয়তো আংশিক সত্য। সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস, নিরীহ মানুষের ঘরদোর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া, নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ সর্বোপরি সৈন্যদের নৈতিক অধঃপতনের জন্য হানাদারদের এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাছাড়া দুর্গম পথঘাট বাংলাদেশের আবহাওয়া, পাকিস্তানি সৈন্যদের খুবই প্রতিকূলে ছিল। এর আগে অবরোধ অবস্থায় ন'মাসের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ওদের কখনো লিপ্ত হতে হয়নি। শত্রুপক্ষের পরাজয়ের জন্য এসব কারণগুলো বাদ দিলে যে কারণটা আমার মনে সবচেয়ে বেশি খোঁচা দেয়, সেটা হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে উদ্ভূত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি। অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করে পুরানো কায়দায় যুদ্ধ করার তালিম পেয়েছিলেন পাকিস্তানি সমরনায়করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এই পুরানো কৌশল অবলম্বন করে সাফল্যলাভ করতে পারেনি। বাংলার সবুজ শ্যামলিমার সর্বত্র অগ্রবর্তী ঘাঁটি। পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রেঞ্চ থেকে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। যখন চতুর্দিক থেকে গুলি এসে ওদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত তখন ওরা রাগে ক্ষোভে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালি গেরিলাদের চ্যালেঞ্জ দিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাদাররা চরম পরাজয় বরণ করে নিরাশায় ভেঙে পড়ত।

এমন একটা অবস্থা এলো, যখন মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনলেও হানাদাররা ভয়ে আঁতকে উঠত। মুক্তিযোদ্ধারা ওদের ওপর অকস্মাৎ হামলা চালাতে পারে এই ভয়ে সবসময় সংকুচিত থাকত। বোধহয় প্রতিটি আঘাত প্রতিটি আক্রমণের জন্য প্রতি মুহূর্তে এই প্রশ্নটা হানাদারদের অন্তরে প্রবল হয়ে দেখা দিতে লাগল মুক্তবাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটি কোথায়? প্রতিটি পাকিস্তানি সৈন্য, মুক্তিবাহিনীর অকস্মাৎ আক্রমণে বিভ্রান্ত, দিশেহারা। ওদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে ওরা জবাব আশা করছিল "অগ্রবর্তী ঘাঁটি কোথায়?" অধিনায়করাও এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হিমসিম, মুক্তিদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি কোথায়?

বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামের কোনো অগ্রবর্তী ঘাঁটি নেই। 'আঘাত কর এবং পালিয়ে যাও'-এই কৌশল অবলম্বন করেই এখানে সাফল্য অর্জন করা হয়। এ পরাজয়ের জন্য আমি পাকিস্তানি সমরনায়ক

ও সৈন্যবাহিনীকে দায়ী করছি। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় যেভাবে আত্মকলহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে, তাতে আমার মনে হয়, আগামী বিশ বছরের মধ্যে সমগ্র মানবজাতি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে উঠবে। মারণাস্ত্রে সজ্জিত মানবজাতির হানাহানি বন্ধ করতে হলে পৃথিবীর সমরনায়কদের নতুন করে যুদ্ধ কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। অন্যথায়, আমার মনে হয়, আগামী দু'যুগের ভেতর পুরানো সমরনীতি অকেজো হয়ে যাবে।

পুরাতনকে হটিয়ে দিয়ে নতুনের স্রোত অসম্ভব দ্রুতবেগে বইতে শুরু করেছে। যেখানেই যাই, দেখি, মানব অধিকার লঙ্ঘন ও মানবিক মূল্যবোধকে পদদলিত করার পাশবিক প্রবণতা। তাই সমর কুশলী ও সমরনায়কদের আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় 'সমগ্র মানবজাতি বনাম সমরবাদ' এ কঠিন সংঘাত সমরনায়কদের শুধুমাত্র ঘোরপাকের মধ্যে টেনে এনে হাজার হাজার নিরীহ সৈন্যদের জীবননাশের জন্য দায়ী করে ক্ষান্ত হবে না সমগ্র মানবসভ্যতাকে এ বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন- অগ্রবর্তী ঘাঁটি কোথায়? এর জবাবের জন্য চরম সংশয় ও নৈরাজ্যের অন্ধকারে ঠেলে দেবে। কারণ, নতুনত্বে বিশ্বাসী মানুষ, সৃষ্টিতে বিশ্বাসী মানুষ চিরন্তন তার প্রগতির পথে ধাবিত। এ মহাকালের স্রোত ধীরে ধীরে ভেঙে দেবে যত বাধা দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় কুসংস্কার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যত অকেজো ঐতিহ্য। এ স্রোত ক্ষিপ্ত-এ স্রোত তীব্র-এ স্রোত অনিবার্য। গোটা মানবসমাজ এ অন্তহীন স্রোতে পতিত-একটা মহাসংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত-এ সংগ্রাম সীমাহীন!

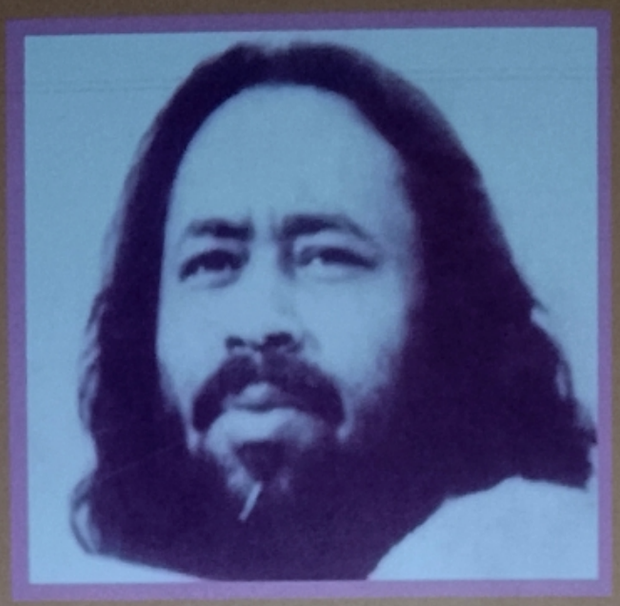

১৯৭০ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবিকপক্ষে কোন কিছুই আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি চারদিকে সুখ ও বিলাসিতা আমার শান্তি ও আনন্দের মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো। বিরাম ও নির্জনতা গোপন পথে আমার কাছে এসে চুপি চুপি আলাপ শুরু করল। স্বপ্ন, ইচ্ছা, দুশ্চিন্তা ও উদাসীনতা আমার কাছে বিপ্লবের ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে এলো।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস
জানতে ভিজিট করুন...
www.sottoprokash.com
সত্য প্রকাশ

সত্য প্রকাশ